ISSN :: 2454–1508 Prefix: 10.69655
IIFS Impact Factor: 4.5 IJIN Impact Factor: 8.5

আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-২, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি ২০২৬

সম্পাদক:
ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য
সহ-সম্পাদক:
আজিজুল সেখ

আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-২, *সংখ্যা*-৩, *জানুয়ারি*, ২০২৬

সম্পাদক:
ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

সহ-সম্পাদক:
আজিজুল সেখ

UTTAR SURI
Inheriting the spirit, inspiring the future

প্রকাশক:
উত্তরসুরি, শ্রীভূমি, অসম

ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5(IJIN)
Volume-II, Issue-III, January, 2026

Published by:
Dr. Bishwajit Bhattacharjee
Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: https://www.atmadeep.in/
Article Submission Link: https://www.uttarsuri.com/uttarsuri
Email: editor@atmadeep.in

Editor-in-Chief
Dr. Bishwajit Bhattacharjee

Associate Editor
Azizul Sekh

Type Setting:
Amrika Das Purkayastha
Soumili Dhar

Printed at:
Scholar Publications
Sribhumi, Assam, India, 788710

Cover Page:
Kajal Ganguli

Price: Rs. 600.00

© Uttarsuri

The views and contents of this Journal are solely of the authors. This Journal is being sold on the condition and understanding that its contents are merely for information and reference and that neither the author nor the publishers, Printers or Sellers of this Journal are engaged in rendering legal, accounting or other professional service.

The publishers believe that the contents of this Journal do not violate any existing copyright/intellectual property of others in any manner whatsoever. However, in the event the author has been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

Atmadeep, is a Bi-monthly electronic & Print journal of open Access Category. The Readers do not need to pay/register themselves to read and download the articles in the journal. However, it is only for scholarly/academic purpose that is non-commercial. Users while using excerpts from Atmadeep, must cite the author, content and the journal by including the link of the content. Individuals/ Companies/ Organizations intending to use contents from Atmadeep, for commercial purpose must contact the Editor-in-Chief.

Editorial Board

Advisor

Dr. Tapadhir Bhattacharjee
Former Vice-Chancellor, Assam University, Silchar, Assam
President, Uttarsuri, Sribhumi, Assam
Mo: +919435566494

Dr. Nirmal Kumar Sarkar
Former Associate Professor, Karimganj College, Sribhumi, Assam
Vice-President, Uttarsuri, Sribhumi, Assam
Mo: +919435375599

Editor-in-Chief

Dr. Bishwajit Bhattacharjee
Associate Professor, Karimganj College
Sribhumi, Assam, 788710
Mo: +919435750458, +917002548380
Email: bishwajit@karimganjcollege.ac.in

Associate Editor

Azizul Sekh
Research Scholar, Dept. of Bengali, Tripura University, Tripura
Mo: +919126261414
Email: azizul.bengali@tripurauniv.ac.in

Editorial Board Member:

Dr. Debasish Bhattacharjee
Professor & Head, Dept. of Bengali
Assam University, Silchar
Email: debashish.bhattacharya@aus.ac.in

Dr. Rupasree Debnath
Assistant Professor, Department of Bengali
Gauhati University, Assam, India
Email: rupasree@gauhati.ac.in

Dr. Malay Deb
Assistant Professor, Dept. of Bengali
Tripura University, Tripura, India
Email: malaydeb@tripurauniv.ac.in

Dr. Madhumita Sengupta
Asst. Professor, Dept. of Bengali
Arya Vidyapeeth College, Guwahati, Assam, India
Email: madhumita.sengupta@avcollege.ac.in

Dr. Debjani Bhowmick (Chakraborty)
Associate Professor, Dept. of Bengali,
Sripat Singh College, Murshidabad, West Bengal, India
Email: dbhowmick@sripatsinghcollege.edu.in

Romana Papri
Lecturer, Department of Pali and Buddhist Studies
University of Dhaka, Bangladesh
Email: romanapapri@du.ac.bd

Dr. Rajarshi Chakrabarty
Assistant Professor, Dept. of History
University of Burdwan, West Bengal, India
Email: rchakrabarty@hist.buruniv.ac.in

Dr. Mumit Al Rashid
Associate Professor and chairman
Department of Persian Language and Literature
University of Dhaka, Bangladesh
Email: mumitarashid@du.ac.bd

Dr. Barnali Bhowmick Ghosh
Associate Professor and HOD
Department of Bengali
Bir Bikram Memorial College, Agartala, Tripura

দ্বিতীয় পর্ব, প্রথম সংখ্যা, সূচিপত্র

কথাসাহিত্য

১। **সোমেন চন্দের নির্বাচিত গল্পে সাম্যবাদী ভাবধারার কথাবিশ্বে মানবজীবনের রেখাচিত্র**
ড. সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী, ১-৭

২। **বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যের 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসে অন্ত্যজশ্রেণির সংগ্রাম**
ড. যতন সাহা, ৮-১৬

৩। **সাধারণ জীবন থেকে সাহিত্য-সৃজন: নবনীতা দেবসেনের নির্বাচিত ছোটগল্পের প্রেক্ষিত**
সরলা মাণ্ডি, ১৭-২৩

৪। **বিমল লামার 'নুন চা' উপন্যাস: লোকজ উপাদানের অন্বেষণ**
ড. বিকাশ নার্জিনারী, ২৪-২৯

৫। **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোট গল্পে নিম্নবর্গীয় চেতনা: এক বিশ্লেষণী পাঠ**
রাজর্ষি মোহান্ত, ৩০-৩৭

৬। **রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রতিবাদী নারী: এক বিশ্লেষণী পাঠ**
অপরাজিতা ভট্টাচার্য, ৩৮-৪৬

৭। **বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়': ভূগোলের চোখে**
সৌম্য ঘোষ, ৪৭-৫৩

৮। **শরদিন্দুর ব্যোমকেশ কাহিনিগুলোর অন্তর্বর্তী সমাজচেতনা**
রাহুল দে, ৫৪-৬৪

৯। **মুহূর্তে বদলে যায় নারীর জীবন: মহাশ্বেতা দেবীর 'প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে' উপন্যাস**
অনসূয়া কুণ্ডু, ৬৫-৭১

১০। **সময়ের শিকল, নারীর আর্তনাদ: রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প**
সুপ্রিতা নাথ, ৭২-৭৮

১১। **শিবরাম চক্রবর্তীর রচনায় নারী চরিত্রের অবলোকন**
সুস্মিতা সাহা, ৭৯-৮৪

১২। **'সেই পাখি' উপন্যাসের কাহিনি ও শিল্পরূপ: লেখক সন্তোষকুমার ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষ পর্যালোচনা**
অশোককুমার রায়, ৮৫-৯২

১৩। **পঞ্চাশের মন্বন্তর কালে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা ও বাংলা উপন্যাসে তার প্রতিফলন**
সুজন সাহা, ৯৩-৯৭

নাট্যভাবনা

১৪। **চন্দন সেনের নির্বাচিত নাটকে প্রতিবাদী নারী চরিত্র**
জয়ন্তী রাজোয়াড়, ৯৮-১০২

কবিতা

১৫। **নারী চেতনার আলোকে মহাকালের নারী: প্রসঙ্গ মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা**
ড. রেজাউল ইসলাম, ১০৩-১১০

১৬। **'কৃত্তিবাসে'র আলোয় শঙ্খ ঘোষ: দেশ-কাল-সমাজ ও মানুষের সংবেদনশীল বয়ান**
শিরিন আক্তার, ১১১-১১৮

১৭। **বাংলা কাব্যগীতির ধারায় অতুলপ্রসাদ সেনের গজল**
মো: আফতাব উদ্দিন, ১১৯-১২৭

১৮। **স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী**
সুমিত পাল, রঞ্জনা ব্যানার্জি ও সমীররঞ্জন অধিকারী, ১২৮-১৩৭
১৯। **মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর রচনায় প্রকৃতির স্বরূপ ও রূপবৈচিত্র্য**
হুমায়ুন কবির, ১৩৮-১৪৩

দর্শন ভাবনা

২০। **উপনিষদে বিশ্বসংস্কৃতি ভাবনা: একটি সমীক্ষা**
ড. স্বপন মাল, ১৪৪-১৫৪
২১। **স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শন এবং পাশ্চাত্যে এর প্রভাব: একটি বিশ্লেষণ**
ড. আনন্দ ঘোষ, ১৫৫-১৬০
২২। **জীবন জিজ্ঞাসা: ভারতীয় দর্শনের আলোকে একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ**
ড. মৈত্রী গোস্বামী, ১৬১-১৬৬
২৩। **দুঃখ ও দুঃখ মুক্তির উপায়: ধম্মপদের আলোকে একটি সমীক্ষা**
টোটন হাজরা, ১৬৭-১৭২

লোকসাহিত্য

২৪। **শ্রী অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর আলাপনে ছড়া ও আঞ্চলিক শব্দ**
অলোক চন্দ, ১৭৩-১৮৩
২৫। **বিখ্যাত কিছু ধাঁধা: একটি বিশ্বব্যাপী অন্বেষণের প্রয়াস**
অসিত মন্ডল, ১৮৪-১৮৯
২৬। **'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭): রূপকথা ও শাশ্বত, আখ্যান কৌশলের আধুনিক বুনন**
সমরজিৎ শর্মা, ১৯০-১৯৫

বিবিধ

২৭। **প্রসঙ্গ কলকাতা ৭১: চলচ্চিত্র ভাষার নবনিরীক্ষা**
ড. মোস্তাক আলি, ১৯৬-২০৩
২৮। **বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আধুনিকতার রূপায়ন**
মো: কয়েছ আহমেদ ও ড. কৃষ্ণা ভদ্র, ২০৪-২১৭
২৯। **সাদা-কালোর বাইরে: নন-বাইনারি পরিচয়ের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান**
বসুন্ধরা গাঙ্গুলি, ২১৮-২২৪
৩০। **বাড়ি থেকে পালিয়ে: স্রষ্টার দ্বন্দ্ব, সৃষ্টির দ্বন্দ্ব**
অগ্নিভ সান্যাল, ২২৫-২৩০
৩১। **ভেষজ চিকিৎসায় পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি গ্রাম কর্ণগড়ের একটি সমীক্ষা**
অনন্যা মুখার্জী, ২৩১-২৩৭
৩২। **ভারতবর্ষে রাজনৈতিক জনমত গঠনে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের ভূমিকা**
শুভেন্দু বোস, ২৩৮-২৪৮
৩৩। **কাব্যসৌন্দর্যের আলোকে ঈশোপনিষদ**
মন্দিরা ডাঙ্গর, ২৪৯-২৫৫
৩৪। **সত্যজিৎ রায়ের গল্প: ভৌতিক ভাবনার রূপায়ণ**
সুরজিৎ সাহা, ২৫৬-২৬২

দ্বিতীয় পর্ব, দ্বিতীয় সংখ্যা, সূচিপত্র

কথাসাহিত্য

১। **সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'অর্ধেক আকাশ': বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান**
মহাদেব মণ্ডল ও লক্ষ্মীশ্রী ঠাকুর, ২৬৩-২৬৮

২। **কল্লোল লাহিড়ীর 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল': নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আখ্যান**
ড. আনিসুর রহমান, ২৬৯-২৭৪

৩। **নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্প: দেশভাগ ও মানুষের স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান**
ড. আজিমুদ্দিন মণ্ডল, ২৭৫-২৮০

৪। **নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গল্পমালা'-র নির্বাচিত গল্পে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: একটি গবেষণামূলক অধ্যয়ন**
দীপশিখা দাস ও ড. মিতা চক্রবর্তী, ২৮১-২৮৯

৫। **ছোটগল্পকার জগদীশ গুপ্তের 'চন্দ্র-সূর্য যতোদিন' গল্পে নারীর করুণ জীবনালেখ্য: একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা**
প্রিয়তমা মজুমদার, ২৯০-২৯৫

৬। **স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক উপন্যাস 'ত্রয়ী': গঠনশৈলী, পাশ্চাত্যপ্রভাব ও সংগীতপ্রয়োগ**
পম্পি দে, ২৯৬-৩০২

৭। **সুবোধকুমার চক্রবর্তীর 'রম্যাণি বীক্ষ্য'- এ দক্ষিণভারতের প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা**
জয়িতা সুর, ৩০৩-৩০৯

৮। **সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্পে সমাজ-দর্শন ভাবনা**
অরূপ কুমার পাল, ৩১০-৩১৬

৯। **বন্ধুত্বের নিরন্তর বন্ধন: রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ**
সন্দীপ ঘোষ, ৩১৭-৩২২

১০। **গল্পের মোড়কে অন্ত্যজশ্রেণির বাস্তব সংগ্রামের আখ্যান: প্রসঙ্গ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠির দেশ'**
অনুরাধা দাস, ৩২৩-৩২৮

১১। **উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে নারীর জীবনযাত্রা: প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'**
সুনন্দা ঘোষ, ৩২৯-৩৩৫

নাট্যভাবনা

১২। **শেখর দেবরায়ের মনসাকথা নাটক: নির্মাণ-বিনির্মাণ**
ড. প্রশান্ত দাস, ৩৩৬-৩৪১

কবিতা

১৩। **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় 'কবিতার' প্রসঙ্গ**
মিহির মজুমদার ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ৩৪২-৩৪৯

দর্শন ভাবনা

১৪। **জীবনের যাপন ও জড়বাদী ভাবনা: চার্বাক দর্শনের আলোকে একটি সমীক্ষা**
ড. মৈত্রী গোস্বামী, ৩৫০-৩৫৫

১৫। **শিক্ষা ভাবনায় দর্শন: একটি নৈতিক ও চিন্তাগত অন্বেষণ**
কাজী মাহফুজা হক, ৩৫৬-৩৬২

১৬। **মানবিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বসংস্কৃতি রক্ষার্থে সংস্কৃত-ভাষা: একটি সমীক্ষণ**
অভিজিৎ পণ্ডিত, ৩৬৩-৩৬৮

১৭। **হিন্দু ও ইসলামের ধর্মীয় শাস্ত্রে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দর্শন**
সান্তনা রানী সামন্ত ও আশাদুজ্জামান খান, ৩৬৯-৩৮২

লোকসাহিত্য

১৮। **লোকভাষ্যে বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন**
ড. মোঃ রাজিবুল ইসলাম, ৩৮৩-৩৯৩

১৯। **গোপভূমের ঐতিহ্যে আল্পনা গ্রাম লবন্ধার**
রুদ্রনীল চোংদার, ৩৯৪-৪০১

২০। **জাওয়া-করম উৎসব: সামাজিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য**
রঞ্জিত কুমার মাহাত, ৪০২-৪১১

বিবিধ

২১। ***যদুবংশ*: বিভ্রান্ত সময়ের যাপিত যৌবন**
ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী, ৪১২-৪২৪

২২। **পাতা থেকে পর্দায়: বাংলা সিনেমায় নারী চরিত্রের বিবর্তন**
ড. সোমা ব্যানার্জি ও অমৃতা চক্রবর্তী, ৪২৫-৪৩০

২৩। **সাবেকি ভূরাজনীতি: ভূরাজনীতির সাবেকি চিন্তাবিদ এবং তাদের তত্ত্বের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা**
সৌমেন মণ্ডল, ৪৩১-৪৪১

২৪। **জ্ঞান সাধনা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও প্রচার-প্রসারে উবায়দুল হক (রহ.)- এর ভূমিকা**
মোঃ কামাল উদ্দিন, ৪৪২-৪৪৯

২৫। **ব্রাত্য বসুর 'রুদ্ধসংগীত': প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বয়ান**
রবিউল সেখ, ৪৫০-৪৫৭

২৬। **ঔপনিবেশিক ও পরবর্তী ঔপনিবেশিক যুগে পুরুলিয়ার ইতিহাসে কুষ্ঠ ব্যাধি ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা: প্রসঙ্গ দ্য লেপ্রসি মিশন হাসপাতাল**
স্বাগতা রায়, ৪৫৮-৪৬৬

২৭। **প্রসঙ্গ ধর্ম: যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংলাপের আলোকে একটি সমীক্ষা**
পার্থসারথি অধিকারী, ৪৬৭-৪৭২

২৮। **সত্যজিৎ রায়ের কলমে বহির্জাগতিক প্রাণীর রূপায়ণ: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন**
সুরজিৎ সাহা, ৪৭৩-৪৭৮

দ্বিতীয় পর্ব, তৃতীয় সংখ্যা
সূচিপত্র

কথাসাহিত্য

১। **আশাকাঙ্ক্ষী মানুষের অন্তর্লোক উদ্ঘাটনে বনফুলের প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড'**
ড. বরুণ কুমার সাহা, ৪৭৯-৪৮৬

২। **নতুন ভোরের সন্ধানে বাজিকরের পথ চলা: প্রসঙ্গ 'রহু চণ্ডালের হাড়'**
ড. অর্পিতা রায় মৌলিক, ৪৮৭-৪৯৪

৩। **জয়া মিত্রের ছোটগল্প: নারী জীবনের বহুমাত্রিকতা**
সুজিত মণ্ডল, ৪৯৫-৫০১

৪। **ব্যাঘ্র প্রকল্প ও অরণ্যভূমিপুত্রদের জীবনকথা: অরণ্য ও শিকারকেন্দ্রিক বাংলা কথাসাহিত্য অবলম্বনে একটি পর্যালোচনা**
পূজা ভুঁঞে, ৫০২-৫১০

৫। **অনিতা অগ্নিহোত্রীর নির্বাচিত ছোটগল্পে নারী: অন্য আলোকে**
মঞ্জুশ্রী মুর্মু, ৫১১-৫১৭

৬। **সেলিনা হোসেনের 'চার যুবকের বিলাপ' গল্পে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অবক্ষয়িত সমাজের অপরাধপ্রবণতা ও মাতৃত্ববোধের উত্তরণ**
মোবারক হোসেন, ৫১৮-৫২৪

৭। **বনফুলের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবন ও বেকারত্বের সংকট: একটি বিশ্লেষণ**
সেখ সাকলিনউদ্দিন, ৫২৫-৫৩২

নাট্যভাবনা

৮। **স্বদেশিকতার আলোয় অমৃতলাল বসুর 'সাবাস বাঙালী'**
নগেন মুর্মু, ৫৩৩-৫৪০

দর্শন ভাবনা

৯। **ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় বৌদ্ধ নৈতিক দর্শনের আলোকে এর তাৎপর্য ও আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা**
ড. সঞ্জয় পাল, ৫৪১-৫৪৮

১০। **ব্রহ্মবিহারভাবনা: এক অভিনব ভাবনা**
তনুজা খাতুন, ৫৪৯-৫৫৬

১১। **সকল বিজ্ঞানের রাণী ও জননী হিসেবে দর্শন: একটি সমীক্ষণ**
খোকন সেখ, ৫৫৭-৫৬৩

১২। **অরবিন্দের দর্শন চিন্তার আলোকে মানবোত্তরণ: একটি সমীক্ষা**
জয়দেব হাজরা, ৫৬৪-৫৬৯

১৩। **প্রসঙ্গ নৈতিক আদর্শ ও মুল্যবোধ: প্রেক্ষাপট ভারতীয় নীতিদর্শন**
পারমিতা রায়, ৫৭০-৫৭৬

১৪। **সাক্ষীপ্রতীতি দ্বারা অজ্ঞানের সিদ্ধি: মাধ্ব এবং অদ্বৈতমত বিচার**
রাহুল ভৌমিক, ৫৭৭-৫৮৪

১৫। **সাংখ্যদর্শনে কল্যাণতত্ত্ব**
দিব্যা চৌধুরী, ৫৮৫-৫৯১

লোকসংস্কৃতি

১৬। **উত্তর ত্রিপুরার বিবাহকেন্দ্রীক লোকাচার: বাঙালি হিন্দুসমাজ**
রাজু নাথ, ৫৯২-৫৯৮

বিবিধ

১৭। **ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সূত্রপাত: ভাসানীর "সাপ্তাহিক হক কথা"-র আলোকে**
তাপস দাস ও বিমল সরকার, ৫৯৯-৬১২

১৮। **চিকিৎসা নৈতিকতার সংকট প্রেক্ষিত বাংলাদেশ**
কাজী মাহফুজা হক, ৬১৩-৬২৩

১৯। **নারী মনস্তত্ত্বের আলোকে 'মেয়েলি সংলাপ'**
ড. পৌলোমী রায়, ৬২৪-৬৩৬

২০। **কর্তব্য, ন্যায় ও সংহতি: বাংলাদেশে অধিকার-আন্দোলনে ব্যক্তির নৈতিক অংশগ্রহণের দার্শনিক ভিত্তি**
কাজী মাহফুজা হক, ৬৩৭-৬৪৬

২১। **বাংলার ঘর-গৃহস্থালি ও চাকর-বাকর: দাসবৃত্তির ইতিহাস ও পরিণতি বিষয়ক একটি তথ্যগত সংক্ষিপ্ত আলোচনা**
তুলিকা বণিক, ৬৪৭-৬৫৫

২২। **ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছন্দ চিন্তা এবং বাংলা ছন্দে তাঁর অবদান**
সুমন মোদক, ৬৫৬-৬৬৩

২৩। **'বাঙ্গলার কথা' ও 'বাঙালি পেট্রিয়টিজম্': ব্যক্তিত্ব ও ব্যবধান: একটি তুলনামূলক আলোচনা**
রাহুল মণ্ডল, ৬৬৪-৬৭২

২৪। **স্বাধীন ভারতের শিখ পরিচিতির আন্দোলন: পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা**
শুক্লা মণ্ডল, ৬৭৩-৬৮০

২৫। **উন্নয়ন ও স্থানচ্যুতি: একটি পর্যালোচনা**
রাজেশ মন্ডল, ৬৮১-৬৮৯

২৬। **সমরেশ বসুর 'গঙ্গা': ধীবর সংস্কৃতির আলোকে**
প্রিয়া দে, ৬৯০-৬৯৬

Guidelines, Review Process & Publication Ethics, Page No: 697
Publication Charge, Page No: 699

সম্পাদকীয়

বাংলা গবেষণা পত্রিকা হিসেবে আত্মদীপ বর্তমানে একটি সম্মানজনক স্থান অধিকার করেছে, যার একমাত্র কৃতিত্ব লেখক, রিভিউয়ার এবং সম্পাদকমণ্ডলীর। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আত্মদীপ গবেষণা পত্রিকা হিসেবে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে, যা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। এই পথের সহযাত্রী হিসেবে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, আপনাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। বহু বিষয় গত সংখ্যাগুলিতে সংযোজিত হয়েছে যা বাংলা সাহিত্যের গবেষণাকে একটি নতুনা মাত্রা এনে দিয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। আত্মদীপের এই পর্বের নির্বাচিত লেখাগুলোকে কথাসাহিত্য, নাট্যভাবনা, দর্শন, লোকসংস্কৃতি, বিবিধ ইত্যাদি নানারকম ভাগে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে। যারা বাংলা ভাষায় লিখছেন, গবেষণা করছেন তাদের ভাবনাগুলোকে প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়াই এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য।

আত্মদীপ পত্রিকা শুধু সাহিত্যকেন্দ্রিক নয়, বাংলা ভাষায়, যে কোন বিষয় নিয়ে লেখা গবেষণামূলক পত্রিকা। পত্রিকাটি অনলাইন এবং প্রিন্ট দুভাবেই প্রকাশিত হওয়ায় গবেষক এবং লেখকদের অনেকটা সাহায্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রতিটি প্রবন্ধে DOI (Digital Object Identifier) সংযুক্ত হওয়ায় প্রবন্ধগুলি আন্তর্জাতিক আর্কাইভ এবং যে কোনো গবেষককে প্রবন্ধের রেফারেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই সাহায্য হবে। তাছাড়া প্রতিটি প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক আর্কাইভে (https://archive.org/) সংরক্ষিত রয়েছে। আত্মদীপ জার্নালের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের ইন্ডেক্সিং রয়েছে এবং International Journal Indexing (www.ijindexing.com) এর দ্বারা প্রদত্ত Impact Factor ৮.৫।

আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি বাংলা ভাষায় এটি একটি অন্যতম জার্নাল যা সম্পূর্ণ গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে লেখা প্রকাশিত হয়ে থাকে। যে কোনো প্রবন্ধ জমা দেওয়ার পর সেটিতে AI কিংবা Plagiarism আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করা হয় এবং তারপর রিভিউ এর জন্য পাঠানো হয়। রিভিউতে তা গ্রহণযোগ্য কিংবা রিভিউ রিপোর্ট অনুযায়ী প্রবন্ধ উপস্থাপিত হলেই তা প্রকাশ করা হয়।

ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে যারা এই সংখ্যায় লেখা দিয়েছেন এবং পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী, যারা আমাদের আহ্বানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আত্মদীপের পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ৩১শে মার্চ, ২০২৬।

ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য
মুখ্য সম্পাদক
এবং সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
করিমগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, শ্রীভূমি, অসম।
আজিজুল সেখ
সহ-সম্পাদক
গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 479-486
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.234

আশাকাঙ্ক্ষী মানুষের অন্তর্লোক উদ্ঘাটনে বনফুলের প্রথম উপন্যাস ‘তৃণখণ্ড’

ড. বরুণ কুমার সাহা, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 20.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Writer Balaichand Mukhopadhyay, who is popularly known as Banaphul, has contributed a lot to the Bengali fictional literature in twentieth century. Like Conan Doyle, Archibald Joseph Cronin, Somerset Maugham, Anton Chekhov— Banaphul was also professionally a doctor. Impact of professional experiences of Balaichand in the novel and short stories may be considered as a significant and exceptional contribution in Bengali literature. In this research article we have mainly focused on the first novel of Balaichand Mukhopadhyay ‘Trinakhanda’ which was published at his young age in 1935. Professional experiences, poetic sense and philosophical thought of the writer have merged in ‘Trinakhana’ artistically and the writer presented that with literary excellence. In this research work we will also highlight how the writer revealed the hopes and aspirations of human mind in artistic manner.

Keywords: Banaphul, Novel, Trinakhanada, Human mind, Literary Presentation

বনফুল নামের খ্যাত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস ‘তৃণখণ্ড’ যা প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। লেখকের বয়স তখন প্রায় ছত্রিশ। ব্যক্তিজীবনের পর্যবেক্ষণ শক্তি, ডাক্তারি অভিজ্ঞতা, জীবনজিজ্ঞাসা ইত্যাদি অর্জিত জ্ঞান অভিনব শৈলীতে উপস্থাপন করে প্রথম উপন্যাসেই যেন নিজের সাহিত্যিক সম্ভাবনা ও উৎকর্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। অর্থাৎ ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা ও সেটার শিল্পরূপায়ণের মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর উপন্যাসের যাত্রা শুরু করেন। মেডিকেলের ছাত্রাবস্থাকালেই তাঁর মধ্যেকার ডাক্তারি ও লেখক সত্তার সম্পৃক্তভাব জেগে ওঠে। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন—

> “মেডিকেল কলেজে আমি অনেক সময় খালি ক্লাসরুমে বসিয়া থাকিতাম। প্রকাণ্ড ঘরে নির্জন গ্যালারিতে বসিয়া থাকিতে খুব ভালো লাগিত। নির্জন পরিবেশ না হইলে আমি লিখতে পারি না। মেডিকেল কলেজের খালি ক্লাসরুমগুলিতেই সেই নির্জনতা পাইতাম। একদিন ‘বাড়তি মাশুল’, ‘অজান্তে’, প্রভৃতি চার-পাঁচটি গল্প একসঙ্গে লিখিয়া ফেলিলাম। লিখিবার পর মনে হইল এগুলি গল্প হইল তো?”[১]

বলাবাহুল্য, তাঁর ক্ষুদ্র পরিসরের এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার সূচনা করেছিল। পেশাগত জীবনের সূত্রপাত ঘটিয়ে তিনি চিকিৎসা জগতের বিশাল ক্ষেত্রে একজন সফল ডাক্তার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পাশাপাশি আহরণ করতে লাগলেন মানব জীবনের নানা অধরা দিকগুলি। ১৯২৮ খৃস্টাব্দে তিনি আলিমগঞ্জ হাসপাতালে চাকরি পেয়েছিলেন এবং পরে সেটা ছেড়ে দিয়ে নিজেই প্র্যাক্টিস শুরু করেন।

একদিকে ডাক্তারি পেশা এবং অন্যদিকে সাহিত্য রচনার নেশা, এই দুই-এর মধ্যে খুব মসৃণ ভাবে বনফুল নিজের ভারসাম্য বজায় রেখেছিলেন। আমরা জানি যে মহান সাহিত্যিক Anton Chekhov-ও পেশায় একজন ডাক্তার ছিলেন এবং নিজের এই দুই সত্তা সম্পর্কে একটি চিঠিতে তিনি জানিছিলেন,

> "I felt more confident and satisfied with myself when I reflect that I have two professions and not one. Medicine is my lawful wife and literature is my mistress; when I get tired of one, I spent the night with the other."[২]

চেখবের এই বক্তব্যটি বনফুলের ক্ষেত্রেও সুন্দর ভাবে প্রযোজ্য বলে মনে হতে পারে। হয়তো সেজন্যই রাজশেখর বসু খুব তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন—

> "বঙ্কিম ডেপুটি যথা, রবি জমিদার
> তেমনি ভিষক তুমি বিধির বিধানে
> নেশা তব মানিল না পেশার বাঁধন
> বনফুল দিল চাপা বলাই ডাক্তারে"[৩]

বনফুলের পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ও একজন সুচিকিৎসক ছিলেন। বনফুল 'উদয়-অস্ত' উপন্যাসটি পিতার স্মৃতিতে লিখেছিলেন। বনফুল নিজেই বলেছেন,

> "আমাদের বাড়িতে দিন রাত রোগীদের ভিড় লেগেই থাকত। তাঁদের নরনারায়ণ জ্ঞানে তিনি (পিতা) সেবা করতেন, আজকের মতো ভিখারী বিদায়ের রেওয়াজ ছিল না। ফলে বাবাকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত। আমাদের যা কিছু হয়েছে তার পেছনে ছিল এই অগণিত আরোগ্য-কামী মানুষের আশীর্বাদ ও শুভকামনা।"[৪]

অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে মানব সেবার মহান কর্মটির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পেছনে ছিল তাঁর পারিবারিক সংস্কার, পরিবেশ ও শিক্ষা। চিকিৎসা সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার পর সেই পেশাগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে সঞ্চিত নানা রকম প্লটগুলি তিনি গল্প-উপন্যাসে সার্থক ভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে এক অসাধারণ ভাবনা নিয়ে মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি লিখে ফেললেন জীবনের প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড'[৫]। এরকম আরও বেশ কয়েকটি উপন্যাস তিনি লিখেছেন যেখানে ডাক্তার চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বা ডাক্তারি প্রসঙ্গ রয়েছে, যেমন— 'বৈতরণী তীরে', 'কিছুক্ষণ', 'নির্মোক', 'অগ্নীশ্বর', 'হাটেবাজারে', 'ত্রিবর্ণ', 'তীর্থের কাক', 'এরাও আছে' ইত্যাদি।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'তৃণখণ্ড' সার্থক উপন্যাস হয়েছে কি-না, এই নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলতে চান। প্রথম অবস্থায় পরিমল গোস্বামী এই রচনাটি শনিবারের চিঠিতে ছাপাতে আগ্রহ প্রকাশ করেননি, কারণ রচনাটি তাঁর অপছন্দ হয়েছিল। তবে কপিল ভট্টাচার্য উপন্যাসটির মধ্যে নতুনত্ব খুঁজে পান এবং উৎসাহের সঙ্গে ছাপান। এর জন্য বনফুল অগ্রিম ১০০ টাকাও লাভ করেন[৬]। বলা যেতে পারে যে এটাই ছিল বনফুলের ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ ও উপার্জন। এক্ষেত্রে আত্মজীবনী পশ্চাৎপটে তিনি বলেছেন,

> "সাহিত্য চর্চা করিয়া যে অর্থাগম হইবে, একথা কখনও ভাবি নাই। কিন্তু সেই অর্থ যখন আপনি আসিতে লাগিল, তখন পুলকিত হইলাম।"[৭]

এবার আমরা 'তৃণখণ্ড' উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব এবং দেখাব যে কীভাবে ডাক্তারি অভিজ্ঞতা, কবিত্ব প্রতিভা ও দার্শনিক ভাবনার ত্রিবেণী সঙ্গম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে উপন্যাসটি।

বিষয়বস্তু আলোচনা: ডাক্তারি অভিজ্ঞতা-পুষ্ট ও উত্তম পুরুষে বর্ণিত 'তৃণখণ্ড' উপন্যাসটির নায়কের মধ্যে বনফুলের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেখক মানুষের শারীরিক রোগ-ব্যাধির পাশাপাশি মানব মনের বিচিত্রতার দিকটাকেও আলোকপাত করে উপন্যাস জগতে নিজের হাতটাকে পাকিয়ে নিয়েছেন। তার মতে—

> "আশ্চর্য মানুষের মন। আমার নিজের মনের দিকে তাকাইয়া দেখি আর বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাই।"[৮]

উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে তেমন কোনও ধারাবাহিকতা নেই, বরং মনে হয় বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলিকে লেখক এক সঙ্গে গেঁথেছেন যা স্বতন্ত্র ভাবে একেকটি বনফুলি ঢঙের ছোটগল্প বা অণুগল্প হয়েও উঠতে পারে। অবশ্য কাহিনির তুলনায় এখানে গুরুত্ব পেয়েছে লেখকের জীবনাভিজ্ঞতা, মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়ে টিকে থাকার লড়াই ও ভাবুক নায়কের হৃদয়ের উত্থান-পতনের ছবি। উপন্যাসের শুরুতেই বলাইচাঁদের ডাক্তারি সত্তা ও কল্পনা-প্রবণ কবি মনের আত্মপ্রকাশ ঘাটেছে এভাবে—

"কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে। হ্যাঁ, জ্বর বই কি। তাঁহাকে বসিয়া চিঠি লিখিতেছি। অন্যায়, তবু লিখিলাম। সে অপরের বাগদত্তা জানিয়াও আমার কাব্য প্রেরণা কিছুমাত্র কমিতেছে না। জ্বরে প্রলাপ বকিতেছি।

মনের আকুতি বুঝাব কেমনে কথায় বলি,
কি করে প্রকাশ করিব বল না—কিছু না জানি,
গভীর সাগরে বাড়ব-অনল মরিছে জ্বলি,
বুঝাব কি করে সাগর-জলের জ্বালায় বাণী!"[৯]

বিগত স্বল্প কয়েকদিনের ডাক্তারি অভিজ্ঞতার দ্বারাই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বনফুল উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের মায়াখেলা। লীলা রায় এই ক্ষেত্রে যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন—

> "Balai Chand Mukherji, the powerful writer known as 'Banaphul', is a doctor by profession. Like Somerset Maugham, he looks at the world through the eyes of the medical practitioner and has had a medical man's opportunities for observation. This has affected his work in several ways. At least two of his books, *Trina Khanda* (Blades of Grass) and *Baitarini Tire* (On the Bank of the Styx) are fascinating case histories with the main story unfolding itself in off-the-record musings of the central character, the doctor himself."[১০]

উপন্যাসের নামকরণ ও বিষয়বস্তু থেকেই এ কথা স্পষ্ট যে লেখক চিকিৎসা অভিজ্ঞটাগুলিকে অবলম্বন করে জীবনের কোনও একটি বিশেষ দিককে উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। পৃথিবীর সমস্ত কিছুই একটি নির্দিষ্ট চক্রে আবর্তিত হয়। আশার বশবর্তী হয়ে অথবা স্বার্থে আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সেই চক্রটিকে ভাঙবার চেষ্টা করে বা সেটা ভাঙার স্বপ্ন দেখে। আশা এই ক্ষেত্রে মানুষের জীবনকে প্রতিনিয়ত নাচিয়ে চলেছে এবং মানুষও বোকার মতো নেচে চলেছে। উপন্যাসের মূল বিষয়টি লেখক একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন উপন্যাসের শেষ প্রান্তে এসে—

> "ম্যালেরিয়া, আমাশয়, বেরিবেরি, ফোড়া, দাদ— মানুষের ব্যাধিরও শেষ নাই, আমাদের অজ্ঞতারও শেষ নাই! অথচ মজ্জামান লোকে তৃণখণ্ড জানিয়াও তাহার দিকে হাত বাড়াইবে, ইহা তাহার মজ্জাগত দুর্বলতা। আমরা সেই হতভাগ্য তৃণখণ্ড। ভাসিয়া চলিয়াছি— ডুবন্ত মানুষ কখন আমাদের দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে!"[১১]

বনফুলের ডাক্তারি জীবনের আরেকটি প্রচ্ছন্ন দিক লুকিয়ে রয়েছে এই উপন্যাসের অন্য একটি অংশে। আগাগোড়াই আমরা উপন্যাসটিতে নায়ক-ডাক্তারকে একটি কল্পনা রাজ্যে ভেসে থাকতে দেখেছি। উপন্যাসের ১১ নম্বর অংশে তিনি একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। কোনও এক প্রেয়সীর সঙ্গে মুখোমুখি কথোপকথনে উঠে এসেছে একটি নাম। প্রেয়সী জানতে চেয়েছে যে সে আর কোনও নারীকে এমন করে ভালবেসেছে কি-না। উত্তরে ডক্তার বলেছেন—

> "হ্যাঁ- নার্স ব্রাউনকে!"
>
> "আর ?"
>
> "অত মনে নেই। তোমাকে পেয়ে সব্বাইকে ভুলে গেছি।"[১২]

বনফুল আত্মজীবনী 'পশ্চাৎপট'-এও এমন একজন স্কটল্যান্ডবাসী নার্সের কথা উল্লেখ করেছেন (ইচ্ছাকৃত ভাবে বনফুল তার নামটা উহ্য রেখেছেন) যাঁর উদ্দেশ্যে তিনি একটি ইংরাজি কবিতা লিখেছিলেন এবং তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন—

> "Evening speaks in golden clouds
> Morning speaks in light
> Flowers speak in scented petals
> Lightening speaks in flight.
> The manner in which they express
> Is simple, plain and sweet
> But what we do, we human beings?
> We know not how to do it.
> When the heart is full and feelings melting
> We try to hide and alter
> When the eyes speak the tongue denies
> Words fail of falter.
> I know not how to word my feelings
> How to call my muse
> I wish I had the knack of Nature
> To sing in Light and Hues."[১৩]

পরবর্তী সময়ে এই কবিতাংশটি তিনি 'ডানা' উপন্যাসে ব্যবহার করেছিলেন। লক্ষনীয় বিষয়, যে-সময় বনফুল এই উপন্যাসটি লিখছেন তার বহু আগেই তিনি তাঁর জীবনে স্ত্রী লীলাবতীর সঙ্গ পেয়েছিলেন এবং 'তোমাকে পেয়ে সব্বাইকে ভুলে গেছি' এই কথাগুলি নায়ক স্বপ্নের মধ্যে অনুভব করলেও লেখকের বাস্তব জীবনের সঙ্গে এর একটি সংযোগ ছিল বলে বোঝা যায়।

উপন্যাসে লেখক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের শারীরিক ও রহস্যময় মানসিক দিকগুলিকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করেছেন। মানুষের জীবন বৈচিত্র্যময়, অনিশ্চয়তায় ভরা। অথচ নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তারা সদা ব্যস্ত। পরিণাম অবশ্যম্ভাবী জেনেও তারা স্বপ্ন দেখতে ভোলে না। নিজেদের ক্ষমতা সীমিত জেনেও প্রাণপণে ছুটে চলে অনির্দিষ্টের দিকে। নিশীথ মুখোপাধ্যায়ের মতে—

> "ডাক্তার এখানে তাঁর মনের অনুবীক্ষণযন্ত্রে মানব মনের দুরারোগ্য ব্যাধির বিষাক্ত জীবানুগুলিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রবৃত্তিতাড়িত ভারসাম্যহীন মানুষগুলি কেমন ভাবে অসহায় তৃণখণ্ডের মত ভেসে চলেছে, বনফুল তারই চলমান ছবি এঁকেছেন এখানে। অবদমিত আকাঙ্ক্ষার তীব্র খরস্রোতে মানুষের রুচিবোধ কীভাবে সামান্য খড়কুটোর মতো ভেসে যায়, ডাক্তারী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা দেখিয়েছেন লেখক।"[১৪]

জীবনের এই অদ্ভুত মায়া-খেলা লেখকের মনে গভীর ভাবে ছায়া ফেলেছে। সব কিছুরই পরিণাম আছে, আর সেটা ভুলে থাকার প্রবণতা মানুষের মধ্যে প্রবল। তাই লেখক বলেছেন যে এই জীবন আজ আছে, হয়তো কাল থাকবে না, 'স্রোতমুখে তৃণ-খণ্ড'-এর মতো জীবনের স্রোতে ভেসে যেতে হবে তাকে।

উপন্যাসের শুরুতেই দেখি যে কাহিনি শুরু হয়েছে এক ডাক্তারকে দিয়ে যিনি বিরহানলে দগ্ধ এক প্রেমিকও বটে। ডাক্তারের ভাবুক কবি-মন ডাক্তারি সত্তায় ফিরে আসে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ডাকে। স্ত্রী সম্পর্কে আগন্তুক বলেন—

> "বেশ ভাল মানুষ—যাত্রা শুনতে গেল। রাত ১১তা নাগাদ ফিরে এল— একটি বদ্ধ উন্মাদ।"[১৫]

পাগল মহিলাটির কণ্ঠে লেখক খুব সচেতন ভাবেই একটি গান সংযোজন করেছেন, 'কোথায় গেলি নন্দদুলাল/ কোথারে তুই ননী চোর—'। এরপরই সেই উন্মাদিনী অপেক্ষারত অন্য এক অভিভাবকের কোলের সন্তানের কাছে গিয়ে 'ছোঁ মারিয়া খোকাকে কাড়িয়া লইয়া প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিল।' ডাক্তার জ্বরে আক্রান্ত সেই খোকাকে উদ্ধার করলে মহিলাটি আক্ষেপ করে বলেন, 'আমার কাছে কোন খোকাই আসে না। কেউ আসে না...'। পূর্বের গানের 'ননী চোর নন্দদুলালের' সঙ্গে এই ঘটনাটিকে জোড়া লাগিয়ে ডাক্তার রোগের কারণ উদ্ধার করতে সক্ষম হন এবং সেই প্রৌঢ়কে প্রশ্ন করেন, "কতদিন পূর্বে আপনার 'গনোরিয়া" হয়েছিল?" অর্থাৎ সেই ভদ্রলোকের যৌনরোগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াই যে স্ত্রীর মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণ সে-কথা খুব কৌশলের সঙ্গে বুঝিয়ে দিয়ে লেখক যেন এই কথাই বোঝাতে চাইছেন যে সমস্ত ঘটনাই প্রকৃতপক্ষে কোনো-না-কোনো ঘটনা বা কার্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

রোগীর শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা নিয়ে চিকিৎসা করার পাশাপাশি যখনই গল্পের নায়ক-ডাক্তার সুযোগ পেয়েছেন মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনকে উপলব্ধি করার পাশাপাশি নিজের ভাবুক কবি সত্ত্বাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি ভেবেছেন—

> "মানুষের অহরহ বিবর্তন। আজকের-আমি দশ বৎসর কেন, কয়েক মাস পরেই আর একজন লোক হইয়া যাইব।"[১৬]

এভাবেই লেখক উপন্যাসের আদি-মধ্য-অন্ত্যহীন অগতানুগতিক কাহিনিধারায় জীবনের গুঢ় ও রহস্যময় ভাবনাটিকে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মধ্যে ধরার চেষ্টা করেছেন।

নায়ক চরিত্রের বহুমুখী রূপ:

এই উপন্যাসে নায়ক চরিত্রটিকে প্রধানত তিনটি রূপে আমরা পেয়ে থাকি, প্রথম ডাক্তার, দ্বিতীয়ত কবি এবং তৃতীয়ত দার্শনিক। রোগীর সংস্পর্শ ছাড়া তিনি বরাবরই একজন কবি তথা ভাবুক। লেখক বনফুল যেন তাঁর সকল কবিত্বসত্তা এখানে ঢেলে দিয়েছেন—

"সকালে উঠিয়া অবধি দেখিতেছি আকাশে বাতাসে বর্ষার আয়োজন... উঠানে কদম্ব গাছটায় অসংখ্য ফুল। হাতে কোন কাজকর্ম নাই, একটিও রোগীর দেখা নাই... অলসভাবে বিছানায় বসিয়া বর্ষা-সমারোহ দেখিতেছি। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'— মনে পড়িতেছে... বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—

আজিকে যদিও সখী, আষাঢ়ের তৃতীয় দিবস
এবং যদিও নাম মোর
নহে কবি কালিদাস, নহি উজ্জয়িনীবাসী,
ছদ্মবেশ ত্যাগ করিতে পারি না!"[১৭]

কবিত্ব সত্তার চরম অনুভূতির মধ্যে দিয়ে নায়কের দার্শনিক সত্তা যেন ঝলক দিয়ে ওঠে,

> "চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, অথচ পারি না। এই যে সংযম, ইহাই তো জীবনের চরম ট্রাজেডি! হয়ত তাই এত সুন্দর!"[১৮]

নায়কের দার্শনিক-সত্তা সবসময় কবি-সত্তার অনুগামী, তবে ডাক্তারি-সত্তা ও কবি-মনের মধ্যে সবসময়ই একটা ফ্ল্যাকচুয়েশন লক্ষ করা যায়। তাই যখন নায়ক 'অবিশ্রান্ত বৃষ্টি', 'আকাশের গুরু গুরু ডাক' ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আপন মনের উচ্ছ্বাসের চিৎকারকে চেপে রাখছেন, ঠিক তখনই রোগীর আবির্ভাব ঘটিয়ে লেখক বনফুল কাহিনি-ভাবনার চলমানতায় যেন একটা নতুন মোড় এনে দিয়ে পাঠকে সজাগ করে তুলেছেন। আবার চিকিৎসা সমাপ্ত হলে সেই ডাক্তার যেন ফিরে এসেছেন নিজের কবিসত্তায়, ভাবুক মনটাকে নিয়ে গেছেন জীবনের গুঢ় রহস্যের সন্ধানে। এভাবেই নায়ক চরিত্রটি তিন বিন্দুযুক্ত একটি চক্রের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে।

উপন্যাসের নামকরণ:

উপন্যাসের 'তৃণখণ্ড' নামকরণটি মূলত প্লটের ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে নায়ক আক্ষেপ করছেন, কারণ জীবনের চলমানতা অনেকটা একঘেয়েমি হয়ে উঠেছে তার কাছে। তবে সেই একঘেয়েমির মধ্যেও তার ডাক্তারি-সত্তা উপলব্ধি করেছে জীবনের মর্মবাণী—

> "ম্যালেরিয়া, আমাশয়, বেরিবেরি, ফোড়া, দাদ—মানুষের ব্যাধিরও শেষ নাই, আমাদের অজ্ঞতারও শেষ নাই! অথচ মজ্জমান লওকে তৃণখণ্ড জানিয়াও তাহার দিকে হাত বাড়াইবে, ইহা তাহার মজ্জাগত দুর্বলতা। আমরা সেই হতভাগ্য তৃণখণ্ড। ভাসিয়া চলিয়াছি—ডুবিন্ত মানুষ কখন আমাদের দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে!"[১৯]

নায়কের আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মমন্থনই এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। নিজের ভালোবাসার প্রতি সন্দিহান হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করেছেন নায়ক— "আচ্ছা তাহাকেও কি আমি ঠিক চিনিয়াছি? সে কি তাই, যাহা আমি ভাবি! সে তো আমার এত ভালবাসা অগ্রাহ্য করিয়া ওপরের বাগদত্তা হইয়া বসিয়া আছে!"[২০] মানুষের মন যে অতি আশ্চর্যকর সে-কথা উপন্যাসের অন্তে এসে যেন আরও প্রকট হয়ে উঠেছে লেখকের কলমে। আত্মবিশ্লেষণ করে লেখক ভাবছেন তার ডাক্তারি পেশার কথা। তার চিকিৎসায় রোগী কখনো বাঁচে, কখনো মৃত্যু হয়, টাকা রোজগার হয় এবং এভাব একঘেয়েমি জীবনে কখনো কখনো জীবনের প্রতি তার মনে বিতৃষ্ণাও জন্মে। কখনো 'কল' কম থাকলেও অশান্তিতে ভোগেন তিনি। মনের এই অস্থিরতাকে যেন তিনি কিছুতেই বশ মানাতে পারছেন না। নায়ক অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন, হয়তো সেজন্যই বুঝি শেষ বয়সে মানুষ ভগবানের সন্ধান করেন, অর্থাৎ এমন একটা জিনিসকে আশা করে যা পাওয়া যায় না, ফলে মোহ ফুরোয় না। নায়কও সেরকম 'না ফুরনো' বিষয়ের সন্ধান করতে গিয়ে চোখ বুজে ভগবানের সন্ধান করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তখনই আবার তার সেই প্রেমিক সত্তা জেগে উঠে, ভগবানের পরিবর্তে ভেসে ওঠে 'তার' ছবি, যার কথা নায়কের মনকে আঁকড়ে ধরে থাকে সারাক্ষণ। তাই তিনি বলে ওঠেন, 'অবর্ণনীয় সে চাহনি!' লেখক সেই মধু-স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে বেঁচে থাকতে চান। তিনি ডাক্তার, আপাতদৃষ্টিতে ইহজন্ম-পরজন্মের ধারণা তাকে প্রভাবিত করার কথা নয়। কিন্তু তার কবি-সত্তা যেন বার বার পরজন্মের বিশ্বাসকে উসকে দিয়ে তার আশাবাদী মনকে উজ্জীবিত করে রেখেছে, "বিশ্বাস করিতে ইচ্ছে হয়, এই জীবনের পরপারে আবার আমাদের মিলন হইবে।"[২১]

বিষ্ণু দে উল্লেখ করেছেন, "তৃণখণ্ড-এর মধ্যে জীবনমৃত্যুর যে আশ্চর্য রহস্য অভিব্যক্ত হয়েছে তার তুলনা খুব কমই মেলে।"[২২] কাব্যানুভূতি দিয়ে সমাপ্ত উপন্যাসের শেষটি তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ,

"স্রোতমুখে তৃণ-খণ্ড! বক্ষে তার প্রেম-মরীচিকা
দুঃখ সুখে কাঁপে তার স্নায়ু!
আঁধারে পড়িতে চাহে অদৃষ্টের রহস্য-লিপিকা
লয়ে অল্প অনিশ্চিত আয়ু!"[২৩]

উপসংহার:

জীবনের লীলাখেলায় মানুষ মৃত্যু কিংবা বিচ্ছেদকে অবশ্যম্ভাবী জেনেও গ্রাহ্য করতে অনিচ্ছুক। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মৃত্যুর নিশ্চিত পরিণতিকে পরাস্ত করতে চায় মানুষ। 'স্রোতমুখে তৃণ-খণ্ড' আকড়ে বাঁচার জন্য শ্বাস নিতে চায় অসহায় মানুষ। ডাক্তার-নায়ক এখানে যেন নিজেই 'তৃণখণ্ড' রূপে প্রতীক হিসেবে চিত্রিত, যাকে আঁকড়ে ধরে অগণন অসুস্থ মানুষ রক্ষা পেতে চাইছে, শ্বাস নিতে চাইছে, বাঁচতে চাইছে। অন্যদিকে নায়ক, যার কবিত্ব সত্তা তাকে বারে বারে ভাবুক তথা আবেগিক করে তুলেছে, সে-ও যেন স্রোত-মুখে ভেসে চলেছে 'তার' খেয়ালে। এখানে 'তার' বলতে সেই নায়িকাকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে নায়কের কাছে সঞ্জীবনী শক্তি। ভাবপ্রধান এই উপন্যাসটিতে তাই 'তৃণখণ্ড' হচ্ছে একটি আশাবাদী সত্তা। কাহিনির নায়ক কখনো নিজে তৃণখণ্ডের ভূমিকায় রয়েছেন, আবার কখনো স্রোতমুখে হাত বাড়িয়ে অপরের বাগ্‌দত্তা সেই নায়িকাকে তৃণখণ্ডরূপে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। এখানেই ভাবপ্রধান এই উপন্যাসটির সার্থকতা। উপন্যাসটিতে আমরা লক্ষ করেছি যে তরুণ লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ডাক্তারি অভিজ্ঞতা, কবিত্বশক্তি, দার্শনিক ভাবনা ইত্যাদি সমস্ত কিছুর সংমিশ্রণের মাধ্যমে নিজের প্রথম উপন্যাসটিকে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে কথাসাহিত্য রূপে চিত্রিত করেছেন। তাঁর এই প্রয়াস বাংলা সাহিত্যধারাকে বৈচিত্র্য প্রদান করার পাশাপাশি সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

---

[১] বনফুল। পশ্চাৎপট। বাণীশিল্প, ১ম সংস্করণ ১৯৯৯। কলকাতা। পৃষ্ঠা ১০৭।

[২] ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ সালে (মস্কো) A.S. Suvorin –এর লেখা চিঠির অংশবিশেষ।
Internet Source:
https://ebooks.adelaide.edu.au/c/chekhov/anton/c51lt/chapter24.html, Dt.07.04.2016

[৩] বসু, রাজশেখর। বনফুল। বনফুলের শতবর্ষের আলোয় (পবিত্র সরকার সম্পাদিত)। বনফুল জন্ম শতবর্ষ সমিতি, ১৯৯৯, কলকাতা। পৃষ্ঠা ৭৬।

[৪] বনফুল। কোথায় গেল সেই মেয়েরা। বনফুল প্রবন্ধ সংগ্রহ। সুজন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ২০১০। পৃষ্ঠা ২১৯

[৫] দাস, সজনীকান্ত। আত্মস্মৃতি। নাথ পাবলিকেশন, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬। কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৯৫।

[৬] বনফুল। পশ্চাৎপট। পৃষ্ঠা ১৯৫।

[৭] তদেব, পৃষ্ঠা ১৯৯।

[৮] বনফুল। তৃণখণ্ড। বনফুল উপন্যাস সমগ্র (খণ্ড ১), নিউ বেঙ্গল প্রেস, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯। পৃষ্ঠা ৪।

[৯] তদেব, পৃষ্ঠা ১।

[১০] রায়, লীলা। বনফুল। বনফুলের শতবর্ষের আলোয় (পবিত্র সরকার সম্পাদিত)। পৃষ্ঠা ৯১।

[১১] বনফুল। তৃণখণ্ড। বনফুল উপন্যাস সমগ্র (খণ্ড ১)। পৃষ্ঠা ৪১

[১২] তদেব, পৃষ্ঠা ৪৫।

[১৩] বনফুল। পশ্চাৎপট। পৃষ্ঠা ১৯৫।

[১৪] মুখোপাধ্যায়, নিশীথ। বনফুলের জীবন ও সাহিত্য। বর্ণালী, ১ম প্রকাশ ১৯৯৮। কলকাতা। পৃষ্ঠা ৪১।

[১৫] বনফুল। তৃণখণ্ড। বনফুল উপন্যাস সমগ্র (খণ্ড ১)। পৃষ্ঠা ২।

[১৬] তদেব, পৃষ্ঠা ৪।

[১৭] তদেব, পৃষ্ঠা ১৩।

[১৮] তদেব, পৃষ্ঠা ১৪।

[১৯] তদেব, পৃষ্ঠা ৪১।

[২০] তদেব, পৃষ্ঠা ৫০।

[২১] তদেব, পৃষ্ঠা ৫১।

[২২] তদেব, চার, ভূমিকা।

[২৩] তদেব, পৃষ্ঠা ৫২।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 487-494
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.235

নতুন ভোরের সন্ধানে বাজিকরের পথ চলা: প্রসঙ্গ ‘রহু চণ্ডালের হাড়’

ড. অর্পিতা রায় মৌলিক, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বজবজ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.12.2025; Accepted: 20.12.2025; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Abhijit Sen's novel '*Rahu Chandaler Haar*' is a unique creation of Bengali Literature. In this novel, the author introduces the reader to a specific nomadic clan called Bajikar. Bajikar verily refers to rootless nomads. Any thought of stability in life is as if a utopian concept for them. But they do realize the importance of being stable in life. As such, nurturing pure faith in their ancestor Rahu, Bajikars search for their own piece of land that will define their existence. This novel has portrayed this timeless journey of the Bajikars and thereby the readers get introduced to many an episode of history and the-then political scenario. In this sense, '*Rahu Chandaler Haar*' is also a burning documentary of the era. The storyline of the novel has been skillfully woven within a temporal frame that starts a bit before the partition of the country and culminates roughly in the middle of the twentieth century; thus, depicting the societal, historical and political situation of that period.

Along with various stories, myths, beliefs, traditions prevalent among them, Abhijit Sen's narrative beautifully pictures the Bajikar's struggle for existence and their quest for a new dawn. The present discussion is an attempt to highlight this religion-less, land-less Bajikar's life-long journey towards preserving its existence.

Keywords: Bajikar, Journey, Myths, Rootless, Existence, Stability

অভিজিৎ সেনের লেখা *‘রহু চণ্ডালের হাড়’* এক সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের উপন্যাস। যদি আমরা ভাবি যে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক উপন্যাস হিসেবেই অভিজিৎ সেন একে সৃজন করেছেন তবে সেই ভাবনা হয়তো কিছুটা একপেশে দোষে দুষ্ট হবে। নিঃসন্দেহে এখানে এক গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবনকথা রূপায়িত হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও অনেক কিছু। আর সেই অনেক কিছুই এই উপন্যাসের মূল ভিত, যা তাকে এনে দিয়েছে এক স্বাতন্ত্র্য। তারাশঙ্করের *‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’* বা অদ্বৈত মল্লবর্মণের *‘তিতাস একটি নদীর নাম’* এর সঙ্গে এই উপন্যাসের আপাতভাবে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও তা একান্ত ভাবেই বাহ্যিক। উপন্যাসটি লেখা হয়েছে এমন এক শ্রেণির মানুষদের নিয়ে যাদের সঙ্গে শুধুমাত্র জড়িয়ে আছে ‘নেই’ নামক শব্দটি। সঙ্গত ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে যে এই শব্দটি কোন্ না থাকার দিকে ইঙ্গিত করতে চাইছে। আর এই উত্তর খোঁজার দায় থেকেই উপন্যাসে উঠে এসেছে বাজিকর নামের এক শ্রেণির কৌম মানুষদের জীবন সংগ্রামের কথা। তাদের নিজস্ব সমাজ থাকলেও সেই সমাজেও থাবা বসিয়েছে অস্তিত্বের বিপন্নতা। কারণ তাদের নেই কোন ধর্ম, নেই কোন স্থায়ী ঠিকানা। তাই সমাজের মূল স্রোতে বড় বেমানান এই বাজিকর, যা তাদের মধ্যে তৈরি করে এক অস্তিত্বের সঙ্কট। এই উপন্যাসের প্রতিটি পর্বেই অভিজিৎ সেন বাজিকরদের সেই বিপন্নতাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

উপন্যাসের আখ্যান শরীরকে ছুঁয়ে গেছে দেশ ভাগ ও তার পরবর্তী সময়পর্বের সামাজিক অবস্থার কথা। বাজিকর নামের এই যাযাবর মানুষদের জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এইসব বিষয়গুলি পাঠকের সামনে উঠে এসেছে। নির্দিষ্ট কোন চরিত্রকে প্রধান চরিত্র হিসেবে তুলে ধরে তার কাঁধেই উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এখানে লেখক কখনোই চাপান নি। প্রারম্ভিক পর্বে খুব ধীর গতিতে এগিয়ে চলা এই উপন্যাসে যে সকল চরিত্র খুব গুরুত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল পীতেম বাজিকর। কিন্তু কাহিনিস্রোত বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর উপন্যাসের জোয়াল যারা নিজের কাঁধে তুলে নেয় তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল পরতাপ ও জামির। আর শেষ পর্বে এসে সেই ভূমিকায় যাকে পাওয়া যায় সে ছিল শারিবা, যাকে উপন্যাসের শুরুতেই তার নানি লুবানির কাছে বসে নিজের পূর্বপুরুষদের কাহিনি শুনতে দেখা যায়। বস্তুত লুবানি ও শারিবার এই আলাপচারিতার সূত্র ধরেই পাঠক ধীরে ধীরে পৌঁছে যায় বাজিকরদের অন্দরমহলে, পরিচিত হয় বাজিকরী দুনিয়ার সঙ্গে। তবে এই সব কয়টি পর্বে যার নীরব উপস্থিতি আমরা প্রায় সবসময় খুঁজে পাই সে হল রহু চণ্ডাল— বাজিকরদের একমাত্র ঈশ্বর, পরিত্রাতা, সকল বাজিকরের একমাত্র আশ্রয়। সব মিলিয়ে বলতে গেলে রহু বাজিকরদের একমাত্র বিশ্বাস ও শক্তি। তাই সেই দিক দিয়ে মনে হয় যে এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হল সমগ্র বাজিকর সমাজ এবং রহু চণ্ডাল স্বয়ং।

বাজিকর মানেই শেকড়বিহীন এক যাযাবর গোষ্ঠী। তাই উপন্যাসের এক মুখ্য চরিত্র পীতেম যখন বলে "সারা দুনিয়া বাজিকরের। জায়গার অভাব?"[১] তখন আপাত ভাবে সেই কথার মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকলেও সত্তার গভীরে কোথাও হয়তো ছিল সংশয়। বাজিকরও আসলে বুঝতে পারত থিতু হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু তারা মনে করত যে তাদের স্থায়ী ঠিকানা না থাকার নেপথ্যে রয়েছে দেবতার অভিশাপ। পীতেম ও সলমার সম্পর্কের সূত্র ধরে সেই কাহিনি আমাদের কাছে উঠে আসে—

> "...যখন তাদের কোনো প্রাচীন পুরুষ পুরা এক নর্তকীর প্রতি আসক্ত হয় এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। তারপর শুরু হয় সেই অন্তর্কলহ, যা তাদের স্থায়ী বসবাসকে ছিন্নভিন্ন করে। মানুষ তখন দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। পুরার বিরুদ্ধবাদীরা দাবি তুলেছিল, এ বিয়ে হতে পারে না, কেননা পালি নামের সেই নর্তকী নাকি তার বোন। সুতরাং এ বিয়ে হবে অসামাজিক এবং অমঙ্গলময়।
>
> পুরার সমর্থকরা বলেছিল, এ বিয়ে হবেই, কেননা পালি যে পুরার বোন এর কোনো প্রমাণ নেই।
>
> তারপর পালি ও পুরার বিয়ে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবতার অভিশাপ নেমে আসে তাদের উপর। অন্তর্কলহে সমস্ত মানুষ নষ্ট হয়। পুরা ও পালি দেশদেশান্তরে পালিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। ... তারা কোথাও আশ্রয় পায় না এবং দেবতা তাদের অভিশাপ দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় ক'রে দেয়। তোমরা এক বৃক্ষের ফল দু'বার খেতে পারবে না, এক জলাশয়ের জল দু'বার পান করতে পারবে না, এক আচ্ছাদনের নিচে একাধিক রাত্রি বাস করতে পারবে না এবং সব থেকে ভয়ানক—এক মৃত্তিকায় দু'বার নৃত্য করা দূরে থাকুক, দু'বার পদপাত পর্যন্ত করতে পারবে না।এই ছিল দেবতার অভিশাপ।"[২]

বস্তুত সেই থেকে শুরু হল বাজিকরদের পথ চলা। জীবনে স্থিতির কথা চিন্তা করা তাদের কাছে যেন ছিল এক অলীক ভাবনা। বাজিকরদের এই পথ চলার সূত্র ধরেই ইতিহাসের অনেকগুলি অধ্যায় পাঠকের সামনে উঠে আসে। সেই দিক দিয়ে বলতে গেলে *'রহু চণ্ডালের হাড়'* সময়ের এক জ্বলন্ত দলিলও বটে। উপন্যাসে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় হয় লুবিনির। নাতি শারিবাকে নিজেদের সমাজের সঙ্গে পরিচয় করানোর মধ্য দিয়ে এই কাহিনির

শুরু। বস্তুত নাতি ও নানির এই ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মধ্য দিয়েই পাঠকের সামনে উঠে আসে বাজিকরদের এক সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস, তাদের কয়েক প্রজন্মের ভাবনা। দেশ বিভাজনের বেশ কিছুটা আগের থেকে শুরু করে উপন্যাসটির কাহিনিস্রোত এসে থেমেছে মোটামুটি বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কালে। আর তার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে সেই সময়পর্বের সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি। এ প্রসঙ্গে লেখকের একটি মন্তব্য অবশ্যই উল্লেখ্য—

> "রহু চণ্ডালের হাড় শুধু এক শ্রেণীর যাযাবরের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী নয়। এই যাযাবরগোষ্ঠী, আমার উপন্যাসে যে গোষ্ঠীর নাম বাজিকর, তাদের এক-দেড়শ বছরের ঘোরাফেরাকে কেন্দ্র করে আমি একটি বিস্তৃত অঞ্চলের ওই সময়কার ইতিহাস, সমাজ, ব্যবসা-বানিজ্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়কে টুকরো টুকরো করে তুলে এনেছি।"[৩]

উপন্যাসটির প্রতিটি পর্বেই রয়েছে বাজিকরদের জীবন সংগ্রামের সুনিপুণ ছবি। কখনো সেই সংগ্রামের নেপথ্যে রয়েছে জীবন যুদ্ধে নিছকই টিঁকে থাকার চেষ্টা, আবার কখনোবা স্থায়ী ঠিকানার জন্য লড়াই। কিন্তু দু'টিই যে ভীষণ কঠিন। কারণ তাদের না আছে কোন ধর্ম, না আছে কোন সামাজিক পরিচয়। উপন্যাসের একটি চরিত্র আকালুর গাওয়া হাপু গান ও তার প্রদর্শন সেই কঠিন লড়াইয়ের কথাই যেন বলে যায়—

> "আকালু সেই তিন বছর বয়স থেকে পৃথিবীর সঙ্গে একা লড়ে যাচ্ছে। ... সেই অবুঝ বয়স থেকেই তার পেশা হাপু গান। হাপু একটি দীর্ঘ ছড়া, গান ও আবৃত্তির মাঝামাঝি একটি সুরে গাওয়া হয়। অনুষঙ্গে থাকে গায়কের হাতের একটি মোটা পাঁচন লাঠি আর মুখ, নাক ও বগল ইত্যাদি নির্গত বিভিন্ন বিকৃত শিৎকার ধ্বনি। গানের সঙ্গে বা সমে লাঠি দিয়ে গায়ক তার সর্বাঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত লয়ে আঘাত ক'রে শব্দ সৃষ্টি করে। ... গানের শেষ অংশে লাঠির বারি এমন দ্রুত ও ভয়াবহ শব্দ হতে থাকে যে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ অনেকসময় ছুটে এসে হাত চেপে ধরে লাঠি কেড়ে নেয়।"[৪]

শারিবা যখন এই বিষয়ে আকালুকে এই প্রবল যন্ত্রণাময় কাজটি করার কারণ জিজ্ঞেস করে তখন আকালু তাকে বলে এক কঠিন সত্যি— "না বারালে মানসি পয়সা দিবে"?[৫]

আসলে বাজিকরের জীবনের প্রতিটি পর্বেই রয়েছে সামাজিক লাঞ্ছনা, বঞ্চনা। এতেই তারা অভ্যস্ত, তাই এটাই তাদের কাছে স্বাভাবিক। তাদের কাছে জীবনের একটাই উদ্দেশ্য, আর তা হল যে কোন মূল্যে বেঁচে থাকা। জীবজন্তুর খেলা দেখানো থেকে শুরু করে দড়িবাজি, ভেল্কি, লোক ঠকানো বা চুরি করা কোনটাই বাজিকরের কাছে না করার নয়। তাই তারা শুধু ঘর বাঁধে আর ভাঙে। বাজিকরি নসিবের ওপর ভরসা করে রাজমহল, রাজশাহী, মালদা, রংপুর, পাঁচবিবি বহু জায়গাতেই তারা তাঁবু ফেলে। কিন্তু স্থায়ী বাস তাদের কাছে যেন মরিচীকা। পূর্বপুরুষের পাপের বোঝা তাদের কোথাও স্থায়ী ভাবে থাকতে না দিলেও তারাও কিন্তু চায় একটুকরো জমি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই পথ চলতে চলতে বাজিকরদের রক্তেও নেমে এসেছে ক্লান্তি আর সেই সঙ্গে তাদের ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে কিছু অনতিক্রম্য সঙ্কট,যার ফলে বাজিকরদের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে বিপন্ন হয়ে পরছে। তাই তারা একসময় সন্ধানে নামে পূর্বপুরুষের নির্দেশিত সেই পুবের দেশের। উপন্যাসের কিছু অংশ এপ্রসঙ্গে তুলে ধরা যেতে পারে—

"ঘুমের মধ্যে তার মরা বাপ দনু আসে তার কাছে।

- পীতেম হে, পীতেম?
- বাপ?
- চোখেৎ পানি ক্যান বাপ?

পথেৎ যামো কেংকা বাপ? দল নষ্ট হোই যাবে, বাপ।

ক্যানে বাপ, তর দুষ্কু কিসের?

-ভইস কই বাপ? ঘোড়া কই বাপ?

হাঁই দেখ, জঙ্গলের ধারে কত গাবাতান ভৈসী ঘুরে বেড়ায়। হাঁই দেখ, কত যোয়ান টাটু ঘুরে বেড়ায়। ওলা সব তুমার। দুনিয়ার বেবাক মাঠেৎ চরা জানোয়ার তুমার।

- বাপ।

- পীতেম, হে পীতেম, পুবের দেশেৎ যাও, বাপ। সিথায় তুমার নসীব।

- পুবের দেশেৎ?

-পীতেম, হে পীতেম, রহু তুমার সহায় থাকুক।"[৬]

সঙ্গতভাবেই পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে যে রহু কে? বাজিকরদের দেবতা? না কি তাদের সর্দার? সম্পূর্ণ উপন্যাসেই রহু চণ্ডাল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বাস্তবে এই রহু হল বাজিকরদের এক পরম বিশ্বাস, তাদের একমাত্র ভরসার স্থল। রহু তাদের স্বজাতিকে এক সুন্দর জীবন গড়ে দিয়েছিল। তবে সে জীবন স্থায়ী হয় নি। বাইরের পঙ্কিল স্রোত কখন যে তাদের ঘিরে ফেরেছিল তা রঘু বুঝতে পারে নি। শুধুমাত্র তাই নয়, সেই পঙ্কিলতা তার জাতের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করে তাকেও করে তুলেছিল কদর্য। যথার্থ দলপতি হিসেবে রঘু তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আত্মত্যাগের। সে যেন হয়ে ওঠে এক অন্ত্যজ দধীচি, উদ্ধার করতে ছোটে তাদের পবিত্র নদী, রক্ষা করতে চায় তার অনুগামীদের। ঘাতকের আস্ত্রাঘাতে রহুর বুক থেকে জলস্তম্ভের মত নির্গত রক্ত তাদের সেই পবিত্র নদীর জলের সঙ্গে মিশে ভাসিয়ে দিল কদর্য মানুষদের। বন্যার শেষে রহুর হাড় কয়টিকে আশ্রয় করে তার অনুগামীরা পা ফেলে এক নতুন ভবিষ্যতের দিকে। সেই থেকেই শুরু হয় তাদের পুবের দেশের সন্ধান, যেখানে হয়তো তাদের জন্য রয়েছে এক সম্ভবনাময় নতুন সূর্যের ভোর। আর তাই বাজিকররা বিশ্বাস করে "রহু আমাদের সঙ্গে থাকেন, আমাদের রক্ষা করেন, নতুন ভূখণ্ডে আমাদের সুস্থিতি না করিয়ে তাঁর তো মুক্তি নেই।"[৭]

উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে বারবার একটা প্রশ্ন মনে আসে বাজিকরি রক্ত কি সত্যিই স্থিতি চায়? না কি জীবনের ভ্রাম্যমানতাই তাদের আকৃষ্ট করে? যেমন সালমার কাছে গৃহস্থ হওয়া মানেই যেন বাঁধা জানোয়ার। আসলে স্থিতিশীল হওয়ার জন্য চাই নিজের এক টুকরো স্থায়ী জমি এবং সামাজিক পরিচয়। আর এখানেই রয়েছে মূল জট।কারণ বাজিকরের কোন জাত নেই, তাদের একটা গোষ্ঠী বলা যেতে পারে, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন জাতের পরিচয় তাদের নেই। পীতেমকে তাই সাঁওতাল সর্দার লক্ষণ সোরেন যখন বলে যে বাজিকর কোন জাত নয় তখন পীতেম তাতে সম্মতি দেয়। তাই যখনই তারা স্থায়ীত্বের আগ্রহ নিয়ে কোথাও হাজির হয় তখনই সমাজ প্রশ্ন তোলে তাদের জাত নিয়ে। তবে জমিতেই যে জীবনের স্থিতি,সেটাই যে জীবনের একমাত্র স্থায়িত্ব সেই অমোঘ সত্যি এক বাজিকরকে সে রাতে বোঝাতে চেয়েছিল লক্ষণ। তার ভাষায় "পুরুষ মানুষের যেমন একজন মেয়েমানুষ চাইই, তেমনি সব মানুষেরই জমিও চাই।"[৮] পাকা ধান যখন গৃহস্থের ঘরে ওঠে, তার গন্ধ যখন চারদিকে ছড়িয়ে যায় তখন এক প্রবল সন্তুষ্টির জন্ম দেয়। লক্ষণ সেকথাই পীতেমকে সেই রাতে বোঝাতে চেয়েছিল—

> "পীতেম জানবে না আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের এই নক্ষত্রখচিত রাতে খোলা আকাশের নিচে লক্ষণ সোরেন যে বীজ তার অভ্যন্তরে প্রোথিত করল, তার অধস্তন তৃতীয় এবং চতুর্থ পুরুষে সে পল্লবিত হয়ে অনেক সমস্যা, আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং দুঃখের জন্ম দেবে।"[৯]

বাজিকরদের সমস্যা এবং তাদের ওপর ঘনিয়ে আসা সঙ্কটের কারণ বহুবিধ। এই আলোচনায় একথা আগেও বলা হয়েছে যে বাজিকরের কোন জাতিগত পরিচয় নেই। তাই হিন্দু, মুসলিম বা অন্য কোন সম্প্রদায়ই

তাদের আপন করে নেয় না। এই কারণে তারা যে শুধুমাত্র সামাজিক ভাবেই নিপীড়নের শিকার হয় তা নয়, বরং আরও বড় এক সঙ্কট তাদের জন্য সৃষ্টি হয়, আর সেটাই একদিন বাজিকরদের বিলুপ্তির কারণ হয়ে উঠবে বলে তারা মনে করে। সেই সঙ্কট হল জৈবিক দাবী ও বিবাহের প্রয়োজনে স্বজন গমন বা বলা যেতে পারে স্বগোত্রে বিবাহ। কারণ বাজিকরের সঙ্গে কেউই কুটুম্বিতায় আগ্রহী নয়। যখনই তাদের কাছে তাদের জাতের কথা জানতে চাওয়া হয় তখনই তারা নিশ্চুপ হয়ে যায়। আর তাই হিন্দু বা মুসলিম কেউই তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতায় আগ্রহ দেখায় না।বাজিকর যেহেতু কোনো সমাজের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয় ,তাই অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মেয়ের সঙ্গে বাজিকরেরে ছেলের সম্পর্ক তৈরি হলে তার পরিণাম হয় ভয়ঙ্কর। মালো সম্প্রদায়ের মেয়ে পাখির সঙ্গে বাজিকর যুবক সোজান এবং নমশূদ্র ঘরের মেয়ে মালতীর সঙ্গে বাজিকর ওমরের প্রণয় তারই প্রমাণ। দুইটি সম্পর্কেরই যবনিকা পতন হয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তাই নিজেদের মধ্যেই বিবাহ বা সম্পর্ক স্থাপনে তারা কিছুটা বাধ্যই হয়। আর তাই বাজিকর শিবিরে শিশু মৃত্যু বা অকাল মৃত্যুর মত ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ একই রক্তের মধ্যে তাদের বারবার সম্পর্ক ঘটে। মূল গিঁটটা আসলে রয়েছে সমাজের ভাবনায়। তাই জাত হীন বাজিকরকে কেউ নিজের আত্মীয় ভাবতে পারে না, তাদের ওপর বিশ্বাস করতে পারে না। এপ্রসঙ্গে উপন্যাসের একটি অংশের কথা মনে পড়ে যায় যেখানে পারগানা লক্ষণ সোরেন পীতেমকে তাদের গ্রামে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। বাজিকরদের কাছে এ বড় সম্মানের বিষয়, আর সেই সঙ্গে অবাক করে দেওয়ারও। কারণ—

> "বাজিকরকে কেউ কোনোদিন নেমন্তন্ন করে না। তার সঙ্গে কুটুম্বিতা করার কথা কেউ ভাবে না। লক্ষণ সেই মর্যাদা দিয়েছে তাদের, এ কি কম কথা?"[১০]

সমজে নিম্নবর্গের ওপর উচ্চবর্গের পীড়ন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এই উচ্চবর্গ–নিম্নবর্গের সংজ্ঞা কি হতে পারে তা একটি স্বতন্ত্র ও সুদীর্ঘ আলোচনার বিষয়। তবে খুব সংক্ষেপে এবং সহজ করে বলতে গেলে যাদের সামাজিক অবস্থান বর্ণে ও বর্গে পেছনের সারিতে তারাই নিম্নবর্গ হিসেবে পরিচিত। আমরা একথা প্রত্যেকেই জানি যে বর্ণভেদ প্রথমদিকে শ্রেনি বিভাজনের মাপকাঠি হলেও পরবর্তী কালে ধীরে ধীরে এই বিষয়টির নির্ণায়ক হয়ে ওঠে বিত্ত। আসলে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক মানদণ্ড হয়ে উঠেছে শ্রেণি নির্ধারণের একমাত্র মাধ্যম। আমাদের আলোচ্য 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসেও এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। নমোশুদ্রদের দলপতি ভায়রো আর্থিক কৌলীন্যের কারণে হয়ে ওঠে বাইশ দিগরের সর্বেসর্বা। উপন্যাসের কিছুটা অংশ এ প্রসঙ্গে তুলে ধরা যাক—

> "নমোশূদ্ররাও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে জলচল নয়, কিন্তু বাদা-কিসমতের ভৈরব মণ্ডল ইত্যাদি কয়েকজন নমোশূদ্র বেশ বর্ধিষ্ণু এবং দাম্ভিক। ভৈরবের বা ভায়রোর কয়েক পুরুষের রেহানী কারবার, এখনো তেজী। ভায়রো এখনো ঘোড়ায় চড়ে মহালে যায়।
>
> ...
>
> ... সবচেয়ে শক্তিশালী ভায়রো তার সমাজের বাইশ 'দিগর'-এর মাথা।"[১১]

আজকের তারিখে দাঁড়িয়ে তাই স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় যায় যে বর্ণগত, পেশাগত বা গুণগত— এই সবের উর্ধ্বে উঠে অর্থনৈতিক কৌলীন্যের তারতম্যের ওপর সচেয়ে বেশি মাত্রায় নির্ভর করে এই নিম্নবর্গীকরণ। এপ্রসঙ্গে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সুচিন্তিত মন্তব্যটি অবশ্যই উল্লেখ্য—

> "নিচু জাতিতে জন্মানোটা নিঃসন্দেহে বঞ্চনার একটা কারণ। কিন্তু নিচু জাতির লোকেরা যদি দরিদ্র হয়, জাতিগত বঞ্চনা বহুগুন বৃদ্ধি পায়। দলিত বা নিম্নবর্ণের লোকেরা অথবা

> তফসিলভুক্ত আদিবাসীরা যে বঞ্চনা ও বৈষম্য ভোগেন তা অনেক বেশি রকম হয়ে দাঁড়ায় যখন তা দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত হয়।"[১২]

'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসেও এই সামাজিক নিপীড়নের এক বাস্তব চিত্র পাঠক খুঁজে পায়। শুধু যে জাত গোত্র পরিচয়বিহীন বাজিকররাই এই অত্যাচারের শিকার তা কিন্তু নয়, যারা দুর্বল, যারা অবহেলিত তারাই এই নিপীড়নের শিকার। যেমন পারগানা লক্ষণ সোরেনের সূত্র ধরে সাঁওতালদের ওপর অত্যাচারের বাস্তব চিত্র উপন্যাসে উঠে এসেছে।কথিত আছে যে সাঁওতাল ধার নিলে তা কোনদিন শোধ হয় না। যেমন মঙ্গল মুর্মুর নেওয়া পাঁচ টাকা ঋণ সারা জীবন বেগার খেটেও সে যে শুধু শোধ করতে পারে নি তা নয়, তার ছেলে সুফলও দয়ারাম ভকতের বাড়ির বাঁধা চাকর হয়ে থেকে যায়। তবে যেখানে পীড়ন সেখানেই প্রতিবাদ। আর তাই পতিত সাউ-এর নিজস্ব পদ্ধতিতে ধানের ওজন করা একসময় সাঁওতালরা আর মেনে নেয় না, এর ফল যে কত মারাত্মক হতে পারে তা জেনেও তারা অন্যায়ের প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল। বাজিকররা তো এই পীড়নের তালিকায় সর্বদাই রয়েছে। তারা আসলে এতেই অভ্যস্ত। তবে প্রতিবাদী হতে তারাও জানে। জামির, জিল্লু, রূপা তারই প্রমাণ।

একথা আলোচনায় আগেও বলা হয়েছে যে জাতিগত পরিচয়হীনতা বাজিকরদের বঞ্চনার সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত। যখনই তারা কোন ভূখণ্ডে স্থায়ী বাস গড়ে তোলে তখনই তাদের সেখান থেকে উৎখাত হতে হয়। সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে বাজিকর বোঝে যে অস্তিত্বের আরেক নাম পরিবর্তন। তাই তারা পরিবর্তনকে মেনে নিয়েই জীবন যুদ্ধে সামিল হয়। কিন্তু যখনই তাদের কাছে সমাজ জিজ্ঞেস করে যে তাদের ধর্ম কি তখনই তারা হোঁচট খায়। কারণ এই একটা প্রশ্নের কাছে বাজিকর বড় অসহায়। এই একটি বিষয়কে হাতিয়ার করেই বাজিকরকে যেকোনো সময়েই উৎখাত করা যায়, কারণ "যার সমাজ নেই তার সঙ্গে সামাজিক চুক্তিও হয় না।"[১৩] আর তাই ন্যায়নীতি এই সব কিছুকে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে পেকে ওঠা ভাদু ধান ঘরে তলার আগেই ইয়াসিন আর রূপার জমি ছিনিয়ে নেওয়া যায়। আসলে বাজিকর শুধু চেনে রহুকে। ওলা মাই, বিগা মাই বা কালীমাইকে তারা তাদের ভ্রাম্যমান জীবনের সূত্রে ধারন করেছে, ঠিক যেমন রপ্ত করেছে বিভিন্ন ভাষা। কিন্তু তাদের একমাত্র ভরসা স্থল হল রহু। তাই নিজেদের ধর্মের বিষয়টি তারা কখনোই গুরুত্ব দিয়ে ভাবে নি। যখন তারা এর গুরুত্ব বুঝতে পারল তখন অস্তিত্ব রক্ষার্থে তারা যেকোনো জাতের খাতাতেই নাম তুলতে রাজি হয়ে যায়। কারণ যেই ধর্মকেই তারা ধারন করুক না কেন বাজিকর মাত্রই জানে যে তাদের আসল আশ্রয়স্থল রহু। তাই বাজিকর যুবক ওমর যখন নমোশূদ্র মেয়ে মালতীকে নিয়ে পালিয়ে যায় তখন নিজের দলকে বাঁচাতে খুব সহজেই বাজিকর সর্দার ইয়াসিন ভায়রোর কাছে তাদের নমোশূদ্রদের জাতে তুলে নেওয়ার অনুরোধ করে বসে। আবার এই ভায়রোর কাছেই চূড়ান্ত অপমানিত হয়ে শারিবা যখন কিসমতের সমাজ প্রধান হাজী খেসেরের কাছ থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান পায় তখন সে তাদের বাজিকর দলকে রক্ষা করার জন্য এটাই একমাত্র পথ বলে ধরে নেয়। অপর দিকে হাজী খেসেরের কাছেও সামাজিক, রাজনৈতিক সমীকরণের দিক দিয়ে বাজিকরদের ধর্মান্তরিত করতে পারাটা ছিল এক লোভনীয় বিষয়। কারণ বিভাজন পরবর্তী অধ্যায়ে এদেশে তুলনামূলক ভাবে মুসলমান কিছুটা সংখ্যাগত ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই নিজেদের গোষ্ঠীবৃদ্ধির জন্য বাজিকরদের ইসলামে ধর্মান্তরীকরণ করাকে তিনি স্বজাতির প্রতি তাঁর একটা বড় অবদান বলে মনে করেছিলেন। তাছাড়া তিনি জানেন যে

> "একজন বিধর্মীকে ইসলামে দীক্ষিত করলে হজ্জের সমান পুণ্য। ... স্বজন কমে গেছে, বাড়বে না, কিন্তু স্বধর্মী বাড়বে।"[১৪]

তবে শারিবার দেখানো পথে অধিকাংশ বাজিকর ধর্মান্তরিত হলেও সে নিজে সে পথের পথিক হয় না। কারণ সে বাজিকর ছাড়া নিজেকে আর কোন ভাবেই ভাবতে পারে না, এই পরিচয়ই সে সত্তার গভীরে বহন করে। এই অংশে হানিফের সঙ্গে শারিবার কথোপকথন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক—

"- এটা গোপন কথা কহি, হানিফ ভাই। মহরমের দিন বাজিকর পাড়ার তিন ভাগ মানুষ মোছলমান হবে।

...

- তোমরা মোছলমান হবা?

- তিনভাগ ঘর বাজিকর মোছলমান হবে, এক ভাগ ঘর হবে না

- তুমি কোন্ দলে?

-এক ভাগের দলে।

- এ বুদ্ধি কার?

-বিপদের, পেয়োজনের।

... তুমি ক্যান হবানা?

- হামার বাপ নিজেরে হিঁদু ভাবে।

- তুমি কি ভাব?

- হামি ভাবি বাজিকরের কোনো জাত নাই।"[১৫]

শেষের লাইনটিতে পৌঁছে পাঠক থামতে বাধ্য হয় একজন বাজিকর যুবকের আত্মপ্রত্যয়ের কাছে আর এখানেই আমরা খুঁজে পাই রহু চণ্ডালের যথার্থ এক উত্তরসূরিকে যে হয়তোবা কোনোদিন বাজিকরকে দিতে পারবে যথার্থ পুবের দেশের সন্ধান।

তথ্যসূত্র:

১। সেন, অভিজিৎ। রহু চণ্ডালের হাড়। সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১ বৈশাখ, ১৩৬২, পৃ. ৫।

২। তদেব, পৃ. ১৬-১৭।

৩। সেন, অভিজিৎ। যেভাবে লেখা হল রহু চণ্ডালের হাড়। গল্পপাঠ, ওয়েবজিন, অক্টোবর ২১, ২০১৫।

৪। সেন, অভিজিৎ। রহু চণ্ডালের হাড়। সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১ বৈশাখ, ১৩৬২, পৃ. ১৮০।

৫। তদেব, পৃ. ১৮১।

৬। তদেব, পৃ. ৫।

৭। তদেব, পৃ. ৭১।

৮। তদেব, পৃ. ২৭।

৯। তদেব, পৃ. ২৮।

১০। তদেব, পৃ. ৩২।

১১। তদেব, পৃ. ২০১।

১২। সেন, অমর্ত্য। ভারতের শ্রেণি বিভাগের তাৎপর্য। 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৮ জানুয়ারি, ২০০৩, ৭০ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, পৃ. ৪০।

১৩। সেন, অভিজিৎ। রহু চণ্ডালের হাড়। সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১ বৈশাখ, ১৩৬২, পৃ. ১৭৯।

১৪। তদেব, পৃ. ২০৫।

১৫। তদেব, পৃ. ২৩৪-২৩৫।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৫।

২। বিশ্বাস, চিত্তরঞ্জন। বাংলার হিন্দুদের বর্ণ বিন্যাস। ডেল্টা ফার্মা, কলকাতা, ২০০০।

৩। ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পাদিত)। নিম্নবর্গের ইতিহাস। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮।

৪। সেন, অর্ণব। আধুনিকতার নানা স্বর। বইওয়ালা, কলকাতা, ২০০৬।

ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত আলোচনা:

১। রহু চণ্ডালের হাড়: বহুস্থানিক বর্ণমালায় সমান্তরাল সংস্কৃতি— অংশুমান ভৌমিক
ওয়েবসাইট- https// www.kaliokalam.com

২। বাজিকর গোষ্ঠীর পর্যটন অথবা শাশ্বত মানবের যাত্রা— সাদা কামালী
ওয়েবসাইট- https//bdnovels.org

৩। রহু চণ্ডালের হাড়: বাজিকরের উপাখ্যান— রঞ্জনা বিশ্বাস
ওয়েবসাইট- https//www.chintasutra.com

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 495-501
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.236

জয়া মিত্রের ছোটগল্প: নারী জীবনের বহুমাত্রিকতা

সুজিত মণ্ডল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Jaya Mitra emerged in the Bengali story world in the eighties of the last century. Her Story world is diverse. Almost all of her stories are written form a woman's perspective. The lives of woman from different classes of society are expressed in her stories. With the changing times, women's lives have progressed, Conscious women are fighting to understand their rights; yet, in the present times, the lives of many women are full of obstacles. The story of victory and defeat in women's lives is expressed in the stories of Jaya Mitra. She did not portray the women in her stories with the idea that women have to endure everything in the world. The women in her stories are independent-minded, self-reliant and rebellious; who try to bring about change in society from within the world. Also in her story, we see that women educated in patriarchal education are the main enemies of women who want to be independent and self-reliant. In the narrow confines of the world, poorly educated, reformed women occupied their dominance. For generations, the life of a woman in a cycle has been revolving. The women in her stories try to overcome time and society by clinging to them. Jaya Mitra's story is an unheard-of story of the painful lives of tireless female soliders in the war called duty in a helpless, deprived and degraded world.

Keywords: Jaya Mitra, Short Story, Patriarchy society, women, Multidimensionality

বাংলা গল্পভুবনে জয়া মিত্রর আবির্ভাব বিগত শতাব্দীর আশির দশকে। কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিকের পাশাপাশি তিনি সমাজকর্মী, পরিবেশবিদ এবং একসময় ছিলেন রাজনীতির সক্রিয় কর্মী। রাজনীতির কারণে তিনি সাড়ে চারবছর জেলবন্দী ছিলেন। জেল জীবনের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে তিনি লেখেন 'হন্যমান' (১৯৮৯) উপন্যাস। বাঙালি পাঠকমহলে অভূতপূর্ব সাড়া জাগানো এই উপন্যাসের জন্য তিনি আনন্দ পুরস্কারে (১৯৯২) ভূষিত হন। বর্ণময় ব্যক্তিজীবনের মতো তাঁর গল্পবিশ্বও বৈচিত্র্যময়। তাঁর প্রায় গল্প নারীর দৃষ্টিকোণে রচিত। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির নারীর জীবনকথা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর গল্পে। সংসারে নারীদের সবই সহ্য করে নিতে হয় এই ধারণায় তাঁর গল্পের নারীদের তিনি চিত্রিত করেননি। তাঁর গল্পের নারীরা স্বাধীনচেতা, অস্মিতাবোধসম্পন্ন, প্রতিবাদী; যারা সংসারের মধ্যে থেকে সমাজে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। সমাজকর্মী বা রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তিনি ঘুরেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নারীর শোষণ-বঞ্চনা এবং প্রতিবাদীসত্তাকে। বাস্তব সেই অভিজ্ঞতাকে কল্পনার জারক রসে মিশিয়ে নারীজীবনকে তিনি গল্পে চিত্রিত করেছেন।

জয়া মিত্রর গল্পের নারীরা জননী-জায়া-কন্যারূপে চিত্রিত। তাঁর গল্পে দেখি, মাতৃত্বে নারী সর্বংসহা, সেই জননীই সন্তানের বিপদাপন্নে রণংদেহী, সর্বনাশিনী। 'কুরুক্ষেত্রের আগে' গল্পে বর্ণিত হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে জননীর লড়াকু যোদ্ধাসুলভ মানসিকতা। নেশাগ্রস্ত স্বামীর দায়িত্বহীনতার কারণে সংসারের সকল দায় মণিমালার। মাকড়সার জালের মতো সংসারের জালে জর্জরিত মণিমালা অকালবার্ধক্যে ভোগে। তারপরেও সে মাতাল স্বামীর হাতে নির্যাতীতা-

> "মদের নেশায় চুর হয়ে এসে রান্না হয়নি দেখলে মণিমালার চুলের মুঠিধরা, পয়সা উপার্জনের নানারকম উপায়ের কথা বলে দেওয়া – এসবই ঘটেছে। ছেলেমেয়ের সামনে।"[১]

মাতৃত্ব মণিমালাকে সহিষ্ণুতার শক্তি দিয়েছে। সন্তানকে সুন্দর জীবনদানে বদ্ধপরিকর মণিমালার লড়াই সংসারের অন্যায়-অত্যাচার, প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে। মণিমালার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যখন স্বামী ঋণের দায় থেকে বাঁচতে স্ত্রী ও কন্যার শরীরের সওদা করে। স্ত্রী-কন্যাকে কামান্ধ পশুদের সামনে মাংসের টোপ হিসেবে ব্যবহার বিকৃত মানসিকতার পরিচয়-

> "বোধহয় কোনো অলিখিত বদলাবদলির সমঝোতা হয়ে গেছে। বাইরে বাইরে হয়েছে সেটা। সে আর তার মেয়ে সেই খেলায় একটা মাংসের টুকরো, একটা টোপ মাত্র। যেটা দেখিয়ে কুকুরের মুখ চুপ করিয়ে রাখা হয়।"[২]

বিকৃত মানসিক ব্যক্তির স্ত্রীর পরিচয় থেকে বৈধব্য জীবন কাম্য মণিমালার। সন্তানের কথা ভেবে স্বামীকে ত্যাগ করে মণিমালা নবজীবনের উদ্দেশে অজানা ভবিষত্যের পথে পা রাখে।

পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধ লড়াইয়ে জননীর জয়গানের আরেকগল্প 'অন্ধকারের উৎস থেকে' (১৯৮৮)। বারো বছরের শান্তাবালাকে তাঁর পিতা অর্থের লোভে মধ্যবয়সী দোজবর হরিধন কুঁইলার সঙ্গে বিবাহ দেয়। 'মেয়ের নাম দেলি, যমকে দিলেও গেলি জামাইকে দিলেও গেলি' আপ্তবাক্য সত্য হয় শান্তাবালার জীবনে। তার কাছে স্বামী অর্থ যৌননির্যাতন ও শারীরিক অত্যাচার করা ব্যক্তি। স্বামীর লালসার কারণে তের বছরের দাম্পত্যজীবনে সে নয়বার গর্ভবতী হয়েছে। নয়বার গর্ভবতী হলেও পাঁচটি সন্তান মারা যায়, চার সন্তানের মধ্যে শান্তার চিন্তা দুই মেয়ে যামিনী-কামিনীকে ঘিরে। সে চায়নি 'মেয়ের নাম দেলি' বাক্য সত্য হোক তার মেয়েদের জীবনে। বিবাহের পর জীবনের আনন্দ-দুঃখের কথা চিঠি লিখে জানানোর মতো মেয়েদের সুশিক্ষিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শান্তাবালা। কিন্তু হরিধন দুই মেয়ের বিবাহ ঠিক করায় শান্তার পরিকল্পনা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়। শান্ত, ভীতু স্ত্রী হয়ে দাম্পত্যজীবনে স্বামীর কথাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেও সন্তানের সংকটে স্পর্ধিত শান্তাবালা স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে- "অতটুকু মেয়ের আমি বে দেবনা। যামিনী কামিনীকে আমি ইস্কুলে পাঠাব। মানুষ করব।"[৩] আসন্ন বিপদ থেকে মেয়েদের বাঁচাতে নারীর জড়ত্বের খোলস ছেড়ে জননী শান্তাবালা অদম্য সাহসিকতার পরিচয় দেয়-

> "বহু বছর ধরে চোখের সামনে থাকা কাঠ চেলা করার কুড়লটা রাত্রে ঘুমন্ত হরিধনের মাথায় গায়ের জোরে বসিয়ে দেয়।"[৪]

খুন করার পর নির্ভীক, দৃড়প্রতিজ্ঞ শান্তা নিজের গচ্ছিত সোনার গয়না প্রতিবেশী রোহিণীর হাতে তুলে দিয়েছে যামিনী-কামিনীকে সুশিক্ষিত করতে। অপরাধ করছে জেনে শাস্তির জন্য শান্তা থানায় আত্মসমর্পণ করে। মাতৃত্বের কারণে শান্তাবালার অন্ধকার জীবনে আলোর নির্গমন ঘটে। সেই আলোয় তার মুক্তির আলো।

জয়া মিত্রর গল্পের নারীরা পুরুষতন্ত্রের বিধিনিয়মের যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দেয় না, ছককাটা জীবনের বাইরে গিয়ে নারীরা প্রতিবাদী। তেমনই এক গল্প 'ছকের বাইরে'। স্পষ্টবক্তা, প্রাণচঞ্চল, স্বাধীন চিন্তাভাবনা পোষণ করা রুক্মিণীকে নিয়ে পরিবারের চিন্তা বিবাহের পর শ্বশুরবাড়িতে কি করে মানিয়ে নেবে। রুক্মিণীর

সঙ্গে কলেজে আলাপ হয় জয়ন্তর। আলাপ প্রেমে পরিণতি পায়। কলেজ শেষে দুই পরিবারের সম্মতিতে বিবাহের স্থির হয়। ছন্দ কাটে বিবাহে জয়ন্তর পরিবারের পণের দাবিতে-

> "জয়ন্তর বাবা পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইলেন আর ছেলের জন্য একখানি স্কুটার। বললেন এটা পণ নয়। বৌভাতের তো একটা খরচ আছে। আমাদের আত্মীয়স্বজন অনেক।"[৫]

পণে পরিবারের সম্মতি থাকলেও বিবাহে তীর্ব আপত্তি জানায় রুক্মিণী। রুক্মিণীর বিশ্বাস, টাকায় কেনা বাড়ি ভাড়া বাড়ি, নিজের বাড়ি নয়। সে লজ্জিত কারণ, একজন অমেরুদণ্ডী, দুর্বল ছেলেকে ভালোবেসেছে; যে পিতামাতার অন্যায় দাবি জেনেও নিশ্চুপ ছিল। পণপ্রথার মতো সামাজিক ব্যাধিকে সমর্থন করা ছেলের সঙ্গে সারাজীবন কাটানো তার পক্ষে অসম্ভব। দুই পরিবারের জোরাজুরিতে রুক্মিণী একটাই শর্তে বিবাহে রাজী হয়, বিবাহের পর জয়ন্তকে শ্বশুরবাড়িতে বাস করতে হবে। দীর্ঘদিনের প্রেমিককে হারিয়ে মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হলেও পণপ্রথা ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বদ্ধ নীতি নিয়মের কাছে নিজের নীতি-আদর্শকে বিসর্জন দেয়নি। পিতৃতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে একা নারী অসহায় নয়, প্রতিবাদী নারী সমাজের স্থবির নিয়মের পরিবর্তন আনার কথা বলে।

জয়া মিত্রর গল্পের নারীরা সংসারে অবহেলিত, অপমানিত হয়ে পরমুখাপেক্ষী জীবন কাটাতে চায় না। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীরা সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে অশান্তময় দাম্পত্যজীবন ভেঙে একাকী বাঁচতে সাবলীল। 'কাল পরশুর ধারাবাহিক' (১৯৮৬) গল্পে পরস্পরের বিপরীত স্বভাবের সুধন্য ও শ্রীলার বৈবাহিক জীবন শুরু থেকেই বেসুরো। একই ছাদের নীচে মানিয়ে চলার চেষ্টা করলেও সময়ের সঙ্গে দাম্পত্য অশান্তি বাড়তেই থাকে। দাম্পত্য সংঘাত প্রবল হয় কন্যা সন্তানের জন্মে। সুধন্যর বিশ্বাস, কন্যাসন্তান স্ত্রীর সময় কাটানোর 'জিনিস'। সুধন্য স্ত্রীর সম্মুখেই নেশা, বান্ধবীর সঙ্গে পরকীয়ায় মেতে ওঠে। পিতামাতার অশান্ত পরিবেশের মধ্যে মেয়েকে বড় করতে চায়নি শ্রীলা। স্বামীনির্ভর জীবন ছেড়ে স্বনির্ভরতার জন্য চাকরির সন্ধানে শ্রীলার বাইরে জগতে পা রাখায় প্রবল আপত্তি সুধন্যর। আত্মমর্যাদার সঙ্গে স্বাধীন, স্বনির্ভরশীল হয়ে বাঁচার তাগিদে শ্রীলা দাম্পত্য সম্পর্কে ভেঙে একাকী নবজীবনের পথ চলা শুরু করে। বর্তমানে শ্রীলা স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত নয়, দীর্ঘ সংগ্রামের পর সমাজে প্রখ্যাত সমাজসেবী হিসেবে নিজস্ব পরিচয় গড়ে তুলেছে।

আবার লেখিকার গল্পের আধুনিক নারীরা নিজেদের জীবনের রাশ অন্যের হাতে দিতে অনিচ্ছুক। প্রগতিশীল নারী নিজের জীবনকে স্বনিয়ন্ত্রিত করতে চায়। 'নিয়ন্ত্রণের অধিকার' (১৯৯৭) গল্পে মেয়েটি নিজের জীবনে অন্যের কর্তৃত্ব মানতে নারাজ। মেয়েটি কেরিয়ার, ভালোলাগা, প্রেম, বিবাহ এমনকি যৌনতা বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধান্ত নিতে চায়। আমাদের মনে হতে পারে লেখিকার গল্পের আধুনিক নারীরা উগ্র নারীবাদের ভাবনায় বিশ্বাসী। এ ভাবনা সম্পূর্ণ ভুল, তাঁর গল্পের আধুনিক নারীরা উচ্ছৃঙ্খল নয় বরং নারীরা জীবন সম্পর্কে আত্মসচেতন।

জয়া মিত্র সত্তর দশকে নকশাল আন্দোলনের একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। রাজনীতির কারণে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পা রেখেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন পার্টির মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদের। রাজনীতির অঙ্গনে সেইসব লড়াকু নারীদের কথা পাই জয়া মিত্রর গল্পে। সংসার হোক বা রাজনীতির ময়দান উভয়ক্ষেত্রেই নারী স্বাচ্ছন্দ্যময়ী। সেই ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে 'শেল্টার' (১৯৯৫) গল্পে। স্বামীর চাকরির সূত্রে পাণ্ডববর্জিত স্থানে চার ছেলেমেয়ে ও 'হাঁড়ি-হেঁসেল' নিয়েই দিন কাটে সরস্বতীর। চার দেওয়ালের মধ্যে একঘেয়েমির জীবনে মুক্তির অন্বেষণ করে সরস্বতী। সরস্বতীর কাছে, মেয়ে হয়ে জন্মানো অভিশাপের-

> "জানো না তো মেয়েজন্ম কত যে কঠিন। প্রেম করেই হোক বা সম্বন্ধ করেই হোক, বিয়ে হয়ে একবার এসে ঢুকলে আর বাকি সব রাস্তা বন্ধ। দু-দিন আগেই হোক বা পরেই হোক। নিজের অতীতের আর কোন পরিচয়ই থাকবে না কোথাও। কখনো যে গান গাইতাম, পড়াশুনা করতে ভালোবাসতাম, লোকজন হাসিখুশি – সমস্ত ভুলে গেছি। এই দামাল বাচ্চাদের সামলে বড়ো করতে থাকা, রান্না সেলাই ঘর পরিস্কার আর যে ওঁর মনে হল কাছে যাওয়া, ভয়ে লজ্জায় মরি, যদি ছেলেরা জেগে ওঠে। কিছু বলবার সাহস হয় না।"[৬]

আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে সন্তান সামলানো আর বিছানায় স্বামীর যৌনলালসা মেটানোয় ছিল সরস্বতীর জীবন। গল্পে নন্দিতা চরিত্রটি সরস্বতীর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের। নন্দিতা নকশাল কর্মী। পুলিশের নজর এড়াতে সে আশ্রয় নেই সরস্বতীর বাড়ির পাশে। দুই নারীর মধ্যে গড়ে ওঠে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। সরস্বতীর জীবনে কিছু না হতে পারার আক্ষেপগুলো পরিপূর্ণতা খুঁজে পায় নন্দিতার মধ্যে। গোপন আস্তানা বদলের দিন নন্দিতাকে স্মৃতিস্বরূপ সরস্বতী শাড়ি উপহার দেয়-

> "তুমি কাল না হয় পড়ে যেও। আমার বড্ড ভালো লাগবে যে আমি যেমন হতে পারিনি একজন তেমনি হয়েছে। এই শাড়িটা তোমার কাছে থাকলে মনে হবে আমি একটু একটু তোমার কাছে আছি।"[৭]

আমাদের সমাজে বহু নারীকে পরিস্থিতির চাপে অসহায়, নিরুপায় হয়ে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী থাকতে হয়। সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে আটকে থাকলেও প্রতিটি নারীর মনে থাকে লড়াকু মানসিকতা।

'স্বজন-বিজন' (১৯৮৭) গল্পটিও রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত। গল্পটি আত্মকথনরীতিতে রচিত। পুলিশের খাতায় 'মোস্ট ওয়ান্টেড উইম্যান' মীরা অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। থানায় মীরার উপর চলে পুলিশের অকথ্য অত্যাচার। মনে মৃত্যুভয় মীরার কাছে পরাজয়। লেখিকা লকাআপে বন্দী মীরার চরিত্রে অন্তঃসংলাপের দ্বারা চেতনার প্রবাহ বা steem of consciousness রীতির প্রয়োগ করেছেন। মীরার পিতা-মাতা কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পার্টির সক্রিয় কর্মী হয়েও পিতামাতার ছয় সন্তানের জন্ম দেওয়া মীরার কাছে অপরাধ। রাজনীতিতে ব্যস্ত পিতা সংসারের প্রতি ছিল দায়িত্বহীন, গর্ভবতী অবস্থায় মায়ের বারো দিনের অনশনের কারণে মীরার দিদি বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়। বিকলাঙ্গ শিশুর দায় নিতে অস্বীকার করে পিতামাতা। অথচ মীরার পিতামাতা অতিবিপ্লবের দ্বারা পৃথিবীর অসহায় মানুষদের পাশে থাকার কথা বলে-

> "যারা পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত মানুষকে ভালোবাসার কথা বলে তারা নিজেদের স্ত্রীকে, বাচ্চাকে, কমরেডদের বাচ্চাকে ভালোবাসবার তাদের যত্ন নেবার কথা চিন্তা করেনি।"[৮]

মীরার কাছে অতিবিপ্লব সর্বনাশা। অতিবিপ্লব ভাবীপ্রজন্মকে সুন্দর পৃথিবী দান করতে পারে না। মীরার মতো নির্ভীক রাজনৈতিক কর্মীরা পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটিয়ে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জয়ের স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্নপূরণে মৃত্যু বরণেও তারা অকুতোভয়া।

জয়া মিত্রর গল্পে দেখি, পুরুষতান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারীরাই স্বাধীন, স্বনির্ভরশীল হতে চাওয়া নারীদের প্রধান শত্রু। সংসারের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে স্বল্পশিক্ষিত সংস্কারাচ্ছন্ন নারীরা নিজেদের আধিপত্য ফলায়। যুগের পর যুগ ধরে চক্রবৎ নারীর কূপমণ্ডুকতার জীবন আবর্তিত হচ্ছে। বিবাহের পর নববধূটিকে শুনতে হয় শাশুড়ির অহরহ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, পরবর্তীকালে সেই নববধূটিই শাশুড়ি হয়ে পুত্রবধূর সঙ্গে সমরূপ ব্যবহার করে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম মেয়েদের মধ্যে চলে আসা হীন মানসিকতাকে জয়া মিত্র ধিক্কার জানিয়েছেন 'চক্রবৎ' (১৯৯৩) গল্পে। গল্পটি আত্মকথনরীতিতে রচিত। গল্পকথক বর্তমান ও অতীতকে বিধৃত করেছেন এই গল্পে। উত্তম পুরুষের কথনে বর্ণিত গল্পে দেখি কথক বর্তমানের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অতীত জীবনের

স্মৃতিচারণা করে। গল্পকথক কেবল অতীত জীবনের স্মৃতিচারণা করে না, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অতীতের ঘটনার পুনর্মূল্যায়ণ করে। যার ফলে অতীতের ঘটনার নিরীক্ষে বর্তমানের ঘটনার ঠিক ভুল বিচার করতে পারে। গল্পে দেখি, বহু বছর পর শেফালীর সঙ্গে গল্পকথকের হঠাৎ সাক্ষাৎ, গল্পকথক পূর্বে শেফালীদের বাড়ি ভাড়া থাকত। শেফালীর নাতনীর মুখেভাত অনুষ্ঠানে গল্পকথককে আমন্ত্রণ জানায়। এক মুহূর্তে গল্পকথকের মনে পুরনো স্মৃতি ভীড় করে। শেফালী তখন নববধূ। শেফালীর শাশুড়ি ছিল 'সেকেলে' চিন্তাভাবনার লোক; আধুনিক যুক্তি, বিজ্ঞানসম্মত কথাবার্তা ছিল তার কাছে হাস্যকর। সংসারের সর্বময় কর্ত্রী শাশুড়ির ভয়ে সর্বদা উৎকণ্ঠিতা থাকত শেফালী। নিজের মেয়েদের শত অপরাধ মার্জনীয় হলেও পুত্রবধূর কাজে 'পান থেকে চুন খসলেই তিনি ভয়ঙ্করী। সামান্য ভুল হলেও শেফালীকে শুনতে হতো 'অভাগীর বেটি', 'ছোটলোকের মেয়ে', 'হা-ভাত ঘরের মেয়ে' কটূক্তি। শাশুড়ির অন্যায় তিরস্কারেও শেফালী মাথা নত করেছে। সেই লাজুক, ভীতু, সর্বংসহা নববধূ শেফালী আজ তার পুত্রবধূর শাশুড়ি। শাশুড়ির সমস্তগুণ শেফালী অর্জন করেছে; সামান্য ভুলত্রুটিতে নববধূটিকেও শুনতে হয় শেফালীর তর্জন-গর্জন, কটূক্তি-

> "নিজে যেমন হাভাতে ঘরের মেয়ে সেইরকম ভাবনাচিন্তা। উৎসবের দিনে পাঁচটা লোক আসছে, বাচ্চার গয়নাগাঁটি দেখবে-এইসব জ্ঞানগম্যির শিক্ষা তোমার মা-বাপ তোমারে দেয় নাই সে আমি খুব জানি। নবাবের বেটির মতো যাও কোথায়, এদিকে আসো।"[৯]

সময়ের সঙ্গে শেফালী নিজেকে শশুড়ির আদলে গড়ে তুলেছে। গল্পের শেষ লাইনে লেখিকা সমাজের বুকে কশাঘাত করেছেন- "আর একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে এই মেয়েটি আমার পায়ের নীচে নিচু হবার চেষ্টা করে।"[১০] চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ সংকীর্ণমনা নারীদের হীন মানসিকতা চক্রবৎ আবর্তিত। শিক্ষা ও উন্মুক্ত চিন্তাভাবনায় নারীর গণ্ডিবদ্ধ আবর্তনের বৃত্তকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারে।

সমাজিক বা পারিবারিক পরিস্থিতির চাপে অসহায়, নিরুপায় নারীর জীবন উঠে এসেছে জয়া মিত্রর গল্পে। সমাজের গতানুগতিক নিয়মের বেড়াজালে নারীরা সহজেই বাঁধা পড়ে, সেই জাল থেকে নারীর পরিত্রাণ নেই। 'দ্রৌপদী' (১৯৮৭) জয়া মিত্রর প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প। সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকেই নারী পণ্যবস্তু। যুগে যুগে দ্রৌপদীরা পরিবারের আত্মস্বার্থপূরণের পণের সামগ্রী। আমাদের সমাজে সীতারা বারবার অগ্নিপরীক্ষা দেয়, দ্রৌপদীদের করা হয় উলঙ্গ। লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন, একবিংশ শতাব্দীতে নারী এখনো দ্রৌপদী সম। গল্পে দেখি, দুর্ঘটনায় বাপ-দাদার মৃত্যুর পর পরিবারের সকল দায়িত্ব নেয় জামাই রবি। পরিবারে সংকটের কালোমেঘ ঘনিয়ে আসে বড় দিদির মৃত্যুতে। রবি পুনরায় বিবাহ করলে হয়তো পরিবারের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করবে অথবা নববধূর কাছে অপমানিত হবার আশঙ্কায় বাড়ির সকলেই আতঙ্কিত। আসন্ন বিপদ থেকে পরিবারটি উদ্ধার পেতে বাড়ির ছোট মেয়ে ঝুমলাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। ঝুমলার সঙ্গে জামাইবাবু রবির বয়সের বিস্তর ব্যবধান। ঝুমলা ছোট থেকে জামাইবাবুর সঙ্গে দাদার মতো মিশেছে, সম্মান করেছে। সেই মানুষটির সঙ্গে বিবাহ, একই বিছানায় যৌনমিলন অকল্পনীয় ঝুমলার কাছে। কিন্তু পরিবার পরিস্থিতির চাপে ঝুমলা বাধ্য হয় রবিকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে। লেখিকা গল্পের শেষ লাইনে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন- "আমার ঠিক পিছনেই সাদা দেওয়াল। আমি জানি।"[১১] দেওয়াল বোঝায় সীমাবদ্ধতাকে। ঝুমলা জানে তার পিঠ দেওয়ালে ঠিকে গেছে সেখান থেকে পালানোর উপায় নেই। আত্মস্বার্থসাধনে সম্পর্কের মূল্যবোধের, মানবিকতার সংকট অবক্ষয়িত সমাজের দিকটিকে জানান দেয়।

পৌরুষতান্ত্রিক আধিপত্য, ক্ষমতাধরদের বিরুদ্ধে একা নারী বড্ড অসহায়। 'লোকশিক্ষা' (১৯৯৭) গল্পে স্বামী ও কন্যা নিয়ে দুর্গার ছোট্ট পৃথিবী। সাংসারিক বুদ্ধিতে নিপুণা দুর্গা সকলের কাছে সৎ, স্পষ্টবক্তা, প্রতিবাদী হিসেবে পরিচিত। স্বামীর স্বল্প উপার্জন সঞ্চয় করে দুর্গা নিজস্ব বাড়ি কেনে। এই বাড়িকে কেন্দ্র

করেই পাড়ায় রাজনৈতিক নেতা, জমি মাফিয়া বীরেনের সঙ্গে ঝামেলার সূত্রপাত। বীরেন চেয়েছিল দুর্গার বাড়ি কিনে প্রাসাদপ্রাঙ্গণ গড়তে। বীরেনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয় দুর্গার প্রতিবাদে। কেবল তাই নয়, বীরেনের স্ত্রীর লোকদেখানো শিশু উন্নয়ন সমিতির মিছিলের ভণ্ডামিকে দুর্গা প্রতিবাদ করেছে –

> "তা ছাড়া তোর মাকে বলবি রাস্তায় শিশু শ্রমিকের মিছিল করলেই হয় না, লোকের ছেলেগুলোকে পেটভাতায় বাড়িতে খাটায় পেটভরে দুটি খেতে দেয় না অষ্টপ্রহর গালি দিচ্ছে – সেগুলোর সঙ্গে একটু মানুষের মতো ব্যবহার করতে শিখুক আগে।"[১২]

আত্মসম্মানে ঘা দেওয়া দুর্গাকে শিক্ষা দিতে বীরেন তাকে ধর্ষণ করে-

> "বীরেন তার বস্ত্রহীন শরীর জাপটে ধরে গালের ওপর দুপাটি দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গীরা হাসছে হ্যা হ্যা করে। রক্তসুদ্ধ থুতু ফেলে বীরেন দুর্গার শরীরটাকে ঠেলে মাটিতে ফেলে দেয়।"[১৩]

দুর্গার এমন শোচনীয় অবস্থাতেও নির্বাক জনগণ। বর্তমানে দুর্গারা ক্ষমতাধর, কামান্ধ, নারীলোলুপ অসুরদের কাছে পরাজিত।

সভ্যতার অগ্রগতি হলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভাবনা সেকেলে, স্থবির। স্বাধীনতার এত বছর পরেও নারীর সবৈব মুক্তি হয়েছে কিনা তা আমাদের প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করায়। 'স্বাধীনতার যমজ' (১৯৯০) গল্পে সুখবিন্দরের জন্ম হয় পনেরো আগস্ট। বাবা-মা ভালোবেসে নাম রেখেছিল আজাদ কউর। নারীর নামে স্বাধীনতাকে মেনে নেয়নি ঠাকুমা, 'আজাদ' পরিবর্তে নাম রাখে সুখবিন্দর। সুখবিন্দরের বিবাহ ঠিক হয় তিন ছেলেমেয়ের পিতা, বিপত্নীক মধ্যবয়সী পুরুষের সঙ্গে। আশ্চর্যের বিষয় মেধাবী, প্রতিবাদী, শিক্ষিকা সুখবিন্দর বিনা আপত্তিতে এই বিবাহ মেনে নেয়। কারণ, তার বাপ-দাদারা এই বিবাহ স্থির করেছে-

> "পরিবারের বড়দের অবাধ্য হওয়া নাকি একেবারে অসম্ভব ওদের মধ্যে। ওদের সমাজে কিছু নির্দিষ্ট রীতিনীতি আছে, সেগুলো না মানলে সমাজের মধ্যে থাকা যায় না।"[১৪]

স্বনির্ভরশীল নারীও সমাজ-পরিবারের কাছে কলের পুতুল। গল্প এগোলে দেখি কোন এক অজানা কারণে সুখবিন্দরের বিবাহ ভেঙে যায়। তার বিবাহ হয় সুদর্শন যুবক, আই.পি.এস অফিসারের সঙ্গে। দাম্পত্যজীবনে চরমসুখী গর্ভবতী সুখবিন্দর মাতৃত্বের জন্য উদগ্রীব। প্রসবযন্ত্রণায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে সুখবিন্দরকে বাঁচানো গেলেও তার শিশুটি মারা যায়। প্রাণে বাঁচলেও সুখবিন্দর চিরদিনের মতো জননী হওয়ার স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়। শ্বশুরবাড়ি ছেলের দ্বিতীয় বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান করে, কারণ বন্ধ্যা নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কেবল বোঝা-

> "ওর শ্বশুরবাড়ি মেয়ের খোঁজ করছে, ছেলের বিয়ে দেবে। অফলা গাছের মত বাঁজা বৌ সংসারের অলক্ষণ, সুখবিন্দরকে আর দরকার নেই তাদের।"[১৫]

একজন আই.পি.এস অফিসারের মতো শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে বন্ধ্যা নারী কেবল 'ঝঞ্ঝাট'। সুখবিন্দর বিবাহ বিচ্ছেদ চায়নি। প্রথম স্ত্রীর বর্তমানে আই পি এস অফিসারের দ্বিতীয় বিবাহ সমাজের কাছে গর্হিত কাজ। পথের কাঁটাকে দূর করতে শাশুড়ির বিষ মেশানো খাবার পোষা কুকুর খাওয়ায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় সুখ। এই অন্যায়ের পরেও সুখবিন্দর পুলিশের কাছে অভিযোগ করেনি, কারণ সমাজে তার বাপ-দাদার সম্মান আছে, আদালতের চক্কর কাটলে সম্মানহানি হবে। নারী সমাজ ও পরিবারের জটিলতার শৃঙ্খলে এমনভাবে আবদ্ধ যে প্রতিবাদ করলে তাদের পায়ে বাঁধা শিকল ঝনঝনিয়ে ওঠে।

জয়া মিত্র বারবার পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। 'খেয়া' (১৯৯৪) গল্পে সাগরময়ীর বিবাহ হয় তার থেকে সাতাশ বছরের বড় বিপত্নীক তিন ছেলেমেয়ের পিতার সঙ্গে। স্বামীর প্রথম পক্ষের বড়

ছেলে চার বছরের, মেজ ছেলে দুই বছরের বড় এবং মেয়েটি সমবয়সী। সম্পর্কের অদ্ভুত অস্বস্তি কিছুদিনের মধ্যে কাটিয়ে উঠলেও সাগরময়ীকে চরমলজ্জা ঘিরে ধরে যখন সে এবং বড় ছেলের বৌ একসঙ্গে গর্ভবতী হয়-

> "তবু একটা লজ্জার কথা খুব ভিতরে কোথায় যে অস্বস্ত ঠিক যখন প্রায় একই সঙ্গে গর্ভিণী হতেন দুজনে। সৌরভী যে ছেলের বৌ। সেই ছেলের সামনে মাকেও যখন ভারী শরীর নিয়ে চলাফেরা করতে হয়, বড় লজ্জা হত। অথচ পুরুষমানুষ কেন বোঝে না? তাদের লজ্জা হত না? তারাও তো বাবা আর ছেলে?"[১৬]

পুরুষমানুষের লজ্জা হয় না, আসলে পিতা হোক বা পুত্র নারীশরীরলোভী পুরুষরা চায় কামচরিতার্থ করতে। নারীর মনে অবগাহন করে নারীর মর্মবেদনাকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা নেই কামলোলুপ পুরুষের।

জয়া মিত্রর গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে নারীজীবন। পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে বদলেছে নারীর জীবন। বর্তমান সময়ে অনেকক্ষেত্রে নারীর উন্নতি হলেও, এখনো বহু নারীর জীবন তিমিরাচ্ছন্ন। প্রগতিশীল, স্বাধীন, স্বনির্ভরশীল নারীর পাশাপাশি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিধিনিয়মের নাগপাশে বন্দী নারীজীবন চিত্রিত হয়েছে জয়া মিত্রর গল্পে। তাঁর গল্পের নারীরা সময় ও সমাজের প্রতিবন্ধকতাকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উত্তরণের কথা বলে।

তথ্যসূত্র:

১. মিত্র, জয়া। শ্রেষ্ট গল্প। দি সি বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ-১৯৯১, কলকাতা-০৭, পৃ. ৫০।
২. তদেব, পৃ. ৫২।
৩. মিত্র জয়া। গল্পসমগ্র। পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০১৮, কলকাতা-১০, পৃ. ৬৯।
৪. তদেব, পৃ. ৭৩।
৫. মিত্র জয়া। শ্রেষ্ট গল্প। দি সি বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ-১৯৯১, কলকাতা-০৭, পৃ. ১৩৭।
৬. তদেব, পৃ. ১৭৩।
৭. তদেব, পৃ. ১৮২।
৮. তদেব, পৃ. ১৫৪।
৯. তদেব, পৃ. ৩২।
১০. তদেব, পৃ. ৩২।
১১. মিত্র, জয়া। কাল পরশুর ধারাবাহিক। করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ বইমেলা- ১৯৯৮, পৃ. ৮১।
১২. তদেব, পৃ. ৪৫।
১৩. তদেব, পৃ. ৪৯।
১৪. তদেব, পৃ. ৩৪।
১৫. তদেব, পৃ. ৩৫।
১৬. মিত্র, জয়া। শ্রেষ্ট গল্প। দি সি বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ-১৯৯১, কলকাতা-০৭, পৃ. ১২৮।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 502-510
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.236

ব্যাঘ্র প্রকল্প ও অরণ্যভূমিপুত্রদের জীবনকথা: অরণ্য ও শিকারকেন্দ্রিক বাংলা কথাসাহিত্য অবলম্বনে একটি পর্যালোচনা

পূজা ভুঁঞে, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস, উত্তরপ্রদেশ, ভারত*

Received: 20.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the present article, the lived realities of life and livelihood of forest-dwelling communities are analysed in the context of the 'Tiger Project', drawing upon Bengali forest and hunting-centred fiction. While state-driven wildlife conservation policies have accorded significant importance to forest preservation and the increase of the tiger population, the life security, livelihood, and rights of forest-dependent working people have remained comparatively neglected. This inherent contradiction is brought to light through close readings of selected literary texts. In Bengali fiction, the 'Tiger Project' is represented at times as a symbol of conservation, and at other times as an experience of fear, uncertainty, and deprivation for forest-dwelling communities. The terror of man-eating tigers, restrictions on forest use, crises surrounding compensation and rehabilitation, and the silenced voices of marginalised people— these issues are transformed into humanistic and ethical questions through literary narratives. This review includes forest and hunting-centred narratives by Deviprasad Bandyopadhyay, Shibshankar Mitra, Buddhadeb Guha, and Chandranath Chattopadhyay. Consequently, the objective of the present article is to examine the literary representation of the lived realities, psychological tensions, and conflicts of forest-dwelling people with forest policies, as portrayed in selected Bengali forest and hunting-centred fiction centred on the Tiger Project.

Keywords: Environmental Consciousness, Forest and Hunting-Centric Bengali Fiction, Forest Policy, Forest-Based Working Communities, Indigenous Forest Dwellers, Tiger Project, Wildlife Conservation

অরণ্য ও শিকারকেন্দ্রিক বাংলা কথাসাহিত্য দীর্ঘদিন ধরেই প্রকৃতি ও মানব সম্পর্ককে উন্মোচিত করে এসেছে। এই সাহিত্যধারায় অরণ্য কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পটভূমি না হয়ে সরাসরি মানব সভ্যতা কর্তৃক প্রকৃতির ধ্বংসলীলার প্রতিচ্ছবি উন্মোচিত করে, সেইসঙ্গে প্রকৃতি সচেতনতার বার্তা দেয়। ঔপনিবেশিক সময় থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্ব পর্যন্ত অরণ্যকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, শিকারনীতি ও সংরক্ষণমূলক উদ্যোগ সাহিত্যের ভাষায় নানা রূপে, নানাভাবে প্রতিফলিত হয়ে এসেছে। এই পর্যায়ে স্বাধীন ভারতবর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ 'বাঘ প্রকল্প'। বাঘ সংরক্ষণ উদ্যোগ বাংলা সাহিত্যের অরণ্য ও শিকারকেন্দ্রিক কাহিনিগুলোকে প্রভাবিত করেছে। এই প্রকল্প মূলত বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী রক্ষার একটি পরিবেশবান্ধব

উদ্যোগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, অরণ্যকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যে এর প্রতিফলন ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে, যেখানে অরণ্য-অধিবাসী ও এই প্রকল্পের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। যার বিশ্লেষণে উঠে আসে বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প অরণ্য ভূমিপুত্র অধিবাসীদের জীবনে জন্ম দিয়েছে ভয়, অনিশ্চয়তা ও জীবিকাগত সংকট। অন্যদিকে, পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলত বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল অরণ্য ও শিকারকেন্দ্রিক নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে বাঘ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে অরণ্যঅধিবাসী মানুষের জীবনবাস্তবতা, মানসিক টানাপোড়েন ও রাষ্ট্রীয় বননীতির সঙ্গে তাদের সংঘাতের সাহিত্যিক রূপ বিশ্লেষণ করা।

ভারতীয় বাঘ প্রকল্প এমন একটি পরিবেশগত বিপ্লব, যা বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত নৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ভারতীয় অরণ্যে ও সেইসঙ্গে জাতীয় স্তরে বাঘের সংখ্যা অত্যাধিক কমে গিয়ে বিপন্নতার মুখে পড়লে ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার 'Tiger Project' বা বাঘ প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বাঘের সংখ্যা পুনরুদ্ধার করা, তার বাসস্থান রক্ষা করা, এবং সেইসঙ্গে অরণ্য ও এর পরিবেশগত মূল্যকে একটি জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে সংরক্ষণ করা। বর্তমানে এই উদ্যোগ আঠারোটি রাজ্যে প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি 'টাইগার রিজার্ভ'-এ বিস্তৃত হয়ে, প্রায় পঁচাত্তর হাজার (৭৫,০০০) বর্গকিলোমিটার বনাঞ্চল জুড়ে কাজ করছে— যা ভারতের মোট ভূ-ক্ষেত্রের প্রায় দুই দশমিক দুই (২.২) শতাংশ।[১] এই প্রকল্পকে বাস্তবায়নের জন্য গঠন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার বন-পরিবেশ মন্ত্রকের অধীনে 'National Tiger Conservation Authority' (NTCA)। যা নীতি নির্ধারণ, তহবিল পরিচালনা এবং প্রতিটি রিজার্ভে ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক কাজ তদারকি করে।[২] প্রকৃতির চোখে বাঘ হল 'Umbrella Species' অর্থাৎ এটি শুধু নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় নয়, বরং তার সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য প্রাণী ও 'ইকোসিস্টেম' তথা বাস্তুতন্ত্র-এর ভারসাম্যও ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলত বাঘের সংরক্ষণ মানে পশুপাখির খাদ্যশৃঙ্খলা, বৃক্ষ, জলাশয়, মাটি এবং অন্যান্য জীবের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।[৩]

বস্তুত, 'বাঘ প্রকল্প'-এর বাস্তব কার্যক্রমগুলো যথেষ্ট বিস্তৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ। এটি কেবল বনাঞ্চলকে 'রিজার্ভ' হিসেবে ঘোষণা করেই থেমে থাকেনি, সেইসঙ্গে তৎকালীন উগ্র ও অনৈতিক শিকারিদের বিরোধিতা করেছে, বিশেষ করে অবৈধ শিকার তথা চোরা শিকার বন্ধ করতে এই পদক্ষেপ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বাঘদের নিকটবর্তী এলাকা থেকে মানুষের বসবাস সরিয়ে নেওয়া, বনকর্মী ও সুরক্ষার কৌশল শক্তিশালী করে গড়ে তোলা, বনাঞ্চলের জল সংস্কার, পশুপক্ষীর প্রজনন ও খাদ্যশৃঙ্খলার উন্নয়ন, মানচিত্র ও উন্নত টেকনোলজি ব্যবহার করে সেই সমস্ত এলাকায় স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যকলাপ পরিবেশের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। এমনকি বিভিন্ন রিজার্ভে 'Anti-poaching squads' বা চোরা শিকার বিরোধী বিশেষ দল তৈরি করা হয়েছে, যাদের কাজ অবৈধ শিকার, পাচার ও বনদস্যুতার বিরুদ্ধে লড়াই করা। এই পদক্ষেপ বাঘকে রক্ষা করার পাশাপাশি বনাঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থানীয় জীববৈচিত্র্যকে শক্তিশালী করে।

দুই

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অবিশ্বাস্য অভিযান' গ্রন্থে বিখ্যাত মানব দরদি শিকারি জিম করবেটের শিকার জীবনাংশের খানিকটা তুলে ধরা হয়েছে। জিম করবেটের বাল্যকালীন প্রকৃতিনির্ভর জীবনচিত্রের কথা বলতে গিয়ে সেই সময়ের পর্যাপ্ত বাঘের উপস্থিতির কথা উঠে এসেছে উল্লেখিত গ্রন্থে।

> "তিনি বাঘের প্রতি আগ্রহশীল হয়েছিলেন সেই তখন থেকে, যখন তাঁকে এমন একটা অঞ্চলে সেই শিশুকাল থেকে বসবাস করতে হয়েছিল, যেখানে বাঘ ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং তাদের হালচাল লক্ষ্য করবার মতো সময়েরও অভাব ছিল না।"[৪]

উল্লেখিত শিকারিকে মানব দরদি শিকারি বলার কারণ তৎকালীন সময়ে বাঘের সংখ্যা পর্যাপ্ত থাকায় বাঘ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তখনও বিশেষভাবে অনুভূত হয়নি। সেই বাস্তবতায় রাষ্ট্র ও প্রশাসনের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মূলত মানুষখেকো বাঘের কবল থেকে গ্রামীণ দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জীবনরক্ষার দিকে। সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি বদলেছে। বাঘের সংখ্যা ভয়াবহভাবে হ্রাস পাওয়ায় সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বন্যপ্রাণীরা বনে থাকলেই সুন্দর— যদিও বাস্তবে সেই বন মানুষের হস্তক্ষেপে ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। ফলে আজ বন্যপ্রাণীরাও তাদের নিজস্ব আবাসভূমি হারিয়ে কার্যত উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে, যা মানবসভ্যতার নৈতিক সংকটকে উন্মোচিত করে।[৫] যাইহোক, কেবল বাঘই নয়, অবিভক্ত ভারতবর্ষে অন্যান্য পশু-পাখির সংখ্যাও ছিল বিপুল।[৬] কালাগড় জঙ্গলের সমৃদ্ধ পশু-পাখি সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> "কালাগর বাংলো থেকে জঙ্গলের রাস্তাটা পাইন, ওক এবং রডোডেনড্রন্ গাছের খুব সুন্দর বনের ভেতর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। কুমায়ূনের অন্য বনের তুলনায় এই বনে অনেক বেশি শিকার পাওয়া যায়। সম্বর, হরিণ, কাকর ও শুয়োর প্রচুর পরিমাণে বাস করতো। সে তুলনায় পাখীর সংখ্যাই কিন্তু বেশি।"[৭]

সুন্দরবন পটভূমিকে কেন্দ্র করে রচিত 'সুন্দরবন আতঙ্ক' উপন্যাসে, সুন্দরবনের 'আতঙ্ক' বলতে এখানকার বাঘ তথা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে, একসময় অসংখ্য সুন্দরী গাছ থাকার জন্য এই বনাঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছিল সুন্দরবন। কিন্তু কথক যে সময়ে সুন্দরবনে অবস্থান করছেন তখন কিন্তু সুন্দরী গাছ অস্তিত্ব সংকটের পথে বিচরণ করছে। সুন্দরবনের সেই সৌন্দর্য আর নেই। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বনে; অন্যদিকে মানুষ কেবল বন্যপ্রাণীই নয়, নির্বিচারে ধ্বংস করেছে তাদের আবাস্থল বনভূমিও। এই প্রসঙ্গে কাহিনিতে পাওয়া যায়-

> "সমুদ্র উপকূলবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে বনজ সম্পদ বলতে বিশেষ কিছু নেই। এই অঞ্চলে নতুন করে আর গোলপাতার চাষ হয় না, আগেকার দিনে ঘর ছাওয়ার কাজে গোলপাতার ব্যবহার হত। ইদানীং কদাচিৎ চোখে পড়বে গোলপাতার বাহার— ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এখানে-ওখানে।"[৮]

এইভাবে বন ধ্বংসের ফলে বাঘ তার আবাসভূমি ছেড়ে লোকালয় মুখী হয়। বনে স্বাভাবিক খাদ্য না পেয়ে অথবা মানুষের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত (বয়স জনিত কারণেও) হয়ে নরখাদকে পরিণত হয়।

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের সংকটময় পরিস্থিতি ও তার থেকে পরিত্রাণের উপায়ের কথা বলেছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত উপন্যাসে। লেখকের সেই বক্তব্যের ভাবান্তর এরূপ- সুন্দরবন একদিকে যেমন ভয়াবহ ও অরণ্যঘেরা বন্য প্রকৃতির প্রতীক, অন্যদিকে তেমনি তার সৌন্দর্য সীমাহীন ও আকর্ষণীয়। এই কঠোর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই মানুষের অবসর ও মানসিক প্রশান্তির জন্য গড়ে উঠেছে পাখিদের সংরক্ষিত আবাস— পাখিরালয়। এটি সজনেখালি বনদপ্তরের কাছাকাছি অবস্থিত এবং এখানে বিরল প্রজাতির পাখি, যেমন পেলিক্যান, দেখার সুযোগ মেলে। সুন্দরবন অঞ্চলে বর্তমানে একাধিক অভয়ারণ্য রয়েছে— লেথিয়ান দ্বীপ, হ্যালিডে দ্বীপ ও সজনেখালি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প চালু হওয়ার পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ করা গেলে কিংবা পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন উপযোগী উদ্ভিদ রোপণ সম্ভব হলে, পাখিদের খাদ্য ও নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করা যেতে পারে। তাতে দেশীয় ও পরিযায়ী নানা প্রজাতির পাখি সেখানে আশ্রয় নেবে এবং তাদের কলরবে সুন্দরবন আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। অথচ অতীতে এই সুন্দরবনেই বন্য মহিষ ও গণ্ডারের মতো বৃহৎ প্রাণীর বসবাস ছিল— যা আজ বাস্তবতার তুলনায় প্রায় অকল্পনীয় ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।[৯]

অবশ্য সুন্দরবন বনানী নিজেই নিজেকে রক্ষায় বিশেষ তৎপর। ভারতবর্ষের অন্যান্য জঙ্গলের তুলনায় এই বন ভিন্ন। মানুষের এখানে 'সহজ প্রবেশাধিকার' নেই। জলে জলজ প্রাণী, স্থলে ভয়ঙ্কর মানুষখেকো বাঘ, এমনকি সুন্দরবনের 'শুলো'— যা আরও ভয়ঙ্কর। এখানকার গাছেরা মাটির নীচ থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। ফলত গাছের শেকড় উপর দিকে গজিয়ে উঠে সূচলো হয়ে থাকে। তাই অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলতে হয়। এইভাবেই সুন্দরবন নিজেকে নাগরিক সভ্যতা থেকে খানিকটা বাঁচিয়ে রেখেছিল; কিন্তু সর্বগ্রাসী মানুষের বুদ্ধির কাছে পেরে ওঠেনি।

> "এ-হেন নোনা-বাদা মানুষকে সব ঋতুতে বরদাস্ত করতে পারে না, তাই তার দ্বার ছয়মাস থাকে রুদ্ধ। তবু অসীম সাহসী মানুষ অতীতের কোন এক সময় এই বন্য-বাদাকে জয় করার জন্য বসতি স্থাপনের দুঃসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে প্রয়াস ছিল খেয়ালী প্রকৃতির কাছে নেতাত-ই অকিঞ্চিৎকর।"[১০]

লেখক সুন্দরবনকে সময়ের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত সুন্দরবন মানব সভ্যতার অত্যাচার সহ্য করে। কারণ এই সময়টা সুন্দরবনের জীবিকা নির্ভরকারী মানুষদের সময়। এই সময় কাঠুরের দল, জেলের দল, মধু সংগ্রহকারীরা সুন্দরবনে প্রবেশ করে জীবিকার প্রয়োজনে।[১১] মানুষের উপস্থিতি ও প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতা প্রতিফলিত হয়েছে যেভাবে- মরশুমি কাজ শুরু হলেই বাদার মানুষের জীবনযাত্রায় নতুন গতি আসে। প্রায় ছয় মাস ধরে তারা হয়ে ওঠে কর্মচঞ্চল ও ব্যস্ত। এই পরিবর্তনের প্রভাব শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না— বনের প্রাণীজগতেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। যেন দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর বাদা অঞ্চলের বন আবার জেগে ওঠে। কাদায় গা ভিজিয়ে অলসভাবে পড়ে থাকা কুমীর জলে নেমে পড়ে, হরিণেরা অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে চারপাশের গন্ধ শোঁকে ও কান খাড়া করে শব্দ শোনে। বনের সবচেয়ে পুরোনো বাসিন্দা— বানরের দল গাছের ডালে দোল খেতে খেতে কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে অসতর্ক হরিণদের সাবধান করে দেয়, ঠিক যেন অভিজ্ঞ প্রহরীর মতো। সেইসঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বর আবার ছড়িয়ে পড়ে বনজুড়ে, আর সেই শব্দেই সাড়া পড়ে হেঁতাল ও গোলপাতার জঙ্গলে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনিতে দেখা যায়, সুন্দরবন কেন্দ্রিক শ্রমজীবী মানুষের কাছে 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' মোটেও সুখকর ছিল না। এমনকি তারা এই প্রকল্পের সমর্থনও করেনি। কারণ তারা মনে করে সুন্দরবনের বাঘ মাত্রই মানুষখেকো। কাহিনিকার জানান, 'বাঘ্র প্রকল্প' প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বেই তথা ১৯৭২ সালের শিকার আইনের কারণে সুন্দরবনের এমন অনেক ভয়ঙ্কর মানুষখেকো বাঘকে হত্যা করা যায়নি, যারা পরবর্তী সময়ে অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষকে হত্যা করেছিল। এমনই ভয়ঙ্কর মানুষখেকো কুশো, জটাধারী নামক বাঘেরা দীর্ঘদিন জীবিত ছিল। তারা বৃহৎ এলাকা জুড়ে ভয়ঙ্কর ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। এই প্রসঙ্গে লেখক বলেন-

> "১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত আমি জানি জটাধারী বেঁচে আছে। তারপর তো শিকার বন্ধ হয়েছে, প্রকল্প চালু হয়েছে। আশা করি নতুন প্রকল্পে জটাধারী ও কুশোর একটা সুবন্দোবস্ত করতে পারে।"[১২]

তিন

সুন্দরবনকে পটভূমি রেখে যাঁরা সাহিত্য নির্মাণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শিবশঙ্কর মিত্র অন্যতম তো বটেই সেইসঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর সুন্দরবন কেন্দ্রিক লেখকদের মাইলফলক তিনি। তাঁর 'বনের চোরের উপর শহরের বাটপাড়ি' গল্পে দেখা যায়, সুন্দরবনের মায়াদ্বীপে পাঁজজন স্থানীয় শ্রমজীবী মিলে শিকারে যায়। তখনও শিকার আইন অনুযায়ী অনুমতিপত্র নিয়ে শিকার করা যেত। তবে উল্লেখিত শিকারি দল বিনা

অনুমতিতেই হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে যায়। বন্য-সম্পদ আহরণে তাদের অধিকার রয়েছে, এরূপ ভাবনা থেকে তারা আইনে পালন করে না। এই প্রসঙ্গে উঠে আসে বাঘ প্রকল্পের কথা, যেখানে বলা হয়-

> "ব্যাঘ্র-প্রকল্প তখনও চালু হয়নি। বাঘ বা হরিণ মারতে কোনও বাধা তখন ছিল না, তবে সরকারি অনুমতি নিতে হতো। কিন্তু সুন্দরবনের মানুষেরা অতো অনুমতির ধার ধারে না। ওরা ভালোভাবেই জানে কি করে এই আইন এড়িয়ে কার্যসিদ্ধি করা যায়। এ নিয়ে অবশ্য ওদের কোনও মাথাব্যাথা নেই; কেননা ওরা মনে করে, বনের সম্পদে বনের উপকূলবাসীদেরই স্বাভাবিক অধিকার।"[১৩]

প্রসঙ্গত, সুন্দরবন উপকূলবর্তী মানুষের জীবনকথাকে কেন্দ্র করে শিবশঙ্কর মিত্র রচিত 'সুন্দরবন সমগ্র' গ্রন্থে বনবিভাগের অনুমতি ব্যতিরেক তথা বনবিভাগকে ফাঁকি দিয়ে শিকারে লিপ্ত স্থানীয় শিকারিদের প্রসঙ্গে কোথাও কোথাও 'চোরা শিকারি' কিংবা 'অবৈধ শিকার' শব্দবন্ধের ব্যবহার দেখা গেলেও, সেইসমস্ত ভূমিপুত্র অরণ্য অধিবাসীদের অপরাধীসত্তা চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি। কারণ উক্ত শব্দবন্ধের দ্বারা অপরাধ মূলক কাজকে বোঝায়। কিন্তু অরণ্যভূমিপুত্র যখনই বনের সম্পদ আহরণ করতে যায় অথবা শিকারে যায় তখন সেটাকে অবৈধ বলা যায় না। তারা নিজেরাও বিনা অনুমতি পত্রে শিকারের বিষয়কে গর্হিতের চোখে দেখে না। কারণ তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির সহায়ক হিসেবে তারা শিকার কার্যকেই মান্য করে। তাই এখনও কোনো কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো দিনে নিয়ম রক্ষার জন্য শিকার উৎসব পালিত হতে দেখা যায়।[১৪] বস্তুত, বন ও বন্যপ্রাণীকে উজাড় করে এসেছে বন ইজারাদার অথবা বাণিজ্যিক বনজ আহরণকারী সংস্থাগুলো। অরণ্য অধিবাসীরা গোপনে যে শিকার কার্যে লিপ্ত থাকে, তার মাংস অথবা অন্যান্য সামগ্রী তারা গ্রহণ করে না, করে এক শ্রেণীর উচ্চবিত্ত। যেদিন শিক্ষিত উচ্চবিত্তের এই চাহিদা শূন্য হয়ে যাবে সেদিন আর অবৈধ শিকারের প্রয়োজনই পড়বে না।

পূর্বোক্ত লেখকের 'আইরাজ' গল্পে 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' প্রসঙ্গে সুন্দরবনের এক বাউলে, সাপ প্রকল্পের কথা উত্থাপন করে বলে-

> "...আচ্ছা কর্তাসাহেব, শুনছি আপনারা কিছু দিনের মধ্যে সুন্দরবনে ব্যাঘ্র-প্রকল্প চালু করবেন। কিন্তু আপনারা কি সুন্দরবনে আইরাজ-প্রকল্প করতে পারেন না? এদের উদ্যত ফণা দেখলে হৃৎকম্প হয় বটে, কিন্তু দেখতে কি সুন্দর! বাঘের মতো এরাও তো বনের রক্ষক, তাই না!"[১৫]

যে আইরাজ সাপকে সে কিছুক্ষণ আগেই হত্যা করে, আবার তার উদ্দেশ্যেই প্রণাম করে বাউলে। এখানেই অরণ্য ভূমিপুত্র শিকারি ও শখের শহুরে শিকারির মধ্যে পার্থক্য। যেখানে এক সময়কার ব্রিটিশ শিকারিদল অথবা ভারতীয় উচ্চবিত্ত রাজা-মহারাজারা ও আরও পরে এসে একশ্রেণীর শখের বাবু শিকারিদল মৃত শিকারের উপর পা তুলে বীরত্বের ছবি তোলে, অন্যদিকে ভূমিপুত্র শিকারিরা মৃত বন্যপ্রাণের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়। যাইহোক, এই গল্পে পাওয়া যায় 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' প্রবর্তন হওয়ার পূর্বে সুন্দরবনের বাঘ শিকারের জন্য অনুমতিপত্র পাওয়া যেত। বনকর অফিস থেকে সেই অনুমতি নিয়ে বাঘ হত্যা করা যেত। কিন্তু বাঘ প্রকল্প চালু হওয়ার পর পুরোপুরি বাঘ শিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সেইসঙ্গে বাঘ সংরক্ষণে জোর দেওয়া হয়।

লেখকের 'বীরাঙ্গনা, না সুন্দরবনের মা!' গল্পে বাঘ প্রকল্প সম্পর্কে বলা হয়-

> "কিন্তু গত বারো বছর ধরে ব্যাঘ্র-পরিকল্পের দৌলতে ওদের সংখ্যা এমন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কাজেই খাদ্যের তাগিদে নদী-খাল পার হয়ে মাঝে মাঝে ঢুঁ মারতে হচ্ছে আবাদে, মানুষের রাজ্যে।"[১৬]

অর্থাৎ জঙ্গলে স্বাভাবিক খাদ্যের ঘাটতির জন্য বাঘ লোকালয়মুখী হতে বাধ্য হয়। লেখকের 'সুন্দরবনের সততা' নামক গল্পে মধু সংগ্রহকারী মনসুরকে বাঘে নিলে, ব্যাঘ্র প্রকল্প নিয়ম অনুসারে তার সঙ্গীরা বনকর অফিসে মৃতের নাম নথিভুক্ত করে। অবশ্য- "...এমন ঘটনায় ব্যাঘ্র-প্রকল্পে জানানও আইন মোতাবেক বাধ্যবাধকতা আছে।"[১৭] যেহেতু মনসুর বাঘের কবলে মারা গিয়েছিল সেহেতু তার পরিবার পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছিল সরকারি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ। 'সুন্দরবনের ছাটা-বাড়ি লাঠি' গল্পে লেখক জানিয়েছন, ব্যাঘ্র প্রকল্প প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব থেকেই বিনা অনুমতিতে বাঘ মারা নিষেধ ছিল। মধু সংগ্রহকারী দল একটি বাঘকে পিটিয়ে হত্যা করে তার শরীরের বিভিন্ন অংশ সংগ্রহ করতে থাকে কারণ সেগুলি মোটা দামে বিক্রি হবে। সেইসঙ্গে আরও কিছু অংশ গ্রামীণ মানুষের দৈবিক কাজে ব্যবহৃত হবে।[১৮]

শিবশঙ্কর মিত্রের উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় কিংবদন্তি চরিত্র বেদে-এর জীবনসংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে 'বেদে বাউলে' উপন্যাসে। কাহিনিকার জানিয়েছেন এই কাহিনির পটভূমি যে সময়ে তখনও সুন্দরবন বাঘ প্রকল্পের আওতায় আসেনি। কাহিনি অবলম্বনে জানা যায়, বনকর অফিস থেকে যে পেট্রোলবোট নিয়ে অফিসারদের বন পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা খুব যে আইনরক্ষক ছিল তা বলা যায় না। স্থানীয় অধিবাসীরা গোপনে নির্দিধায় শিকার কার্য চালাত-

> "তখনও 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' হয়নি। লোকে বনে আসে, দু-একটা হরিণ মারে। সুন্দরবনে বাঘ মারতে আসা বলা বাতুলতা। বনকর অফিসের পেট্রোলবোট বা পিটেলবোট বন পাহারা দেয় বটে, কিন্তু চোরা শিকারীকে ধরে সদরে চালান দেওয়া তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ধরতে পারলে বা ধরার মতো অবস্থা বাগাতে পারলে, কিছু পয়সা, না হয় কিছু মানুষের ভাগ নেওয়া আর কিছু নকল শাসানি ও ধমকানির পালা। কাজ দেখানোর জন্য মাঝে-মধ্যে দু-একজনকে সদরে চালান দিতে হয়।"[১৯]

চার

বুদ্ধদেব গুহের 'বনবিবির বনে' উপন্যাসের স্থানীয় শ্রমজীবী শাজাহান বলে-

> "আবার শুনছি নাকি মামা-সকলের বংশবিরিদ্ধির নিমিত্তই সোঁদরবনে বাগ-প্রকল্প কইরবেন উনারা। মজা মন্দ লয়। মামায় খেইয়ে খেইয়ে আমাদের বংশ-লাশ হবার উপক্রম, আর কর্তারা সব লাকি মামাদিগের বংশবিরিদ্ধির কাজে নেইগেচেন।"[২০]

এই প্রসঙ্গে কাহিনির প্রধান চরিত্র ঋজুদা জানায় 'চোরা শিকারি'দের কারণে বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য যেমন হরিণ প্রভৃতি প্রাণীর সংখ্যা অত্যাধিক হ্রাস পাওয়ায় বাঘ আরও বেশি করে মানুষ হত্যায় রত হয়েছিল।[২১] এর পরিপ্রেক্ষিতে শাজাহান জানায় সুন্দরবনের বাঘ ভারতবর্ষের অন্যান্য অরণ্যের বাঘের তুলনায় স্বভাবে ভিন্ন। সুন্দরবনের বাঘ বরাবরই মানুষখেকো, এর সঙ্গে হরিণ নিশ্চিহ্ন হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। সে বলে-

> "কবে মামায় মানুষ খেইত্যো না শুনি। আমি তো জন্ম থিকেই শুনে আসিতেচি, দেইখ্যে আসিতিচি যে, মামায় মানুষ নিতেচে পতিবছর। তোমারা শেষে সোঁদরবনের বাঘের মাস্টার হইয়েছ, আমরা গরিব-গুরবো মুক্কু-সুক্কু মানুষ হয়ে কী আর বলি? বলার লাই কিছু।"[২২]

অর্থাৎ বাঘ সংরক্ষণে খুশি নয় সুন্দরবনের শ্রমজীবী শাজাহানরা। যে মানুষখেকো বাঘের হাতে তাদেরই পূর্বপুরুষদের প্রাণ গিয়েছে, সেই বাঘ সংরক্ষণ ও বংশ বৃদ্ধিতে স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত প্রকাশ করেছে তারা।

পাঁচ

বাঘ মাংসাশী প্রাণী। তার প্রধান খাদ্য হল হরিণ, বুনো শূকর, সাম্বর, চিতল প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণী। এই তৃণভোজী প্রাণীগুলি বেঁচে থাকার জন্য সম্পূর্ণভাবে অরণ্যের গাছপালা, ঘাস ও প্রাকৃতিক উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। অরণ্যের গাছ কেটে দেওয়া হলে বা বনভূমি ধ্বংস হলে প্রথম আঘাতটি পড়ে এই তৃণভোজী প্রাণীদের জীবন-আবাসস্থানের ওপর। খাদ্যের অভাবে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে, রোগাক্রান্ত হয়, অনেক ক্ষেত্রে মারা যায় বা বন ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। আর এইভাবে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা কমে গেলে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে বাঘের ওপর। কারণ খাদ্যের অভাবে বাঘের স্বাভাবিক জীবনচক্র ব্যাহত হয়। পর্যাপ্ত শিকার না পেলে বাঘ দীর্ঘদিন অনাহারে থাকে, দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বেঁচে থাকার জন্য বিকল্প পথ খুঁজতে বাধ্য হয়। আর তখনই বাঘ লোকালয়মুখী হতে শুরু করে। লোকালয়ে প্রবেশের ফলে বাঘের সঙ্গে মানুষের সংঘাত বাড়ে। আর এই সংঘাত নাগরিক মানুষের সঙ্গে নয়, কেবল বনাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ এই ভয়ঙ্কর ত্রাসের শিকার হয়। অনেক সময় গবাদি পশু বাঘের সহজ শিকারে পরিণত হয়, আবার চরম অবস্থায় বাঘ মানুষের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। এইভাবে খাদ্যসংকট ও বাসস্থান ধ্বংসের ফলেই কিছু বাঘ ধীরে ধীরে নরখাদক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এটি বাঘের স্বভাবগত অপরাধ নয়; বরং মানুষের হাতে সৃষ্ট পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার ফল। অতএব, বাঘ সংরক্ষণ কেবল বাঘকে রক্ষা করার বিষয় নয়। এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত রয়েছে অরণ্য সংরক্ষণ, তৃণভোজী প্রাণীর সুরক্ষা এবং সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখা। গাছ কাটা ও বন ধ্বংসের ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে বাঘ–মানুষ সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে। অথচ রাষ্ট্র একদিকে বাঘ সংরক্ষণের ওপর জোর দেয় আর অন্যদিকে বড় বড় ইজারাদারদের গাছ কাটার পারমিট দেয়।

কলকাতার বিখ্যাত শিকারি রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় বাঘ বিপন্নতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন-

> "বাঘ অবলুপ্তির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। সেই মোগল আমল থেকে শুরু হয়েছে বাঘ মারা। যে নিধন এখনও চলছে চোরাপথে। আমার বাঘ মারবার ইতিহাস ১৯৭০ সালের আগে। তখনও ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট হয়নি। আমরা বাঘ মেরেছি, লেপার্ড মেরেছি পারমিট নিয়ে এবং সরকারকে উপযুক্ত রয়্যালটি দিয়ে। আজ সারা বিশ্ব জুড়ে বাঘ বাঁচাও প্রকল্প চলছে। যদি সাফল্য আসে, কিছু বাঘ আর লেপার্ড হয়তো বাঁচবে। সেই সুদিনের প্রার্থনা করছি।"[২৩]

পরিবেশ রক্ষায় 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' অবশ্যই একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। অরণ্য অধিবাসীদের একাংশ বাঘ প্রকল্পের সমর্থন করলেও, বৃহৎ অংশ এই প্রকল্পকে তাদের জীবিকা ও নিরাপত্তার পরিপন্থী বলে মনে করেছে। বাঘ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ যতটা সক্রিয়, অরণ্যনির্ভর শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষায় সেই উদ্যোগ ততটাই অপর্যাপ্ত। মানুষখেকো বাঘের আক্রমণে প্রাণহানি, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের অনিশ্চয়তা এবং বন ব্যবহারে ক্রমবর্ধমান বিধিনিষেধ— সব মিলিয়ে এই প্রকল্প অনেক ক্ষেত্রে বনাঞ্চলের মানুষের কাছে ভয়ের ও বঞ্চনার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ফলে বাঘ সংরক্ষণ আর মানবসুরক্ষা— এই দুইয়ের মধ্যে যে ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন, তা বাস্তবে কার্যকর হয়নি। বাঘ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির প্রশ্নে রাষ্ট্রের সক্রিয়তা যতটা দৃশ্যমান, বনাঞ্চলের মানুষের জীবনরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সেই সক্রিয়তা ততটাই অনুপস্থিত— এই অসাম্য সাহিত্যিক উপস্থাপনায় গভীরভাবে উন্মোচিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অরণ্য ও শিকারকেন্দ্রিক আখ্যানগুলো এই দ্বন্দ্বকে নিছক নীতিগত বিতর্ক হিসেবে নয়, বরং অরণ্য অধিবাসী ও শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন ভয়, ক্ষতি ও অসহায়তার কথা প্রকাশ করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. National Tiger Conservation Authority. 'FAQs.' NTCA, Government of India, https://ntca.gov.in/faqs/. Accessed 14 Jan. 2026.

২. Singh, Chitra. Project Tiger: A Conservation Program for Saving the Indian Tiger. 'International Journal of Research in All Subjects in Multi Languages (IJRSML)'. vol. 5, no. 12, Dec. 2017.

৩. Groom, Martha J., Gary K. Meffe, and C. Ronald Carroll. Principles of Conservation Biology. 3rd ed., Sinauer Associates, 2005.

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। অবিশ্বাস্য অভিযান। ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩: দে'জ পাবলিশিং। সুধাংশুশেখর দে (প্রকাশক)। পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০১৭। পৃ. ১১।

৫. তদেব, পৃ. ৫১।

৬. তদেব, পৃ. ২৪।

৭. তদেব, পৃ. ৭৪।

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। সুন্দরবনের আতঙ্ক। ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩: দে'জ পাবলিশিং। সুধাংশুশেখর দে (প্রকাশক)। পুনর্মুদ্রণ, জুন, ২০১৭। পৃ. ১০।

৯. তদেব, পৃ. ১৪।

১০. তদেব, পৃ. ১৪।

১১. তদেব, পৃ. ১৫।

১২. তদেব, পৃ. ৫৪।

১৩. মিত্র, শিবশঙ্কর। সুন্দরবন সমগ্র। ৯৫, শরৎ বোস রোড, কলকাতা, ৭০০০২৬: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দ্বাদশ মুদ্রণ, জুলাই, ২০২২। পৃ. ৪৪২।

১৪. বসাক, অভিজিৎ। দুঃশ্চিন্তায় বন্যপ্রাণপ্রেমীরা! চৈত্র সংক্রান্তিতে আবার শিকার উৎসব। 'Aaj Tak বাংলা', 09 Apr. 2021। https://bangla.aajtak.in/west-bengal/story/hunting-festival-west-bengal-big-worry-administration-and-animal-lovers-272592-2021-04-09. Accessed 17 Jan. 2026.

১৫. মিত্র, শিবশঙ্কর। সুন্দরবন সমগ্র। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৪১।

১৬. তদেব, পৃ. ৪৪৮।

১৭. তদেব, পৃ. ৪৩৫।

১৮. তদেব, পৃ. ৪২৩।

১৯. তদেব, পৃ. ৫২।

২০. গুহ, বুদ্ধদেব। বনবিবির বনে। ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, ৭০০০০৯: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। সুবীরকুমার মিত্র (প্রকাশক)। নমব মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০১৯। পৃ. ৫৬।

২১. তদেব, পৃ. ৫৬।

২২. তদেব, পৃ. ৫৬।

২৩. চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ। আজমলমারির নরখাদক। ৩/১, কলেজ রো, কলকাতা, ৭০০০০৯: পত্রভারতী। ত্রিবিদকুমার চট্টোপাধ্যায় (প্রকাশক)। প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯। পৃ. ভূমিকা।

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ:

১. Government of India, Ministry of Environment & Forests. 'Compendium of Guidelines & Circulars Issued by the Director (Project Tiger)'. Project Tiger Directorate, Nov. 2004.

২. Government of India, Ministry of Environment and Forests. 'India Tiger Estimate 2010'. Mar. 2011.

৩. Jhala, Y.V., Qureshi, Q. and Nayak, A.K. (eds). 'Status of Tigers, Copredators and Prey in India, 2018'. National Tiger Conservation Authority, Government of India, and Wildlife Institute of India, 2020.

৪. ভট্টাচার্য্য, শীলাঞ্জন। গ্রাম বাংলার বন্য জন্তু (স্তন্যপায়ী)। পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ। দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৩।

৫. সেনগুপ্ত, সুধীন। সুন্দরবন: জীব পরিমণ্ডল। আনন্দ পাবলিশার্স। তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৫।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 511-517
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.238

অনিতা অগ্নিহোত্রীর নির্বাচিত ছোটগল্পে নারী: অন্য আলোকে

মঞ্জুশ্রী মুর্মু, *বাংলা বিভাগ, গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.01.2026; Accepted: 28.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Anita Agnihotri was one of the brightest figures in Bengali literature, who established a unique literary paradigm. In her fiction, women walk alongside men, guided by their own consciousness and agency. The roles of daughter, wife, and mother are revealed within the framework of lived reality. Alongside traditional portrayals of women, this paper also presents a multifaceted depiction of women's everyday lives.

Keywords: Womens, Psychology, Fiction, Child Labour, Literature

কথাসাহিত্যিক অনিতা অগ্নিহোত্রীর কথনবিশ্বে বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক সংকট, বিচ্ছিন্নতাবোধ, স্বদেশ, প্রকৃতি যেমন রূপায়িত হয়েছে ঠিক তেমনি উদ্ভাসিত হয়েছে নারী-পুরুষের সম্পর্কের গহীনবিশ্ব। দাম্পত্য প্রেম, নারীর ক্ষমতায়ন, সংগ্রাম চেতনা, সম্পর্কের অবনমন, সত্ত্বার ভাঙাগড়া, শোষণ-যন্ত্রণা, জটিল মনস্তত্ত্ব, তাঁর কলমে অন্য মাত্রা দান করেছে। তাঁর কলমে নারীর বহুমাত্রিক রূপ পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। নারীর চিরাচরিত রূপ অর্থাৎ জননী-কন্যা-জায়া-র প্রত্যেকটি রূপ বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে তাঁর কথনবিশ্বে। আখ্যানের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত নারীকেন্দ্রিক এক অসীম সক্রিয়তার বীজ ব্যাপ্ত। অবদমন থেকে উত্তরণ নারীর এই সুর তাঁর আখ্যানবিশ্বের প্রতিটি পর্বে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কথাকার অনিতা অগ্নিহোত্রীর ছোটগল্প সেই ভাবনারই নামান্তর। তাঁর বিভিন্ন গল্পে বাল্য নারীর নানান স্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সময়ের বাঁকে বাঁকে বয়ে চলা হাজারো সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্খা, নৈরাশ্য জীবন চেতনার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর নারীর কণ্ঠে। রিয়েলিস্টিক ভাবনাগুলিকে ম্যাজিক রিয়েলিজমের প্রকরণে এমনভাবে গেঁথে দিয়েছেন যা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।

'উষ্মকোঠি' গল্পটিতে পুবি নামের এক অসহায় মেয়ের পারিবারিক অভাব অনটনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় মায়ের উপর অভিমান করে এঁটো হাতেই পুবি নদীর দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। অভিমানের কারণ হিসেবে দেখা যায় মা বেঁচে যাওয়া বাসি ভাতটা তাকে না দিয়ে বোন শীতলীকে দিয়েছে, অথচ মা জানে যে বোনের চেয়ে পুবির খিদে অত্যন্ত বেশি। রাগে, অভিমানে, লজ্জায় নদীতে ঝাপ দেয় পুবি। মরতে অবশ্য নয়, কারন ডুবে পুবির মৃত্যু নেই একথা তাঁর জানা ছিল। অভিমানের চোখের জল নদীর জলে মেশানোই তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। কিশোরী পুবি মনে মনে কল্পনা করে-

> "মস্ত পেতলের হাড়িতে ভাত রাঁধবে পুবি, যেমন হাড়ি দাসেদের হেঁসেলে, ঘি দিয়ে ফোড়ন দেবে মটরের ডালে, আর হ্যাঁ..... বড় বড় চিংড়ি, ইলিশ মাছের পেটি ভাজা..... দশটা ছেলেপুলেও যদি থাকে, খাবার কম পড়বে না কারো ভাগে।"[১]

কল্পনাটির মধ্য দিয়ে পুবির মনের এক অদ্ভুত সরলতার দিক ফুটে উঠেছে। যেখানে অন্য মানুষদের চাওয়া পাওয়ার সীমা-পরিসীমা নেই, সেখানে পুবির মতো মেয়ের এক সাধারণ জীবনযাপনের চিন্তা। দাস বাবুদের মহুরি বসন্ত ছেলেটা মুড়ি আর চপ সবাইকে দিল কিন্তু পুবিকে দিল সকলের চেয়ে বেশি। সরলা পুবি প্রথমে বিষয়টাকে সাধারণভাবে নিলেও পরে যখন সে বুঝতে পারল বসন্তের হাতটা তাঁর পিঠের উপর, বসন্তের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পুবির বাকি থাকে না। পুবি বুঝতে পেরেছে তাঁর খিদের সঙ্গে বসন্তের থাবাটার একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কিছু পরিমাণ খাবারের জন্য পুবির মতো না জানি কত মেয়েকে প্রতিনিয়ত অপমান, লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়। পুবি জীবিকার তাগিদে স্কুল বন্ধ করে সুতোকাটার মজুরি বৃত্তি করে। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাচটা পর্যন্ত কাজ করে সে হাতে পয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা মজুরি পায়। সপ্তাহের শেষে মজুরির খুবই সামান্য টাকা নিজের কাছে রেখে পুরোটা দিয়ে দেয় মাকে। কাজের জায়গাতেও নানান ব্যঙ্গ বিদ্রুপের শিকার তাকে হতে হয়—

> "ভাতে টান পড়বে কেন- ভাতে টান পড়ার তো কথা না- এখন যদি বুনো বাগদি চামারদের মেয়ে- বউরাও সুতো কাটতে লেগে যায়।"[২]

প্রথম প্রথম সরলা প্রকৃতির পুবি না বুঝলেও পরবর্তী সময়ে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পেরেছে কথাগুলো তাকে কেন্দ্র করেই বলা হয়েছে। পুবির বাবা ভিন্ন রাজ্যে ইট ভাটার শ্রমিক। অনেক শ্রমিক বউবাচ্চাদের সঙ্গে নিলেও পুবির বাবা তাদের নিয়ে যায়নি, সেখানে বড় কষ্ট। সেখানে বাচ্চারা নরম আঙুলে ছাঁচ থেকে ইট বের করে, মেয়েরা ছাঁচ গড়ে, পুরুষরা ভাটিতে ইট পোড়ায়। কাজের একটু এদিক-ওদিক হলে মার খায় লোকগুলো। বউদের নিয়ে খাটাখাটি হয় রাত্রে। সেখানে ছাগল-ভেড়ার মতোন গাদা গাদির জীবন। নিজেদের অনিশ্চয়তা, বাবার প্রাণের অনিশ্চয়তা এই ভাবেই দিন গত হতে থাকে পুবির মতো সাধারণ মেয়েদের। পরদিন ভোররাত্রে অসহ্য খিদের যন্ত্রনায় পুবির ঘুম ভাঙলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জীবিকার তাগিদে পুনরায় যেতে হয় কারখানায়। কিন্তু কারখানা বন্ধ। এদিক ওদিক ঘুরে পুবি এক বৃদ্ধ মুন্ডা চাষির কাছে উপস্থিত হয়ে চাষের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তাঁর উত্তর শোনামাত্র পুবির বুকটা ছমছম করে ওঠে। কারন সেখানে হচ্ছে "উম্মোকোঠি"। এক মরণ যজ্ঞির ব্যবস্থা। ট্রে-র উপর হাজার হাজার শুয়ে থাকা গুটি আর তাদের ভিতরে পৃথিবীর আলো দেখার জন্য ঘুমিয়ে থাকা নধর কালো কুচকুচে ডানা গোটানো মথরা। তারা কোনো দিন ওই রেশম গুটির শক্ত দেয়াল থেকে বেরোবে না। দাসবাবুর মতো লোকেরা ওদের বেরোতে দেবে না। কারন গুটি ফুটো করে মথরা বেড়িয়ে গেলে সেই সুতো আর কাজে লাগবে না। তা দিয়ে সরু রেশম সুতো বোনা যায় না। পুবির এই মথগুলির সাথে নিজেদের জীবনের মিল খুঁজে পেয়েছে। এই মথগুলোর মতোই তারাও একটা করে রাত পেরোনোর স্বপ্ন দেখে আর ওটাকেই ভাবে জীবন। পুবি কোথাও যেন এটা অনুভব করতে পেরেছে দাসবাবুর মতো মানুষরা পুবিদের মতো অসহায় দরিদ্র মানুষদের কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই মথ গুলোতে পরিণত করেছে। শেষে পুবির মনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি ভ্যান রিকশায় ইটের যোগান দেওয়া বসন্তকে তীব্র ঘৃনা বিদ্বেষের পরিবর্তে তার প্রতি মায়া জাগে। কোথায় যেন পুবি বুঝতে পেরেছে ওই মথ গুলোর মতোই বসন্তেরও জীবন। সমাজের শাসক স্তরের মানুষেরা শোষিত শ্রেণির মানুষদের জীবন মথেদের জীবনে পরিণত করেছেন।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ট গল্প 'বলকার ভালো দিন'। গল্পটির মূল বিষয় শহরের রাস্তা ফুটপাতে থাকা এক অসহায় শিশুকন্যা বলকার নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় বলকা মিষ্টির দোকানের লুচি ও বাসি ডাল খেয়ে বেশ খুশি এবং মনের মধ্যে চলছে সারাটা দিনের হিসেব নিকেশ। সকালে সজিওয়ালার দোকানে কাজ পেয়ে বলকার খুশির অন্ত থাকে না। কারণ সেখান থেকে হয়তো কিছু পারিশ্রমিক পাবে যা দিয়ে তাঁর এক বেলার খাবারের যোগান হবে। কিন্তু পরক্ষনেই বলকাকে লোকটির কাছ থেকে শুনতে হয়েছে শাসানি - "বেইমানি করেগা তো পিটাই করে গা।"[৩]

আসলে বলকার মতো অসহায় শিশুদের অবস্থা এইরকমই। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর লোকটি ফিরে এসে টাকার বদলে ফুলকপি দিতে চাইলে বলকা রাজি হয়নি। কিছু দিন যাবৎ বলকার মা নিখোঁজ সুতরাং ফুলকপি নিয়ে বলকার কাজ নেই। অনেক আগে বলকা মাকে মাঝে মধ্যে রাধতে দেখেছে। কড়াই পেতে, ইটের উপর কাঠকুটো দিয়ে কোনদিন চার পাঁচটা আলু কোনোদিন পোকাধরা চাল বলকা মায়ের কাছে বসেছে খেয়েওছে। সকালে ঘুম ভেঙ্গে মাথার কাছে রাস্তার ঠেকুয়া কিংবা শক্ত বিস্কুট পেয়েছে, বলকার মা রেখে দিয়েছে তাঁর জন্য। রাস্তার ইদুর অথবা ভোরের কাক টান না মারলে বলকার পেটে গেছে সেসব খাবার। অবিভাবকহীন বলকাকে বস্তির অন্য সব বাচ্চাগুলো পাগলি পাগলি বলে, বলকাকে অকারণে ধাওয়া করে ঢিল মেরে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ। শুনতে হয়েছে— "বলে, যা তোর বাপকে ডেকে আন।"[৪] কিন্তু বলকা কথাগুলো গায়ে মাখে না। কারণ সে জানেই না তাঁর বাবা কে? বাপকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাঁর নেই বরং উৎসাহের সহিত খাবার জোগাতেই বলকা ব্যস্ত। আসলে বলকার মতো অসহায় শিশুদের খাদ্য থেকে বাসস্থান সবকিছু নিজেকেই যোগাড় করে নিতে হয়। মিষ্টির দোকানের কাজ থেকে চায়ের দোকানের কাজ নিজেকেই করে নিতে হয়। বারো আনার ছাতুর বদলে আটার রুটি অমৃতের মতন দামী বলকার মতো অসহায় বাচ্চাদের কাছে। কালীবুড়োর একমাত্র সঙ্গী এই বলকা। রাগ অভিমান করে ছেলের কাছ থেকে চলে এসেছে বুড়ো। হাত গণনার কাজ করে। মামলা মোকদ্দমা জর্জরিত চাষি মজুরাই হল বুড়োর উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম। খড়ি চক দিয়ে রাস্তার ছক কেটে রাখে বুড়ো তা দেখে বলকা ছক আঁকলে বুড়োর রাগের অন্ত থাকে না। রেগে বলে- "গ্রহ নক্ষন নিয়ে খেলা। মরবি তুই, ট্রাম-বাস চাপা পড়ে মরবি।" মন ভালো থাকলে আবার অন্যরকম এই অসহায় মানুষটি। শিশুসুলভ মননের পরিচয় পাই বলাকার মধ্যে। বাবাকে নিয়ে মিষ্টি কিনতে আসা সেই ছোট্ট খুকুটার লুকোচুরি খেলা, অকারণ কান্না, তার মনে দাগ কেটে যায়। খুকুটি চলে যাবার পর অদ্ভুত এক অনুভূতি কাজ করে তাঁর মধ্যে। যেন কিছু একটা ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গেল ওর ভিতর থেকে। একটি শিশু স্নেহ, ভালবাসার দাবীদার যা বলকা কোনোদিন কোথাও পায়নি, পেয়েছে তাচ্ছিল্য। খুকুর মধ্য দিয়ে কোথায় যেন সেই অনুভূতিরই সাড়া জেগে ছিল বলকার মনে। কিছু দিন পরে কোথা থেকে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে এল তাঁর পাগল মা। অনেক কষ্ট করে হাঁটত, একপাশ হয়ে ঘুমোত। বলকা অদ্ভুত এক গোঙানি শুনতে পেয়েছিল একদিন রাতে। প্রথমটা সে স্বপ্ন ভেবে এড়িয়ে গেলেও সকালে তাঁর হাত ভিজেছিল রক্তে। পথ চলতি রাস্তার ফুটপাতের উপর নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারের শিকার তাঁর পাগলি মা। বলকার বুঝতে বাকি ছিল না সেদিন রাত্রের গোঙানির মূল কারণটা। মা নিজে যায়নি, কেউ টেনে নিয়ে গিয়েছিল। গাড়ি বারান্দার ফলওয়ালা তাদের কম্বল দিলে মা নিতে বারণ করে— "ফেরত দে। লোকটা বজ্জাত। ছিড়ে খাবে তোকে।"[৫] বলকা ভয়ে নেয়নি কম্বলটা কিন্তু তবুও তাঁর মা রক্ষা পায়নি। "মাকে কে কোথায় টেনে নিয়ে গেছে, কে জানে! ছিড়ে খুঁড়ে রান্না করে খাবে কুকুরা মিলে।"[৬] মানুষরূপী পশুরা সমাজের আনাচে, কানাচে অবস্থান করছে। যার শিকার হতে হয়েছে বলকার মায়ের মতো ভারসাম্যহীন নারীদের। যার অনেকটাই প্রভাবিত করেছে বলকার মতো অসহায় শিশুদের জীবন। তবুও বলকার মতো অজস্র শিশুদের

বাঁচতে হয়। দিন বদলাবে না জেনেও বলকারা মনটাকে ভালো করে নেয়। তাঁরা আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখে বেঁচে থাকার।

'ভাগ্যিমানির ছবি' গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ভাগ্যি একটি ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে। ভাগ্যি তাঁর দিদার সঙ্গে মাসির বাড়িতে থাকে। গল্পের শুরুতেই মেসো ভাগ্যিমানিকে বলেছে— "কাল তোর মা আসছে রে..."[৭]

মেসোর এই কথা শুনে ভাগ্যির আনন্দের সীমা ছিল না। ভাগ্যির রেজাল্ট বেরিয়েছে, রিপোর্ট কার্ড এসেছে, নতুন ক্লাসে উত্তীর্ণ হয়েছে। ড্রইংয়েও ভাগ্যি ফাস্ট হয়েছে। অনাথ ভাগ্যি রেজাল্টের কথা মাসিকে জানালে মাসি তেমন কোন উৎসাহ দেখায় না। আসলে মাসি মেসোর অভাবের সংসারে ভাগ্যি ও দিদা অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মতো। ভাগ্যির মতো অসহায় বাচ্চারা একটু ডাল ও ডিমসেদ্ধতেই সন্তুষ্ট। দিদা ও ভাগ্যির স্থান খাটের নীচে। ভাগ্যির মায়ের ছেড়ে চলে যাবার খাটের ওপর ও নীচের ব্যবস্থার একটা সম্পর্ক আছে সেটা বুঝতে ভাগ্যির অসুবিধা হয় না। ভাগ্যির ধারণা— "যাদের বাপ-মা আছে, তারা খাটের ওপরে শোয়। যাদের নেই, তাঁরা তলায়। ভাইয়ের মা-বাবা আছে। দিদা আর ভাগ্যির নেই। ভাগ্যির তো থেকেও নেই।"[৮] আসলে ভাগ্যির মতো অসহায় মেয়েরা বাবা-মা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় ভাগ্যের পরিহাসে পিতৃমাতৃহীন। পারিবারিক অশান্তির জেরে ভাগ্যির বাবা ও মা আলাদা হয়ে যায়। এরপর সাড়ে তিন বছরের ভাগ্যিকে নিয়ে মা চলে আসে কোলকাতায় তাঁর দিদার কাছে। তখনই বাবার সঙ্গে ভাগ্যির চিরদিনের সম্পর্কের বাঁধন ছিন্ন হয়ে যায়। বুদ্ধিমতি মা এক বাবুর বাড়িতে কাজ জুটিয়ে নিলেও তা চিরস্থায়ী করতে পারেননি। বাড়ির ড্রাইভারের সাথে অবৈধ সম্পর্কের জেরে সম্মানহানির ভয়ে দিদা সেই লোকটির সাথেই ভাগ্যির মায়ের পুনরায় বিবাহ দেন। ভাগ্যির জীবনের সূচনা হয় এক নতুন অধ্যায়ের। তারপর ভাগ্যি মাঝে মধ্যেই মায়ের কথা মনে করে। কত সুন্দর তাঁর মা, টাইট করে বেনী বাঁধে, ফুলফুল শাড়ি পড়ে, পায়ে সবসময় চপ্পল থাকে। সেই অর্থে মায়ের সান্নিধ্য ভাগ্যির কপালে জোটে না। মায়ের গায়ের একটা গন্ধ আছে যে গন্ধটা আবছাভাবে ভাগ্যির মনে পড়ে। মাসিকে বলছে গোলাপী ফ্রক বের করে দিতে, রিপোর্ট কার্ড, ড্রয়িং খাতা সব গুছিয়ে রেখেছে। সে মনে মনে স্থির করছে মায়ের কাছে গিয়ে সে আর খাটের নীচে শোবে না। মায়ের খবরে মাসি খুশি হলেও দিদা ভাগ্যিকে কাছে না পাওয়ার কষ্টে থমথমে। অন্য দিনের তুলনায় মাসির মনও আজকে নরম হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্যির আশা পূর্নতা পায় না। ভাগ্যির মায়ের পেটে তখন দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান, তাঁর মায়ের আসার কারণ ভাগ্যিকে এক নজরে দেখে তাকে আদর করা ব্যস এইটুকু। মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর গৃহে ভাগ্যির কোনো স্থান নেই। আসলে ভাগ্যির মতো অসহায় মেয়েদের কোন জায়গাতেই নিশ্চিন্ত কোন স্থান নেই। না মায়ের কাছে, না বাবার কাছে, না অন্য কোনো স্থানে। স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক অশান্তির কারণে প্রাণময় ভাগ্যির শেষ পর্যন্ত প্রাণহীন নিস্তেজ প্রাণে পরিণতি ঘটে। ভাগ্যির শেষ পরিণতি তাঁর মা দিদার মতো অন্যের বাড়ির পরিচারিকা রূপে। ভাগ্যির ভাগ্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে যায় এক অচেনা জগতে।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প' গল্পসংকলন বইটির একটি অনবদ্য গল্প হল 'সম্ভবত মুক্তি বিষয়ক' গল্পটি। গল্পটির পটভূমি অঙ্কন করা হয়েছে শহর কলকাতার এক তরুণ দম্পতি সুমন্ত্র ও বুলবুলির দাম্পত্য জীবনের অবসান নিয়ে। আলোচ্য গল্পের প্রথমেই আমরা দেখতে পাই সুমন্ত্র অসময়ে বাড়ি ফিরছে পরবর্তীতে জানা যায় সেদিন ছিল তাঁর আর বুলবুলির ডিভোর্সের দিন। কোর্টে ভাই সুভদ্র এসেছিল তাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু তাতে সে রাজি হয়নি, কাল পরশু যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভাইকে বিদায় দিয়ে দেন। তাঁর আর বুলবুলির স্মৃতি জড়ানো বাড়িটাতে সুমন্ত্র একাকীত্ব বোধ করে। আসলে তারা দুজনেই চেয়েছিলেন "ডিভোর্স" নামক মুক্ত জীবনের স্বাদ আস্বাদন করতে। হিসেব মতো সুমন্ত্রের আজকের

দিনে খুশি হওয়ার কথা। গত দেড় বছরে সকলেই তাদের বিবাহিত জীবনের সম্পর্কে অবগত সকলেই চরম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছিল, কিন্তু যখন সে সময় উপস্থিত তখন সুমন্ত্র কেন উচ্চস্বরে বলতে পারছেন না-

"হ্যাঁ এখন আমরা আর একসঙ্গে নেই,
অথবা, ইয়েস, উই আর নট ম্যারেজ এনিমোর.....
অথবা, আমরা আর বিবাহিত নই....."[৯]

এই বিষয় গুলিতে তাকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সুমন্ত্রের অনুভূতির জায়গাটা কেমন যেন আলাদা হয়ে গেছে। মনের ভিতর একটা অদ্ভুত মানসিক কষ্ট, নিঃসঙ্গতা, যন্ত্রণা অনুভব করে। সুমন্ত্র নিজের পাশাপাশি বুলবুলির প্রতিক্রিয়ার কথাও চিন্তা করেছে। হয়তো সে বলছে-

"বাব্বাঃ, কেস যেন আর শেষ হয় না.....।
অথবা, মাসিমণি, শোনো, আয়্যাম ফ্রি। কী দারুন না.....।
অথবা, কিছুই না বলে চুপ করে থাকবে। পারবে না বুলবুলি?"[১০]

আসলে সুমন্ত্র বুলবুলির মনের অবস্থা জানতে ইচ্ছুক। সে জানতে চায় বুলবুলি ডিভোর্স পেয়ে খুশি, নাকি সেও সুমন্ত্রের মতো বেদনা অনুভব করেছে। এরপর কোনো এক শ্রাবণ মধ্যাহ্নের স্মৃতি। তাঁর মনে আসে সুমন্ত্র ও বুলবুলি পাশাপাশি দাড়িয়ে। পরবর্তীতে দেখা যায় বৃষ্টি নামছে কিন্তু পাশে বুলবুলি নেই। সেই দাড়িয়ে থাকার মধ্যে রয়েছে সুমন্ত্রের আজকের দিনের নিঃসঙ্গতা একাকীত্ব। বুলবুলি তানপুরার মধ্যে সুমন্ত্র তাঁর অস্তিত্ব খুঁজে পায় এবং পরম যত্নের সহিত সেটাকে ডিভানের উপর শুইয়ে রাখে। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল সুমন্ত্র ও বুলবুলি। প্রেমের সম্পর্কের পরিণতি দিতে বুলবুলি বাবা ও মায়ের অমতে সুমন্ত্রের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে গিয়ে রেজিস্ট্রি করেছিল। তারপর কিছুদিন তাদের উন্মত্তের মতো ভালোবাসার সাক্ষ্য বহন করেছে তাদের বাড়ির প্রতিটি কোণ। হঠাৎ করেই একদিন কোথায় যেন সবকিছু উবে গেল।

সুমন্ত্র নিজের কাজে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে বুলবুলিকে উপেক্ষা করা থেকে শুরু করে জন্মদিন ভুলে যেতে শুরু করল। অন্যদিকে দীর্ঘদিনের উপেক্ষার ফলে বুলবুলিরও তৈরি হতে লাগলো এক অন্য জগৎ তাঁর স্কুল, গানের ক্লাস, অতীতের বন্ধু উপমন্যু। দুজনেই এক আলাদা আলাদা পৃথিবীতে বাস করতে লাগল। একে অপরের কাছে বড় সংকীর্ণ, স্বার্থপর ও সাধারণ মানুষ হয়ে গেল। এক জ্যোৎস্নার রাতে হঠাৎই তারা পরস্পরকে আবিষ্কার করল স্পর্শ সম্পর্কহীন, বিচ্ছিন্ন অসহায় তাইতো তারা বিবাহ বিচ্ছেদের মতো চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও পিছুপা হয়নি। একটি ডিভোর্স যখন সংঘটিত হয় তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক পক্ষকে ভিক্টিম ও এক পক্ষককে ভিলেন হিসেবে দাবি করা হয়। আপাত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এই গল্পে সেই অর্থে দুজনকেই ভিক্টিমের জায়গায় অবস্থান করেছে। সুমন্ত্র তাদের দাম্পত্য জীবন ভবিষ্যৎ সুরক্ষার তাগিদে নিজেকে এতটাই ব্যস্ত করে রাখলেন যে বুলবুলির জন্য তাঁর বিন্দুমাত্র সময় হয়নি এমনকি গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলিতেই তাকে উপেক্ষা করেছে। পরবর্তিকালে বুলবুলি যখন নিজের জগৎ তৈরি করেছে তখন সুমন্ত্রের কোথাও যেন বিষয়টা অসহ্য ঠেকেছে। দুটি মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে দূরত্বের পাহাড়- "তারা যেন দুটি আগুন-লাগা গাছ। একই মৃত্তিকায় দাড়িয়ে পাশাপাশি জ্বলছে।"[১১] সুমন্ত্র ও বুলবুলি একে অপরের থেকে মুক্তি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু বাস্তবিক কি মুক্তি পেয়েছে? সে বিষয়ে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। সামান্য কিছু ভুল বোঝাবুঝি একটি সুন্দর দাম্পত্যের সম্পর্ককে নষ্ট করে দিয়েছে আলোচ্য গল্পটিতে।

দাম্পত্য সম্পর্কের আর এক বৈচিত্র্যময় উপস্থাপন দেখতে পাই 'পিঞ্জর' গল্পটিতে। "পিঞ্জর" অর্থাৎ খাঁচা যেখানে কাউকে বন্দি অবস্থায় রাখা হয়। গল্পের শুরুতে আমরা দেখি আটাত্তর বছরের বৃদ্ধ কেশব তাঁর

পুরনো গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছেন বাড়িটি বিক্রয় করতে। টাকা-পয়সা দেওয়া নেওয়া আগেই হয়ে গেছে, কেবলমাত্র তাঁর কিছু পুরনো জিনিসপত্র ফিরিয়ে নেওয়া এবং ক্রেতাকে চাবিটি হস্তান্তরিত করাই মূল উদ্দেশ্য। বাসে জানালার পাশে বসে কেশবের মনে ভেসে ওঠে তাঁর পুরনো দিনের স্মৃতি। তাঁর প্রথমা স্ত্রী কিশোরী, পনেরো বছরের কিশোরীর কথা। কিশোরী একাধানে যেমন ছিলেন অপরূপা সুন্দরী তেমনই তাঁর মধ্যে ছিল এক আশ্চর্য আকর্ষণ ক্ষমতা। কেশব লম্বা স্বাস্থ্যবান হলেও বসন্তের দাগ ধরা খাঁদা বোচা মুখ কিশোরীর কাছে ফিকে পড়ে যেত বলে কেশবের ধারণা। যেখান থেকে কেশবের মনে জন্ম নেয় নিজের প্রতি হীনমন্যতা এবং কিশোরীর প্রতি সন্দেহ। কিশোরীর সামান্যতম সাজগোজকে কেশব ঈর্ষা করত সন্দেহের চোখে দেখত। বাইরের সবজি বিক্রেতা, প্রতিবেশী, পাড়ার ছেলে ছোকরাদের থেকে শুরু করে নিজের ঘরের ভাইয়েদের আলাপচারিতাকেও কেশব ঈর্ষা করতো। শিশুদের মতো মাঝে মাঝেই রাগে, অভিমানে খাবার না খেয়ে শুয়ে পড়তো। কতবার কিশোরীর প্রতি আঘাত হানার চেষ্টা করেছে কিন্তু ভালোবাসার টানে আবার নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে কেশব। আবার কিশোরী যখন সাধ্য-সাধন করে ভুলিয়ে ভালিয়ে আদর করে খেতে দিয়েছে, বোকা কেশব তখন সমস্ত কিছুই ভুলে গেছে। পরের দিন সমস্ত অভিমান ভুলে হাট থেকে কিশোরীর জন্য এনেছে নতুন শাড়ি, গয়না। কিন্তু সেই শাড়ি গয়না কিশোরীর গায়ে উঠতেই ঈর্ষায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তাঁর বুকের ভেতরটা। এক অদ্ভুত মানসিক বিকার কাজ করে কেশবের মনের মধ্যে। কোথায় যেন তাঁর মনে জাগছে কিশোরী কেবলমাত্র তাঁর জন্য জেগে উঠুক। সজ্জিত কিশোরীকে সে অন্যের দৃষ্টির গোচর হওয়াটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। ঠিক এই জায়গাটা থেকেই কেশবের হৃদয়ে জন্ম নিয়েছে ঈর্ষা জনিত যন্ত্রণা। কোথায় যেন কেশব নিজের সম্পদ রূপেই জ্ঞাত করেছে কিশোরীকে। একটি দাম্পত্য সম্পর্ক তখনই সুন্দর হয় যখন সেখানে স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যেই থাকে অটুট বিশ্বাস, পারস্পরিক বিশ্বাসই দাম্পত্য সম্পর্কের ভীত মজবুত করতে সাহায্য করে। কিন্তু যদি সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহের বীজ প্রবেশ করে তাহলে সেই সম্পর্কগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে হতে একটা সময়ে গিয়ে বিশ্বাসেরও বিলুপ্তি ঘটে যায়। তৎকালীন সময়ে গাঁ ঘরের বউদের বাইরে বেড়ানোর চল প্রায় ছিল না বললেই চলে। কিন্তু কিশোরীর বেড়ানোর শখ ছিল ভারী। কেশব সমাজকে উপেক্ষা করে স্ত্রীকে খুশি করতে স্ত্রীর ভালোবাসা উপভোগ করতে শহরে নিয়ে যায় সিনেমা দেখাতে। সিনেমা শেষ করে ট্রেনে ফেরার সময় কিশোরীকে বাদাম খাওয়ানোর কারণ স্বরূপ কেশবের হাতের ঘুষিতে রক্তারক্তি হয়েছিল এক অচেনা যুবকের করুণ মুখ। কেশবের সেই প্রহারের হাত থেকে কিশোরীও রক্ষা পায়নি। সন্দেহের বশে বাড়িতে এসে তাকেও প্রচুর মারধোর করেছিল কেশব। রাগে, লজ্জায়, অভিমানে। অবশেষে কিশোরী চরমতম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিজের আত্মহননের মধ্যে দিয়ে। অন্যদিকে ভিতু কেশব তাঁর দেহটাকে রান্নাঘরের নিচে পুঁতে রেখে কিশোরীর কুলত্যাগের অপবাদ রটিয়ে দিয়েছিল সারা গ্রামে।

> "আমাদের বংশে কেউ থানা পুলিশ করেনি। এত্তেলা দিয়েছি। বউকে পাচ্ছি না, ওকে খুঁজে দিন। থানায় আধমণ চিনি দিয়েছি, ঝাল, মরিচ, আখের গুড়া..... সেকি খোঁজার জন্য, নাকি না খোঁজার জন্য কেশব? কে জানে, কেন?"[১২]

কিশোরীর এই পদক্ষেপ কোথায় যেন কেশবের মনে ভয় এবং আত্মসম্মান বোধ কাজ করেছে। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় মায়ের অনুরোধে কেশব পুনরায় বিবাহ করেছে অন্নপূর্ণাকে। প্রথম পক্ষের স্ত্রী কিশোরীর সঙ্গে তাঁর কোনো সন্তান না থাকলেও পরবর্তীতে সে দুই ছেলে মেয়ের পিতা হয়েছে। দ্বিতীয় স্ত্রী-এর ক্ষেত্রে প্রথম জনের মতো ভালোবাসার তেমন গাঢ়ত্ব কেশব অনুভব করেনি। অন্নপূর্ণাকে বিয়ে করে কেশব নিশ্চিন্ত। পৃথিবীর লোভী চোখ থেকে তাকে বাঁচানোর দায় নেই কেশবের- "কিশোরী তারই রইল, অন্নপূর্ণা তাঁর হইল

না।"[১৩] এরপর বহু বছর কেটে গেছে কেশব এসেছে তাঁর পুরনো বাড়িতে। এর আগে বহুবার বাড়ির নতুন মালিক চিন্তামন বাড়ি হস্তান্তরের তাগিদ জানালেও কেশব কোনো কারণ দেখিয়ে বিষয়টা এড়িয়ে গেছে। আসলে সেই বাড়িতেই ছিল কেশবের প্রাণের প্রিয় কিশোরীর প্রাণহীন শরীর। কুড়ি বছর পর সেই নরকঙ্কালকে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন কেশব। বাস কনট্রাক্টরের সঙ্গে তর্ক বিতর্কে হেরে গিয়ে সেই বাক্স নিয়ে নেমে শিশির গাছের ছায়ায় বসে হাহাকার করতে থাকে- "খুব চেয়েছিলাম রে, বউ, তোকে, নিজেই জানিনি কত, রং, রক্ত, মাংস, রূপ সব ছিড়ে খুঁড়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল চাইতে চাইতে।"[১৪] লেখিকা 'পিঞ্জর' গল্পের মধ্য দিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের, প্রেম, সন্দেহ, মানসিক বিকারের ফলে চরম পরিণতি মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি উদঘাটন করেছেন।

কথাকার পরিবর্তমান সময়ের পারিবারিক জীবনে নারী-পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক সংকটগুলি ধরতে পেরেছিলেন অবলীলাক্রমে যার ছায়া পড়েছে তাঁর আখ্যানে। নারিকেন্দ্রিক যাপনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুগুলি নির্মাণ করেছেন দার্শনিক চেতনায়। নারীর প্রতিটিরূপ বাস্তবতার মোড়কে নির্মিত হয়েছে। মোহিনীরূপের পাশাপাশি প্রতিবাদী নারীমূর্তির অবয়ব গড়ে তুলেছেন। তাই তাঁর প্রতিটি আখ্যান হয়ে উঠেছে সময়ের জীবন্ত দলিল।

তথ্যসূত্র:

১। অগ্নিহোত্রী, অনিতা। সেরা পঞ্চাশটি গল্প। দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ২৮।
২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।
৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।
৪। পূর্বোক্ত পৃ. ১৩৩।
৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২।
৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।
৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭।
৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।
৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।
১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯।
১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২।
১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।
১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০।
১৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। অগ্নিহোত্রী, অনিতা। এই আধারে কে জাগে। কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২০।
২। অগ্নিহোত্রী, অনিতা। দেশের ভিতর দেশ। অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ২০১৩।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No.518-524
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.239

সেলিনা হোসেনের ‘চার যুবকের বিলাপ’ গল্পে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অবক্ষয়িত সমাজের অপরাধপ্রবণতা ও মাতৃত্ববোধের উত্তরণ

মোবারক হোসেন, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 28.01.2026; Accepted: 29.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Selina Hossain is a famous Bangladeshi writer. She was born in 1947 in Rajshahi. Her book ‘Ekaler Pantaburi’ (2002) contains many short stories. One important story is ‘The Lament of Four Young Men.’

The story takes place thirty years after the Liberation War of Bangladesh (1971). It is about four friends who often meet and talk about politics. Bashar is one of them. He is honest and loves his country. Bashar thinks people should not live with the Razakars after the war. The other friends know Bashar is right, but they feel sad and hopeless, so they do not agree with him. When Bashar is with them, they do not feel lonely. But when he goes to Dhaka to study, the others become unemployed and lonely. Slowly, the bad influence of a decaying society turns them into criminals. Their discussions turn on a girl named Mandira, and they talk about her physical beauty. Later, Bashar dies in Dhaka. Mandira goes to console Bashar’s mother, which makes the four young men jealous and more frustrated. When Mandira’s brother Dilip scolds them for following her, they threaten him. At last, the four young men kidnap Mandira. While taking her away, they hear her mother crying. When they try to harm Mandira near the river, she faints. Hearing her mother’s cries, they remember their own mothers and feel guilty. Finally, they return Mandira to her mother and punish themselves for their wrong doing.

Keywords: Four young men, Liberation war of Bangladesh, Decaying society, Jealous, Frustrated, Kidnap, Mother crying

একুশ শতকের অন্যতম খ্যাতনামা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের জন্ম ১৯৪৭ সালে রাজশাহী শহরে। ষাটের দশক থেকেই সেলিনা হোসেনের সাহিত্যের যাত্রাপথ আরম্ভ হয়। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম ‘উৎস থেকে নিরন্তর’ (১৯৬৯)। তিনি জীবন সচেতন শিল্পী, তাঁর সাহিত্য সৃজনশীলতায় মানুষ ও মানুষের জীবনের পাশাপাশি নারী জীবনের মাতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি মূলত বাস্তব সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে লিখতে ভালোবাসেন। তাই তো তাঁর রচনায় দেশবিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ, সামাজিক সংকট ও অবক্ষয়িত সমাজের বহুমাত্রিক চিত্রায়ণ পরিলক্ষিত হয়। সেলিনা হোসেন এযাবৎকাল প্রায় ১৩ টি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্তমানে তাঁর কলম এখনও চলমান। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য অন্যতম গল্পগ্রন্থ ‘একালের পান্তাবুড়ি’ (২০০২)। ‘একালের পান্তাবুড়ি’ গল্পগ্রন্থের মূল বিষয় মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অবক্ষয়িত সমাজের চিত্রায়ণ । ‘একালের পান্তাবুড়ি’

গল্পগ্রন্থের একটি অন্যতম গল্প 'চার যুবকের বিলাপ'। আমাদের আলোচ্য 'চার যুবকের বিলাপ' গল্পে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অবক্ষয়িত সমাজের অপরাধপ্রবণতা ও মাতৃত্ববোধের উত্তরণ পরিলক্ষিত হয়।

সেলিনা হোসেনের 'চার যুবকের বিলাপ' গল্পে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের অর্থাৎ স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। গল্পের রচনাকাল ২০০১ সাল। গল্পের সূচনায় গল্পের কথকসহ চার বন্ধুর আড্ডার কথা উল্লেখিত হয়েছে। চার বন্ধুর আড্ডার আলোচনা মন্দিরা নামে একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে। মন্দিরাকে নিয়ে আলোচনার আগে তাদের আড্ডার বিষয়ে রাজনীতি নিয়ে বেশি আলোচিত হতো। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ফলে 'বাংলাদেশ' স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরে চার বন্ধুর অন্তর্নিহিত চরিত্রের ইতিবাচক, নেতিবাচক দিকগুলি আলোচ্য গল্পের মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে তাদের নেতিবাচক বিষয়গুলি বা অবক্ষয়িত সমাজের অপরাধ প্রবণতার দিকগুলি গল্পের মূল বিষয় হয়ে উঠবে। পশ্চিম পাকিস্তানের একটা বড় অংশ ছিল রাজাকার বাহিনী। তাদের ভয়াবহ অত্যাচার পূর্ব পাকিস্তানের উপর প্রবল পরিমাণে বেড়েছিল। ১৯৭১ সালের পর তাদের অত্যাচারের অবসান হয়। বর্তমানে চার যুবক বা চার বন্ধুর মূল আলোচনার বিষয় স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর রাজাকারদের আর রাজাকার বলবে কিনা, কোন যুগে রাজাকাররা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল। মহিলাদের ধর্ষণ করেছিল পাকিস্তান রক্ষার নামে। অনেক মানুষদের খুনও করেছিল এখন সবকিছু চার বন্ধুর কাছে অলীক ভাবনায় পরিণত হয়েছে। চারজনের মত ত্রিশ বছর পরে সব কিছু ভুলে এখন ওদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকাই উচিত। চার যুবকের মাঝে আরেকটি যুবক ছিল, তার নাম বাশার। বাশার চরিত্রটি আলোচ্য গল্পেরও একটি অন্যতম চরিত্র। সে দেশপ্রেমিক ও সংগ্রামী ব্যক্তি। চার যুবকের উক্ত আড্ডার আলোচনায় যখন রাজাকারদের মান্যতার কথা উঠে আসত তখন বাশার প্রবল বিরোধিতা করত। কারণ বাশারের বাবা ছিল মুক্তিযুদ্ধের শহীদ। পাকিস্তান আর্মিরা তার বাবাকে বেয়োনেট খুঁচিয়ে মেরেছে। ফলত বাশার সমস্তটা মেনে নিতে পারে না। বাশার যখন তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করত তখন তার কণ্ঠস্বর বদলে যেত। তার কণ্ঠস্বরে চার যুবক চমকে উঠত, ভেতরে কাঁপুনি উঠত সেটা অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু বাশারকে তারা ভয় করত না। বাশার যখন বলত, "তোরা যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিবারের কাউকে শহীদ হতে দেখিস নি তারা বুঝবি না স্বাধীনতা বিরোধীদের জন্য আমাদের ঘৃণা কত প্রবল।"[১] বাশারের কথাশুনে চার যুবকের মাথা নত হয়ে যেত। তাদের মনে হতো 'ও কঠিন সত্য কথা বলছে'। বাশারের চোখ মুখ চেহারা দেখে তারা অনুতপ্ত হতো ক্ষণিকের জন্য। আবার তারা নিজেদের চারিত্রিক স্থানে ফিরে আসত। তাদের আগের ভাবনা ফিরে যেতে দেখে তাদের আড্ডায় আবার বাশার চেঁচিয়ে বলত, "দেশটা যদি স্বাধীন না হতো তাহলে পাকিস্তানীদের জুতা মুছেও ভাত খাওয়ার সুযোগ পেতি না তোরা।"[২] চার যুবক বাশারের প্রতিটি কথায় তারা সমর্থন করত আর বলত যে রূঢ় সত্যি কথায় বলছে কিন্তু তারা মন থেকে মেনে নিতে বা স্বীকার করতে পারত না। তারা বাশারের মধ্যে আলো ফিরে পেলেও অন্ধকারের দিকে ধাবিত হতো। তাদের মধ্যে সৎসঙ্গ যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তারা তাদের আলোচনায় একাকিত্ব দূর করতে পারত। একসময় বাশার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়তে চলে গেল। চার যুবক পড়াশুনো ছেড়ে বখাটে বেকার যুবককে পরিণত হল। একাকিত্বের যন্ত্রণা দূরীকরণে ধূমপান করে আনন্দ না পাওয়াতেও বাংলাদেশের গাবখানা সেতুতে আড্ডা দিতে লাগল।

বাংলাদেশের ঝালকাঠি শহরের গাবখানা সেতুতে আড্ডারত অবস্থায় সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাদাম খাওয়া চলে। বাদামের খোসা তারা নদীতে ফেলে। তারা জানে যে বাদামের খোসা ফেলে কাজটা ভালো করছে না। বাদামের খোসায় যে নদীর পানিতে আবর্জনা জমে জল দূষিত হবে সে চিন্তা থাকলেও তারা সেই কাজ করা থেকে বিরত থাকেনা। অবসাদ তাদেরকে গ্রাস করেছে। অবসাদের ফলে পরিবেশ দূষণের চিত্র গল্পকার সেলিনা হোসেনের লেখায় পরিস্ফুটি হয়েছে-

"তবু আমরা চারজন সেতুর উপরে উঠে দাড়াই। নদী দেখি, নৌকো দেখি, দূরের আকাশ দেখি। আমাদের নিজেদের ভীষণ অবসাদগ্রস্ত মনে হয়। যেন আমরা কত কিছু হারিয়ে ফেলেছি, একটা ভার আমাদের পেয়ে বসে। আমরা বাদাম কিনে চিবুতে থাকি। উপর থেকে বাদামের খোসাগুলো ফেলে দিই নদীতে। আমরা ফেলতে থাকি। এখন আমাদের সঙ্গে বাশার থাকলে বলতো, তোরা হলি গিয়ে জ্ঞান পাপী।"[৩]

চার বন্ধু ঝালকাঠি শহরের ঐতিহ্য বাশারের মুখে শুনে। ঝালকাঠি হল বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল বিভাগের একটি জেলা বা অঞ্চল। এটি একটি বড় নদী-বন্দর। একসময় ঝালকাঠি বন্দরে বড় বড় জাহাজ আসত। একবার রবীন্দ্রনাথের স্টিমার এই বন্দরের থেমেছিল। রবীন্দ্রনাথ একটি স্কুলের নামকরণও করেছিলেন। এসব ঝালকাঠি শহরের ঐতিহ্যের কথা চার যুবক বাশারের কাছে শুনেছিল। বাশার বাঙালির ঐতিহ্য রক্ষাকারী একজন চরিত্র। সে ইতিহাস খুঁজতে ভালবাসে। তাইতো ঝালকাঠির ইতিহাস চার যুবকের সামনে বললে উক্ত ঐতিহ্য তাদের কাছে গুরুত্বহীন মনে হয়। ইতিহাসের ঐতিহ্যে তাদের বিশ্বাস নেই। তারা আধুনিক মানুষ হতে চায়। তাদের আধুনিকতা দেখে বাশারের হাসি পেত কারণ আধুনিক মানুষ সম্পর্কে ধারণা ছিল না। বাশারের মা ছিল স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। বাসারের মামা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াত। বাশার তাদের সমন্বয়ে বেড়ে উঠেছে। বাশারের সমস্ত জ্ঞান-গরিমা ও সুশৃঙ্খলতা দেখে চার যুবকের ঈর্ষা হত। তারা মনে করে ঈর্ষারও কারণ আছে। তারা মনে করে তাদের কাজ না থাকার কারণে এবং একজন শহীদের ছেলে বলে বাশারকে তারা ঈর্ষা করে। তাই তো তারা বাশারের ইতিবাচকতা সমর্থন করলেও তারা মেনে নিতে না পেরে নিজের অবস্থানে ক্ষনিকের মধ্যে ফিরে এসে অবসাদে ভোগে। চার যুবক বেকার, তাদের আর লেখাপড়া হবে না। তারা কিছু করার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠলেও তা করতে পারে না। ছোটখাটো কোনো চাকরি কিংবা ব্যবসা করা তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল কোনোটাই চার বন্ধু ইচ্ছে মতো দাঁড় করাতে পারেনি। চার যুবকের বেকারত্বের চিত্রটি তৎকালীন বাংলাদেশের অবক্ষয়িত সমাজের চিত্রায়ণ। অবক্ষয়িত সমাজ থেকে চার যুবক ধীরে ধীরে অবসাদে এগিয়ে গেছে। বেকারত্বের ফলে তারা একাকিত্বে ভুগে নারী লোলুপতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। আর সেই সময় থেকেই মন্দিরাকে নিয়ে তারা আড্ডায় মেতে ওঠে। বাশার ঢাকা চলে যাওয়ার পর থেকে রাজনীতির আড্ডা ছেড়ে এখন তাদের মন মন্দিরার দেহ সৌন্দর্যের প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আড্ডায় মেতে ওঠা।

বাশারের প্রস্থান ও মন্দিরার প্রবেশ। মন্দিরাকে নিয়ে তাদের দীর্ঘ উপমা চলে দিনের পর দিন। আড্ডায় বসে একজন যদি বলত মন্দিরার হাসি দারুণ, সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন বলত ওর হাসিতে মুক্তো ঝরে। চার যুবকের অবসাদ মনে মন্দিরার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য নিয়ে উপমায় ঝড় বয়ে যেত। যখনই তাদের মনে হত যে তারা কেউই মন্দিরার উপযুক্ত নয় তখনই তাদের মননে প্রতিহিংসা জাগত আর তারা ভেতরে ভেতরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত।

চার যুবক মন্দিরার কলেজে যাওয়ারও পথের ধারে দাঁড়িয়ে গুলতানি করার সময় মন্দিরাকে নিয়ে নানান মন্তব্য চালায়। তারাও জানতে পারত যে হে মন্দিরা বিরক্ত হচ্ছে কিন্তু তার বিরক্তির কাছে তাদের আনন্দ প্রবল মনে হতো। মন্দিরার শরীর নিয়ে তাদের নানান মন্তব্য চলত, "আমরা দেখেছি মন্দিরার শরীর এখন দারুন বসন্ত।"[৪] দিনের পর দিন গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরাকে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাদের বুকে তৃষ্ণা জেগে উঠলে তারা চারজন চায়ের দোকানে সিগারেট টানতে টানতে বলত, "মন্দিরা তুমি আমার হও। আমি জানি এই একটি কথা জলিল, কাদের ও বদরুল মনে মনে বলে। আমরা জানি মন্দিরা আমাদের হবার নয়।"[৫] মন্দিরা চারজনের হবার নয়, তারা নিরুপায়। কারণ মন্দিরা বামুনের মেয়ে। ওরা সাত ভাই বোন। ও সবার ছোট। সবাই মন্দিরাকে আগলে রাখে। গত বছর মন্দিরার বাবা মরে যাওয়াতে চার বন্ধু শ্মশান ঘাটে গিয়েছিল।

মন্দিরার বাবা মরে যাওয়ার কষ্ট অনুভব করতে নয়, তারা গিয়েছিল মন্দিরার অসহায়তার কথা ভেবে। তারপরে তারা অনুভব করেছিল মন্দিরা শান্ত হয়েছে। বান্ধবীদের সঙ্গে আগে অনেক গল্প করতে করতে ফিরত, এখন সেটা ও করে না। মন্দিরার জন্য চার যুবকের নমনীয় ভাব জাগে আর তারা অস্বস্তি বোধ করে। তাদের চারিত্রিক পরিবর্তনে তারা নজর দেয় না। তারা অসদগ্রস্ততার কারণ কোনোদিন পর্যবেক্ষণ করেনি।

মন্দিরার পিছনে পড়ায় মন্দিরার দাদা দিলীপ চার যুবককে আক্রমণ করে। দাদার বক্তব্য মন্দিরাকে জ্বালাতন করলে থানায় ডায়েরি লিখার হুমকি দেয়। চার যুবক দিলীপকেও প্রতি হুমকি দেয়, "আপনি বেশি বাড়াবাড়ি করলে দেশ ছাড়তে বাধ্য করব।"[৬] চার যুবকের কথায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতার কথা উঠে আসে। সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের 'চার যুবকের বিলাপ' গল্পটিতে দেশবিভাগের পরবর্তী থেকে একবিংশ শতাব্দীতে দেশ নিয়ে যে একটা রাজনৈতিক মতানৈক্য চলছিল তারই রূপায়ণ বর্নিত হয়েছে। দেশ ছাড়ার হুমকির প্রত্যুত্তরে দিলীপ বলে,

> "কি, কি বললে? আর একবার উচ্চারণ করলে জিভ টেনে ছিড়ে ফেলবো। তোমরা রাজাকারের গোষ্ঠী তোমরা দেশ ছাড়ো। বাপের ভিটা পাকিস্তান যাও আমরা এই দেশের সঙ্গে বেইমানি করিনি আমরা দেশ ছাড়ব না।"[৭]

চার যুবক ও দিলীপের উক্ত কথাগুলির রেষারেষিতে সেলিনা হোসেনের আলোচ্য গল্পে তৎকালীন সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘুদের একদিকে অধিকার ও অন্যদিকে নিরাপত্তাহীনতার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। দিলীপের কথায় পাকিস্তান বেইমান রাজাকারদের চিত্র পরিস্ফুটি হয়েছে। যারা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙ্গালিদের দেশ ছাড়ার বা নিরাপত্তাহীনতায় উঠে পড়ে লেগেছিল তারই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। দিলিপের কথায় স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ও অধিকারের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মাসখানেক পরে ঢাকার একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাশারের মৃত্যু হওয়ার ফলে বাশারের লাশ বাক্সবন্দী হয়ে ঝালকাঠিতে আসে। বাশারের মৃত্যুতে চার যুবক খুব দুঃখ পায়। বাশারের মৃত্যুতে তার মা স্তব্ধ হয়ে যায়, মাঝেমধ্যে অজ্ঞান হয়ে গেলেও চার যুবক বাশারের মায়ের সামনে যেতে পারেনা। বাশারের মৃত্যুর খবর পেয়ে মন্দিরা আসে বাশারের মাকে সান্ত্বনা জানানোর জন্য। মন্দিরা বাশারের মাকে সান্ত্বনা জানিয়ে বুকে জড়ানোর মধ্যে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র পরিস্ফুট হলেও চার যুবকের মধ্যে সম্প্রীতি চোখে পড়েনি। তাদের নজরে ঈর্ষা কাজ করেছে। তাইতো তারা দুঃখের মাঝেও ক্রোধ দমন করতে পারেনি, "এত লোক বিশেষ করে অনেক মেয়েরা থাকতে মন্দিরাকে ধরতে হবে কেন তা আমরা বুঝতে পারি না।"[৮] তারা উক্ত দৃশ্য না দেখতে পেরে বাইরে আম গাছটার নিচে এসে পরিকল্পনা করে। শহরে বাশারের হত্যার বিচার চেয়ে লাশ নিয়ে মিছিল আরম্ভ হয়। সেই মিছিলে চার যুবকও সামিল হয় কারণ তাদের বাশারের জন্য অকৃত্রিম ভাবনা ছিল। তারা বাশারকে ভীষণ ভালোবাসত। তারা মিছিলে সামিল হলে এবং বাশারকে ভীষণ ভালবাসলেও জনগণের শ্লোগানে তাদের মন সায় দেয় না। তারা মাথা নিচু করে হেঁটে যায়। তাদের মনোগত ভাবনা তারাকে যারা বখাটে বলে গালি দেয় তাদের কাছে তারা চেহারা স্পষ্ট করতে চায় না। মিছিল শেষে ফিরে এসে তারা আর মন্দিরাকে বাশারের মায়ের কাছে দেখতে পায়নি। মন্দিরা তার মাকে নিয়ে ফিরে আসাতে চার বন্ধু স্বস্তি অনুভব করে। মন্দিরার উপস্থিতিতে চার বন্ধুর ক্রোধ বাড়ে কারণ মন্দিরা যে ভালোবাসা বাশারের মায়ের কাছে পেয়েছে সে ভালোবাসা চার বন্ধু কোনোদিন পায়নি ও পাবে না। বাশারের মা চার বন্ধুকে পছন্দ করত না, তার বাড়িও যেতে পারত না চার যুবক। ফলত সবদিক থেকে তাদের মনে ঈর্ষা জন্মেছে আর সব থেকে বেশি মন্দিরার প্রতি ঈর্ষা জন্মেছে। তাইতো মন্দিরাকে নিয়ে তাদের অবসাদ মনে মন্দিরার শরীরের দিকে অপরাধপ্রবণতার ঝোঁক বেড়ে ওঠে। 'চার যুবকের বিলাপ' গল্পের অগ্রসরে বাশারের কবরের সমাধি শেষে রিকশায় চড়ে গাবখানা নদীর কাছে

তাদের আগমন হয়। রিকশাওয়ালাকে ভাড়া না দিয়ে তার প্রতি অত্যাচার করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। তাকে তাড়ানোর মধ্য দিয়ে তারা হা হা করে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে, 'আমরা এভাবেই শহরে বাস করি যেমন খুশি তেমন' যেমন খুশি তেমনের মাঝেই বাশারের সঙ্গে ওঠাবসা ও বন্ধু নিয়ে তাদের চিন্তা চেতনায় প্রশ্ন বিরাজ করে। যে কথাগুলি তাদের অবচেতন মনে জন্মেছিল তার বহিঃপ্রকাশ-

> "আসলে বাশারের সঙ্গে কি আমাদের বন্ধুত্ব ছিল? ও তো আমাদের কেবলই উপদেশ দিতো। এটাকে কি বন্ধুত্ব বলে? আমরা তো জানি বন্ধুত্ব বড় জিনিস। শহরের মাদি-বাচ্চারা ওর হত্যার বিচার চেয়েছে। কে ওর হত্যার বিচার করবে? তেমন মানুষ কি আছে এ দেশে? ওর বাপের হত্যারই তো বিচার হয়নি। অপরাধীরা বীরদর্পে ঘুরে বেড়ায়। তাহলে ফুঃ। আসলে এমন বালখিল্য বিষয় নিয়ে আমাদের না ভাবলেও চলে।"[৯]

চার যুবক কী বলছে এবং কেন বলছে নিজেরাও জানে না। কখনো বলছে বিচারের প্রয়োজন আবার কখনো বলছে কে ওর বিচার করবে। বিচারের জন্য মিছিলেও পা মেলায় আবার বিচারের বিষয়টি তাদের 'বালখিল্য' মনে হয়। তাদের ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে কোনো যুক্তির মিল নেই। অবসাদের প্রত্যেকটি লক্ষণ তাদের মধ্যে বিরাজমান। অবসাদের ফলেই তারা একে অপরের বা পরিশ্রমী ব্যক্তিদের উপর নৃশংসভাবে অত্যাচার করে। তাদের অপরাধপ্রবণতা বাড়তে থাকে। রিকশাওয়ালার টাকায় তারা বাদামওয়ালাকে ডেকে বাদাম কিনে খেতে যায়। কিন্তু বাদামওয়ালার ঝুড়ি থেকে মুঠে মুঠে বাদাম তুলে তাকে ভাগিয়ে দেয়। বাদামওয়ালা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলে তাদের ক্ষণিকের জন্য অনুতাপও হয় কিন্তু তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা নিজেকে পরিবর্তন করতে পারলেও করতে চায়না। তারা অনুতাপকে ক্ষনিকের জন্যই রাখতে চায়। তাদের অনুশোচনা ক্ষণিকের জন্য। তাদেরই উক্তি,

> "ক্ষণিকের জন্যই আমাদের অনুতাপ হয়। কিন্তু সেটা বড়ই ক্ষনিকের আমরা এসব পাত্তা না দেওয়ার জন্য অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করি।"[১০]

গল্পের রচনাকাল ২০০১ সাল। গল্পের প্রেক্ষাপট স্বাধীনতা উত্তরকালে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা। সময়ের পরিসরে চার যুবকের মন থেকে মন্দিরার ভাবনা দূর হয়েছিল। দুমাস পরে বাংলাদেশে নতুন সরকার অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের প্রবণতা শুরু হয়। ফলত দিলীপ বাবুর ওপর চার যুবকের প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে ওঠে। তাদের কাছে সুযোগ এসে দরজায় কড়া নাড়ে। চার যুবক দিলিপের বাড়ি হানা দেয়। তারা আসার আগেই দিলীপ বাবুকে অন্যরা আঘাত হানার ফলে দিলীপের বাকি ভাইয়েরা বাড়িতে ছিল না। সেই সুযোগ বুঝে মন্দিরকে তুলে আনার উন্মত্ততায় মেতে যায়। তারা দিলীপ বাবুকে আঘাত করে এবং মন্দিরাকে তুলে এনে অপরাধপ্রবণতা বাড়িয়ে তোলে। মন্দিরাকে তুলে আনার সময় 'খোলা দরজা পথে শুনতে পাই মন্দিরার মায়ের হাহাকার'। মন্দিরার মায়ের হাহাকার চার যুবকের কর্ণে প্রবেশ করলেও মননে প্রবেশ করে না। মন্দিরা একজন নারী। সে চারজনের কাছ থেকে রেহাই পায় না। তাকে সুগন্ধা নদীর ধারে নিয়ে আসা হয়। তার উপর চারজন ঝাঁপিয়ে পড়ায় সে অজ্ঞান হয়ে যায়। চার যুবক একসময় টের পায় যে মন্দিরা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তখন তারা তাকে ছেড়ে দেয়। আর তাদের চিন্তা-চেতনায় মন্দিরার মায়ের ভাবনা অনুরণিত হয়ে ওঠে। মন্দিরার মায়ের হাহাকারের কান্না তাদের কানে বাজতে থাকে। কান্নার আওয়াজ বাজতে থাকার ফলে তাদের অপরাধপ্রবণতার মাঝে বোধ-বুদ্ধি ফিরে আসে। তাদের অসহায় মায়েদের কথা মনে হয়, তাদের মায়েরাও যে অসহায়ভাবে পথ চেয়ে বসে আছে একথা মনে হওয়ায় তাদের মাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে,

> "ওর মায়ের হাহাকার তখনো আমাদের কানে বাজতে থাকে। আমাদের একবারও মনে হয় না এই হাহাকার আমাদের মায়েদেরও হতে পারতো।"[১১]

হতে পারত কিন্তু হয়নি। যখন অন্যায় হয়ে গেছে তখন তাদের ঘন আনন্দহীনতায় বাড়ি ফেরার সময় একে অপরের বোধ ফিরে আসে, "তাহলে আমরা কাজটি করলাম কেন?"[১২] গল্পের সূচনা থেকে মন্দিরাকে ধর্ষণ করা অবধি চার যুবকের প্রতিটি কাজের কোনো পর্যবেক্ষণ ছিলই না। তাদেরকে অবক্ষয়িত সমাজ ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে, তা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো চিন্তা-চেতনা ছিল না। তাদেরকে বাশার জাগ্রত করার চেষ্টা করলেও তারা ক্ষনিকের জন্য জেগে উঠে আবার নিজের স্থানে ফিরে আসে। একসময় তাদের আড্ডায় বাশারের প্রস্থান হয় মন্দিরার আগমন হয়। একদিকে তারা অবসাদগ্রস্ত আর অন্যদিকে তারা বেকার। তারা অবক্ষয়িত সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বাস্তব জীবনের রূপকার। তাঁর গল্পে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট হয়। আলোচ্য গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালের প্রেক্ষাপটে রচিত। মুক্তিযুদ্ধের পরে তৎকালীন সমাজের মানুষজন যে অবক্ষয়িত সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে এবং নারীদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার থেকে শুরু করে সাধারণ পরিশ্রমী মানুষদেরকেও অত্যাচার করেছিল তারই প্রতিকায়িত রূপ আলোচ্য গল্পে বর্তমান। চার যুবকের অপরাধপ্রবণতার মাঝে তাদের মায়েদেরও কথা মনে হয়নি। একটি নিষ্পাপ মেয়ের ধর্ষণে তাদের মায়েদের ও অপর মায়েদের কথা বা মায়েদের হাহাকারের কান্না যখন কানে বাজতেই থাকে তখন আনন্দ ফিকে হয়ে যাওয়ায় মাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে। মাতৃত্ববোধের জাগরণে তারা গভীরভাবে অনুভব ও অনুশোচনা করে যে 'তারা অন্যায় করেছে'-

> "আমি চিৎকার করে উঠি। মনে হয় ম্লান জ্যোৎস্না যেন চারদিক থেকে দ্রুত অপসৃত হচ্ছে। নেমে আসছে একটি ঘন কালো ছায়া। বুঝি আকাশে মেঘ জমেছে। নাকি আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম? কালো ছায়া আমাদের বুকের ভেতর নেমে এসেছে।
> অনেকক্ষণ পর আমরা চারজনই একসঙ্গে বলি, আমরা অন্যায় করেছি।
> আমরা ভীষণ অন্যায় করেছি।
> হাই নিষ্পাপ মন্দিরা-
> হাই-
> নিষ্পাপ-
> মন্দিরা।"[১৩]

চার যুবক তাদের অন্যায় বা অপরাধ পর্যবেক্ষণ করে দেখে যে তারা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুযোগ পেয়ে অন্যায় করেছে। তাদেরকে কেউ সুযোগটি তৈরি করে দিয়েছে। গল্পকার এখানে সুযোগ বলতে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রবণতাকে বোঝাতে চেয়েছেন। এই সুযোগটি পেয়ে তারা ছেড়ে দেয়নি, এটাই ছিল তাদের অন্যায়। তাই তারা অন্যায় স্বীকার করে বিলাপের সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে অজ্ঞান অবস্থারত মন্দিরাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে শাস্তি দেয়-

> "রাত কত হবে জানিনা আমরা ঠিক করি যে আমরা বাড়ি ফিরব না। আমাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকা মায়েদের আমরা এই মুখ দেখাতে চাই না। আমাদের কিছু হয়েছে ভেবে তাদের বুকভয়ে কাঁপবে। কাঁপুক। আমরা ভাবি এই খারাপ ছেলেদের জন্য তাদের বুকে যেন কোনো মমতা না থাকে।"[১৪]

চার যুবকের শাস্তি তাদেরকে কেউ দেয় নি। নারীর মাতৃসত্তার আলোকিত ছায়ায় নিজেরাই নিজেদেরকে শাস্তি দিয়ে আলো খুঁজে পেতে চেয়েছে। তাইতো আলোচ্য 'চার যুবকের বিলাপ' গল্পে অবক্ষয়িত সমাজের

বিরুদ্ধে তথা তাদের নিজেদের অপরাধপ্রবণতার বিরুদ্ধে তাদের মাতৃত্ববোধের উত্তরণ গল্পটিকে অন্যতম পর্যায়ে নিয়ে যায়।

তথ্যসূত্র:

১। পাল, রবিন সম্পাদনা। সেলিনা হোসেন গল্পসংগ্রহ। এবং মুশায়েরা, আগস্ট ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৬১।
২। তদেব, পৃ. ২৬১।
৩। তদেব, পৃ. ২৬২।
৪। তদেব, পৃ. ২৬৪।
৫। তদেব, পৃ. ২৬৪।
৬। তদেব, পৃ. ২৬৫।
৭। তদেব, পৃ. ২৬৫।
৮। তদেব, পৃ. ২৬৬।
৯। তদেব, পৃ. ২৬৬-২৬৭।
১০। তদেব, পৃ. ২৬৭।
১১। তদেব, পৃ. ২৬৮।
১২। তদেব, পৃ. ২৬৯।
১৩। তদেব, পৃ. ২৬৯।
১৪। তদেব, পৃ. ২৭০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। আনোয়ার, চন্দন সম্পাদক। গল্পকথা। সেলিনা হোসেন সংখ্যা ৬, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, রাজশাহী।
২। ইসলাম, আজহার। বাংলাদেশের ছোটগল্প। অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ঢাকা।
৩। পাল, রবিন সম্পাদনা। সেলিনা হোসেন গল্পসংগ্রহ। এবং মুশায়েরা, আগস্ট ২০১৩, কলকাতা।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 525-532
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.240

বনফুলের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবন ও বেকারত্বের সংকট: একটি বিশ্লেষণ

সেখ সাকলিনউদ্দিন, *স্বাধীন গবেষক, কানুড়, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.01.2026; Accepted: 28.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the first half of the twentieth century, Bonoful emerged as a distinctive and realistic short-story writer in Bengali literature. His contributions across all branches of literature—fiction, drama, poetry, and essays—are noteworthy. Beyond his literary identity, he also had another significant role: that of a medical doctor. Through his profession, he came into close contact with people from diverse social strata, and these lived experiences were realistically reflected in his stories.

Bonoful's short stories vary in form—short, long, and medium in length. Some are written in a dramatic mode, resembling dialogues of a play, while others flow with the ease and rhythm of poetry. Each of his stories carries a unique flavour, marked by innovation and freshness. Written in simple language and free from unnecessary embellishment, his stories are easily accessible to readers.

Bonoful's short stories form a gallery of human characters. Although the narratives often proceed along parallel lines in the beginning, they take an unexpected turn at the end, subtly hinting at deeper meanings. With every sentence, the characters come alive. The pain of unemployment and the struggle of middle-class life significantly influence familial and social relationships. Rather than relying on exaggeration or melodrama, these crises emerge in his stories as inevitable truths.

This article offers a nuanced analysis of five of Bonoful's short stories—*Manush*, *Canvasar*, *Pashapashi*, *Bourgeois-Proletariat*, and *Voter Sabitribala*. These stories depict the psychological transformations of middle-class life and characters under the pressure of unemployment and financial scarcity, the erosion of human values, job insecurity, poverty, class conflict, and social decay.

Literature flows like a river, carrying within it political and social themes as well as the economic realities of contemporary India. With human beings as both the subject and inspiration of his writing, Bonoful stands as a truly original and exceptional artist in the world of Bengali short fiction.

Keywords: Bonoful, short story, unemployment, middle-class life, erosion of values, social system, economic crisis, class conflict

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ১৯ জুলাই মাতৃকোল আলো করে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত মণিহারী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন বনফুল। তারপর পড়াশোনা ও চাকরি করার সূত্রে নানা স্থানে গমন তাঁর জীবনে নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। শুধুমাত্র সাহিত্যিক নন, তিনি একজন সফল চিকিৎসক-ও। চিকিৎসক হিসাবে সমাজের সব শ্রেণির

মানুষের কাছে অনায়াসে পৌঁছাতে পেরেছিলেন এবং তাদের জীবনযাত্রাকে খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষের উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মানসিক অবস্থার পরিবর্তন গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করেছিলেন। সমাজে ঘটে যাওয়া সূক্ষ্ম ঘটনাও আতশ কাঁচের মতো বনফুলের চোখে ধরা পড়েছে। অর্জিত অভিজ্ঞতায় মানুষের জীবনকে সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। প্রায় ছ'শোর মতো গল্প, ষাটটি উপন্যাস, কয়েকটি নাটক এবং প্রবন্ধ তাঁর হাতে প্রাণলাভ করেছে। নিজের দক্ষতার বলে নতুন রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিকে, তাই বৈচিত্রেহীনতা ও একঘেয়েমি বনফুলের লেখাকে স্পর্শ করতে পারেনি— আর এখানেই তিনি শ্রেষ্ঠ। শুধুমাত্র মানুষ-ই নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা গাছপালা ও পশু বনফুলের গল্পে স্থান পেয়েছে এবং গল্পগুলি নজরকাড়া হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখায় উঠে আসা সামান্য একটা নিমগাছও পাঠকের মনকে আকর্ষণ করেছে। একটা নিমগাছ কেমন করে অবহেলিত, উপেক্ষিত গৃহবধূর প্রতীকে পরিণত হয়েছে তাও তিনি দেখিয়েছেন মাত্র সাতাশটি বাক্যে যা পাঠককে বিস্মিত করে।

'হাটে বাজারে'-র লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মাত্র তেরো-চোদ্দ বছর বয়সেই বন্ধু ভোলানাথের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে লিখে ফেলেছিলেন 'ময়ূর' নামক একটি কবিতা। সাহিত্যের প্রতি প্রেম ও লেখালেখির প্রতি আকর্ষণের ফলে বলাইচাঁদ আত্মপরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে 'বনফুল' ছদ্মনামের তলায় আশ্রয় নেন। ছদ্মনাম প্রসঙ্গে বনফুল বলেছেন,

> "ছেলেবেলায় ভৃত্যমহলে আমার নামছিল জংলি বাবু। বনজঙ্গল আমি খুব ভালোবাসি।... এই জন্যই বোধহয় ছদ্মনাম নির্বাচনের সময় 'বনফুল' নামটা আমি ঠিক করেছিলাম।"[১]

বাক্যর পর বাক্য সাজিয়ে পৃষ্ঠা ভরাট নয়, মাত্র কয়েকটি শব্দ ও বাক্যে মানবজীবনকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যেন তারা বই-এর পাতা ভেদ করে মিশে গিয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। অল্প কথায় গল্প বলা তাঁর গল্পশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য,তাই সুকুমার সেন লিখেছেন– "বনফুলের গল্পে কারিগরির দিকে ঝোঁক নেই, ঝোঁক আছে আস্ত জীবনের দিকে"[২] আর এখানেই তিনি স্বাতন্ত্র, পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের প্রভাবমুক্ত। সাহিত্যিকরা হয় সামাজিক জীব, সমাজের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বিষয় সাধারণের চোখ এড়িয়ে গেলোও সাহিত্যিকদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। বাংলা সাহিত্য জগতে বনফুল এমনি এক নাম, যার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির দৃষ্টান্ত প্রতি গল্পে প্রমান দেয়। তাঁর লেখা গল্পগুলি আকারে ছোটো, বেশিরভাগ গল্প এক থেকে দুই পৃষ্ঠার। গল্পের আকারে নয় কিংবা আবেগে ভেসে যাওয়া নয়, তিনি প্রতি শব্দে আভাস দিয়েছেন মানবজীবনের চরম সত্যের। গল্পের বিষয়বস্ত নির্বাচন করেছেন অন্তরালে থাকা তুচ্ছ, অবহেলিত ও উপেক্ষিত ঘটনাগুলি থেকে। মানুষই তাঁর গল্পের বিষয় কিন্তু লক্ষ্যনীয় মানুষকে নিয়ে তিনি কোনো তত্ত্ব গঠন করেননি। তাই, লেখার মধ্যে তিনি একটা বার্তা দিয়েছেন। তাঁর গল্পগুলি পাঠ করলে পাঠক সহজেই সেই ইঙ্গিত বুঝতে পারে।

মানুষ বলতে তিনি শুধু রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ জাতীয় প্রাণীকে বোঝাননি, বনফুলের লেখায় মানুষ হয়ে উঠেছে নৈতিক পরিচয়ের বাহক। মানবিকতা, দায়িত্ববোধ ও সহানুভূতি অনন্যা প্রাণী থেকে আলাদা করে তুলেছে মানুষকে। গল্পটি মোট চারটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এবং প্রতিটি অনুচ্ছেদই তাৎপর্যপূর্ণ। আলোচ্য গল্পটি গল্পকারের নিজের জবানিতে ব্যক্ত হয়েছে। গল্পের শুরুতেই বলেছেন, 'অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলাম', যে দৃশ্য আমাদের চোখে বেদনা নয় আরামের অনুভূতি দেয় তার দিকেই অপলক ভাবে তাকিয়ে থাকা যাই। গঙ্গাবক্ষে সূর্যের অস্ত যাওয়া থেকে সুন্দর এই পৃথিবী পর্যন্ত প্রকৃতির শোভা বর্ণিত হয়েছে, সেই রূপে বিহ্বল লেখক বলেছেন–

> "নদীর তীরে ঘাসের উপর তন্ময় হইয়া বসিয়াছিলাম।"[৩]

তাঁর এই তন্ময়তার কারন প্রকৃতির প্রতি প্রেম। অস্ত যাওয়া সূর্যের লাল আভায় পৃথিবীকে স্বপ্নলোক বলে মনে করেছিলেন কথক। যেখানে কোনো ছলনা নেই, প্রতিকূলতা নেই, সেখানে নৌকাগুলি আপন বেগে স্রোতের অনুকূলে ভেসে যাচ্ছে আর প্রকৃতি নিজের ছন্দে বিরাজমান হয়ে আছে। শ্যামল তীরে দেবালয় আর দেবালয়ের সামনে রোমন্থনরত গাভী, মুদিত নয়ন একটি মার্জার এবং নহবৎ ও পূরবীর আলাপ কথককে মগ্ন থাকতে বাধ্য করেছে।

সহসা চমকে উঠলেন কথক, "আমার পিছনে কে যেন জড়িত কণ্ঠে কথা কহিল। ফিরিয়া দেখি একটি ভিখারী এবং তার সহিত একটি মেয়ে।"[৪] কথক স্বপ্নলোক থেকে মানব জগতে প্রবেশ করলেন, দেখলেন ব্যাধি আর স্বাস্থ্য পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। ভিখারীর সম্বল কুষ্ঠ রোগ আর মেয়েটি যৌবনের অধিকারী। তাদের উদ্দেশ্য একই, হাত পেতে একটি পয়সা আদায় করা। কথকের চোখে প্রকৃতির মনমুগ্ধ শোভা আর সমাজের নগ্নরূপ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। একদিকে প্রকৃতির নিরপেক্ষতা, উদারতা আর অন্যদিকে সমাজের বৈষম্য, দরিদ্রতা, ক্ষুধা ও বেঁচে থাকার জন্য মানুষের জীবন সংগ্রাম। একদিকে হিংস্র-কাটাকাটি-দৈন্যতাহীন প্রকৃতি, অন্যদিকে মানুষের গড়া সমাজের বিকৃত রূপ।

এর পরেই গল্পের চরম মুহূর্ত, ক্লাইম্যাক্স। প্রকৃতি নিজের নিয়মে চলমান, দিনের আলো আর রাত্রির অন্ধকারে দিনের সমাপ্তি ঘোষণা স্বাভাবিক। কিন্তু সমাজকে অন্ধকার গ্রাস করলে সমাজ পঙ্গু হয়ে পড়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কথকের কাছে তার ভাইয়ের চাকরির সংবাদ আসে, কথকের স্বীকারোক্তি-

> "সুসংবাদ। আমার অকর্মণ্য ভাইটির চাকুরি হইয়াছে। এ চাকুরিটার জন্য পাঁচশত প্রার্থী ছিল। বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রে আমার ভাইটির অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠও ছিলো। তবু তাহাদের অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র সুপারিশের জোরে আমার ভাই-ই চাকুরিটা পাইয়াছে।"[৫]

— এই সুসংবাদ সমাজে অনভিপ্রেত। শুধুমাত্র সুপারিশ আর ক্ষমতার জোরে পাঁচশত প্রার্থীকে পিছনে ফেলে ভাইয়ের চাকরি হওয়া; সমাজের বৈষম্য, ক্ষমতার অপব্যবহার আর দ্বিচারিতাকেই প্রকাশ করে যা আজও বিদ্যমান। মাতৃস্তনাভিমুখী বাছুরটিকে প্রাণপনে ধরে রেখে একজন অসৎ মানুষ যেমন বাছুরটির প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে ঠিক তেমনি 'সুপারিশ' বেকারত্বে ক্ষতবিক্ষত পাঁচশত চাকরি প্রার্থীর অধিকার হরণ করেছে। সিগারেটের খালি কেসের মতোই চাকরি প্রার্থীদের রসহীন জীবন সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাজকে চপেটাঘাত করে।

'ক্যানভাসার' নিছক নামকরণ নয়, শব্দটির মধ্য দিয়ে লেখক এক শ্রেনির পেশার মানুষের জীবনযাত্রাকে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়– স্ত্রীর সখ পূরণে অক্ষম বেকার ভৈরব, অভাবের সংসারে কাত্যায়নীর আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন, ক্যানভাসার হীরালালের পণ্য বিক্রয়ের আপ্রাণ চেষ্টা এবং ছলে-বলে-কৌশলে মানুষের সরল মনকে আকর্ষণ করা বিজ্ঞাপনের ভূমিকা। মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে আর রংবাহারে, হীরালালের বাঁধানো দন্তপাট আর কলপ করা কালো কুচকুচে গোঁফ তারই প্রমান দেয়।

গল্পকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ভৈরব ও কাত্যায়নীর দাম্পত্য জীবনের চিত্র পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন । গল্পের শুরুতেই দেখা যায় সাংসারিক কলহের মূল কারণ কাত্যায়নী সখ, কিন্তু পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে কাত্যায়নীর 'সখ' না ভৈরবের 'বেকারত্ব' কলহের বীজরোপণ করেছে–

> "কাত্যায়নীর বহুকাল হইতে একটা সৌখীন শাড়ী কেনার সখ। বেকার ভৈরব অর্থভাবপ্রযুক্ত সে সখ মিটাইতে পারে নাই।"[৬]

বেকার, অর্থসংকটে জর্জরিত ভৈরবের কাছে এই সখ ঝলসানো রুটির মতো, বামন হয়ে চাঁদ ধরার মতো। ভালো শাড়ী কেনার আকাঙ্খা, বিলাসিতা, বাবুয়ানির কাছে মাথা নত করেছে বেকার ভৈরব। দিন আনা দিন খাওয়া মধ্যবিত্ত সংসারে সামান্য খাওয়া-পরার যোগান দিতে না পারা ভৈরব তাচ্ছিল্যর শিকার, কাত্যায়নী বলেছে–

> "যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল ধরে তার আবার বন্ধুক ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন? এক কড়ার মুরোদ নেই বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার।"[৭]

নিদারুন এই কথা সরাসরি আঘাত করেছে ভৈরবের পৌরুষ ও আত্মসম্মানে, আর তার প্রভাব পড়েছে ক্যানভাসার হীরালালের উপর।

ঘুমে মগ্ন ক্যানভাসার হীরালাল ওভারক্যারেড হয়ে এই পল্লীগ্রামে এসেছে কিছু বিজনেসের আশায়। বেকার ভৈরব এবং অর্থনৈতিক হাহাকারে বিদ্ধ ক্যানভাসারের জীবিকা গ্রহণ করা হীরালাল– মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সখ পূরণে অক্ষম ভৈরব ও সৌখিন পণ্য বিক্রেতা হীরালাল যেন একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। নাছোড়বান্দা হীরালালের কোনো প্রলোভনই ভৈরবকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তাদের কথোপকথন তর্কের রূপ নেয়, ফলে দাম্পত্য কলহ থেকে সৃষ্ট রাগের প্রভাব পড়ে হীরালালের উপর। ভৈরবের চপেটাঘাতে হীরালালের বাঁধানো দন্তপাটি স্থানচ্যুত হয়। এই অত্যাচার, আক্রমণে প্রতিক্রিয়হীন হীরালাল রক্ত-মাংসে গড়া একজন মানুষ এবং তারও সংসার আছে। শুধুমাত্র মাজন বিক্রি আর উপার্জনের আশায় নিশ্চুপ থেকেছে হীরালাল।

ভৈরবের মুখে হীরালালের খাসা দাঁত আর কালো গোঁফের প্রশংসা থাকলেও গল্পের শেষে বিজ্ঞাপনের ভুয়ো আড়ম্বরের মুখোশ খুলে পড়েছে। হীরালালের বাঁধানো দাঁত আর কালো কলপ বিজ্ঞাপনের প্রকৃত সত্যককে উন্মোচন করেছে। নিজের লক্ষ্যে অবিচল হীরালাল যেকোনো উপায়েই তার পণ্য খরিদ্দারের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। বিজ্ঞাপনের সাথে মানবিক সহানুভূতিকে হাতিয়ার করে করুনা লাভের চেষ্টায় সফল হীরালাল। সখ পূরণে অক্ষম বেকার ভৈরব সন্তানের মৃত্যুর শোক সংবাদে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, বলেছে–

> "আচ্ছা, দিন এক কৌটা মাজন।"[৮]

কৃত্রিম মাজনের কাছে শুধু নিম দাঁতনের পরাজয় নয়, বিজ্ঞাপনের কাছে সমাজের সব স্তরের মানুষের আত্মসমর্পণের চিত্র দেখানো হয়েছে। আর্থিক অনিশ্চিয়তায় ভুক্তভুগি হীরালালও সমাজের কাছে অসহায়, তাই ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়েছেন। ছল, প্রতারণা, ভণ্ডামি আধুনিক সমাজের নির্মম বাস্তবতাকে দেখিয়েছে।

বনফুলের সমস্ত গল্পই ভিন্ন স্বাদের, এমনি একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প 'পাশাপাশি'। সরলরেখার একপাশে কথক অন্যপাশে বিকাশ বাবুকে রেখে বেকারত্ব ও অর্থাভাবের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার উপর ব্যঙ্গ করেছেন লেখক। তৎকালীন বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে চাকরি, জীবিকার অনিশ্চয়তা লেখককে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছে, আর তারই প্রভাব পড়েছে 'পাশাপাশি' গল্পে। গল্পের শুরুতেই কথক তারই সংকেত দিয়েছেন, বলেছেন–

> "আসল কারণ অর্থাভাব। আমার যাহা করিবার তাহা করিয়াছি। পরীক্ষা পাস করিয়াছি, বহুস্থানে চাকুরির দরখাস্ত দিয়াছি—এমন কি কিছুদিন ইনসিওরেন্সের দালালিও করিয়াছি—কিন্তু কিছু হয় নাই।"[৯]

পরীক্ষায় পাশ করেও কথকের শিক্ষার মূল্যায়নে ব্যর্থ সমাজ। অথচ কর্মহীন, আয়হীন বেকার যুবককে সমাজ কোনো কালেই মূল্য দেয়নি, ছুড়ে ফেলেছে আস্তাকুঁড়ে। কথক নানারকম পরিকল্পনা করেও নিরুপায়, তাই অর্থাভাবে ডুবে যাওয়া গ্রামীণ বেকার যুবক পরিত্রাণের জন্য এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগে

পল্লীগ্রাম ছেড়ে শহরে বিকাশ বাবুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বিকাশের সংসার। প্রতিদিন নিয়ম করে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাওয়া বিকাশকে দেখে বলেছেন–

> "'কাজের মানুষ!' বিকাশ ভায়াকে দেখিয়া হিংসা হয়। কেমন সুন্দর রোজ আপিস যায়, সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে— রাত্রে ভালো ঘুম হয়।"[১০]

এতো কথকের কল্পনা, কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ আলদা। বেকারত্ব গ্রাম ছাড়িয়ে শহরকেও গ্রাস করেছে- পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। রাত্রে ভালো ঘুমের জন্য শুধুমাত্র একটা উপার্জনের পথ সন্ধান করেছেন কথক।

এম.এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া উচ্চ শিক্ষিত বিকাশ তিন বছর অবিরাম চেষ্টা করেও চাকরি জোটাতে অক্ষম হয়েছেন। একদিকে সংসার অন্যদিকে বেকারত্বে বিষাদগ্রস্ত বিকাশ দু'দন্ড শান্তির জন্য ইডেনের বেঞ্চটিকেই বেছে নিয়েছেন—

> "লেট্ হয়ে যাচ্ছে –সে ব্যাটা এসে পড়লে বেঞ্চটা আর পাব না।"[১১]

সামান্য বসার জন্য এখানেও একজন প্রতিযোগী। বাহ্যিক অর্থে বেঞ্চটি বসার আশ্রয় ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ অর্থে বেঞ্চটি একটি প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বেঞ্চটি, বেকারত্বে ডুবে থাকা একটা সমাজের প্রকট সংকটকে প্রকাশ করেছে, যে সংকটে কর্মহীন বহু মানুষ জড়িয়ে পড়ছে গ্রাম-শহর নির্বিশেষে।

আলোচ্য গল্পে চরিত্রগুলো দৈহিক ভাবে পাশাপাশি অবস্থান করলেও তাঁরা নিরুপায়, মানসিক যন্ত্রনায় আহত। শুধু পাশাপাশি হাঁটা বা বসা নয়, চরিত্রগুলি বেকারত্বেও একে-অপরের পাশাপাশি অবস্থান করেছে। পাশাপাশি থেকেও নিরুপায়, ভগ্নপ্রায় সমাজের অর্থ ব্যবস্থার ফলে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি।

বহুভাষী ও বহুজাতির মিশ্রনেই সমাজ গড়ে উঠে। যেখানে ধর্মীয় বিভাজনের পাশাপাশি শ্রেণি বিভাজন, বিশেষ করে ধনী-দরিদ্রর সাংঘাত স্পষ্ট, যার মুলে রয়েছে অর্থব্যবস্থার অসম-বণ্ঠন। অর্থনৈতিক অসম-বণ্ঠনের ফলে এক শ্রেণির মানুষ বিত্তশালী হয়ে ওঠে এবং মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে সমাজে পরিচিত লাভ করে। আর এক শ্রেণি চিরকাল অবহেলিত, শোষিত। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি, শ্রেণি বিভাজন ও বৈষম্য এবং বনফুলের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মিশ্রন 'বুর্জোয়া প্রোলিটারিয়েট' গল্পটি। আলোচনার পূর্বে নামকরণের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, এরা একে অপরের বিপরীত এবং বুর্জোয়া-প্রোলিটারিয়েট শ্রেণির দ্বন্দ্ব ও সংঘাতই গল্পে মূল বিষয়। বুর্জোয়া বলতে সাধারণত বোঝায় পুঁজি ও সম্পদশালী এক শ্রেণিকে যারা সমাজে সম্মান অধিকারের দাবি রাখে। আবার প্রোলিটারিয়েট হল শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণি, যাদের অর্থ উপার্জনের একমাত্র সম্বল শ্রম। প্রোলিটারিয়েটকে ব্যবহার করে, মুনাফা লাভ করা বুর্জোয়ার লক্ষ্য। গল্পকার, 'পেটি বুর্জোয়া হলধর' ও 'প্রোলিটারিয়েট নিধিরাম' শব্দ চয়নের মধ্য দিয়ে প্রথমেই তাদের শ্রেণি বিভাজন করে দিয়েছেন। চরিত্র দুটির আলোচনায় দেখিয়েছেন মধ্যবিত্ত জীবনের উত্থান-পতন, শ্রেণি সংকট ও বৈষম্য, আর্থিক বিপর্যয় এবং আত্মসম্মান রক্ষার দৃঢ় সংকল্প।

চতুর্থ কন্যার বিবাহের ফর্দ করতে ব্যস্ত হলধর মধ্যবিত্ত শ্রেণির একজন ভদ্রলোক। তার সঞ্চিত অর্থ ভান্ডার শেষ, তাই ভোজের খরচে লাগাম টানতে প্রিয় বন্ধু অখিল মিত্রের শরণাপন্ন হন এবং কোনো উপায় না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হলধর বাসায় ফিরে আসেন। সমাজে মর্যাদার সহিত অটুট থাকতে ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলধর নিধিরামের সাহায্য নিয়েছেন। দই বিক্রেতা নিধিরাম যেমন বিশ টাকা মণের দই বিক্রি করেন তেমনি তার কাছে পাওয়া যায় পনেরো-দশ-পাঁচ টাকা মণের দই-ও। চিন্তাগ্রস্ত হলধর অনেক চিন্তা করে পঁচিশ টাকা বাঁচানোর উপায় খুঁজে পান এবং পাঁচ টাকা মণের দু'মণ দই বায়না দেন। এই নিরেশ দই মুখে পড়তেই নিন্দার ঝড় উঠবে তাই ষড়যন্ত্র করেছেন—

> "বলছি নিন্দে-টিন্দে যদি কেউ করে তখন তোমাকে ডেকে আমি একটু ধমক-টমক দেবো। ভাবটা যেন তোমাকে আমি ভালো দই-ই দিতে বলেছিলাম তুমি যেন আমাকে ঠকিয়েছ।"[১২]

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হলধর ঠুনকো সমাজ ব্যবস্থার শিকার, নিজের মান বাঁচাতে নিধিরামকে তুরূপের তাসের মতো ব্যবহার করেন। তুরূপের তাসকে যেমন কঠিন মুহূর্তে জয়লাভ করতে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে, ঠিক তেমনি নিজের মান বাঁচাতে মরিয়া হলধর নিধিরামকে অস্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করেছে। সমাজের উপর তলার মানুষের কাছে নিচের তলার মানুষ শোষণের শিকার, তাই শেষ পর্যন্ত নিধিরামের করুণ পরিস্থিতি পাঠকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সমাজ ব্যবস্থার নগ্নরূপ। একটাকা বেশি লাভের আশায় সম্মত নিধিরাম নিজের সম্মানের তোয়াক্কা না করেই অর্থের কাছে মাথানত করেছেন। হলধরের আত্মসম্মান রক্ষার চেষ্টা আর অর্থের কাছে নিজের সম্মান বিক্রেতা নিধিরামের অবস্থান গল্পটিকে পূর্ণতা দান করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গল্পের মূলভাব উদয় হয়েছে। অখাদ্য দই বরযাত্রী মুখে নিতেই বারুদের মতো বিস্ফোরণ ঘটে গেল। অর্থ নয়, ভদ্রতা রক্ষা করতেই ভদ্রলোক হলধরের এই কার্পণ্য শ্রেণি বৈষম্যকে ইঙ্গিত করে। হলধরের সাজানো ফাঁদে জড়িয়ে অসহায় নিধিরামের কপালে ধন্যবাদের পরিবর্তে জুটেছে হারামজাদা, জুয়াচোর, পাজি উপাধি। শর নিক্ষেপ হওয়া হরিণ যেমন বাঁচার জন্য ছটপট করে, সেরকম নিন্দার বাণে আঘাত পাওয়া হলধর সমাজের কাছে নিজেকে প্রমান করতে নিধিরামের গালে সজোরে আঘাত করে —

> "নিধিরাম মুখ তুলিয়া বলিল, চড় মারবার কথা তো ছিলো না। চড় মারলেন যে বড়! আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোক রয়েছেন, বিচার করুন আপনারা—"[১৩]

প্রতিবাদের স্বরও হলধরের দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত। শাসকের কাছে শাসকের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ অর্থহীন।

আলোচ্য গল্পে লেখক মধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরেছেন, কিন্তু বর্তমান সমাজ প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বিষয়ের গভীরতা স্বীকার করতেই হয়। আর্থিক ও মানসিকভাবে বুর্জোয়া হলধরের পূর্বে অর্জিত সামাজিক মর্যদা রক্ষার প্রয়াস ও ব্যর্থতা- তার আত্মদ্বন্দ্বের মূল কারণ। গল্পটি গতানুগতিক কাহিনি নয়, শ্রেণি বৈষম্য ও শ্রেণি সংকটে পিষ্ট মধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের একটি তীক্ষ্ণ দলিল।

মানুষ রাজনৈতিক জীব, প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ ভাবে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আবৃত। মানুষের দৈনিক জীবনযাত্রায় রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে রাজনীতির মিশ্রনে লেখা বনফুলের 'ভোটার সাবিত্রীবালা' গল্পটি। গল্পের প্রধান চরিত্র সাবিত্রী পেশায় একজন রাঁধুনি। স্বামী মোহনাশ এবং পুত্র রিপুনাশ ও তমোনাশকে নিয়ে তার অভাবের সংসার। টোলের পণ্ডিত মোহনাশ তর্কতীর্থ সমাজে কদরহীন ও অতিশয় দরিদ্র মানুষ। এই দরিদ্র অবস্থার জন্য সাবিত্রীর সংসারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। যক্ষায় আক্রান্ত রিপুনাশ, অর্থের অভাবে সাবিত্রী রিপুনাশের চিকিৎসা করাতে পারেননি। বন্ধুর মুখে গল্প শুনেছে রিপুনাশ—

> "হরু জেল থেকে ভালো হয়ে ফিরে এসেছে। তার যক্ষা হয়েছিল। সেখানে খুব ভালো হাসপাতাল আছে। বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে।"[১৪]

তাই বাঁচার তাগিদে, বিনা পয়সার চিকিৎসার জন্য ট্রামে চুরি করে এক মাসের জন্য জেল খাটে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এক মাসের মধ্যেই মারা যায়। শুধুমাত্র বিনা পয়সায় চিকিৎসার জন্য জেলখানার চার দেওয়ালের বদ্ধ জীবনকেই বেছে নিয়েছে- দরিদ্র জীবনে দায়বদ্ধ রিপুনাশের জীবন যন্ত্রনার কঠিন বাস্তবতাকে লেখক দেখিয়েছেন।

সাবিত্রীবালা একজন ভোটার এবং সংসারের কর্ত্রী। দীর্ঘদিন ধরে অভাবের সংসারকে টিকিয়ে রাখতে তার অনবদ্য লড়াই। অর্থের অভাবে চিকিৎসাহীন বিদ্বান স্বামী ও ছোট ছেলে রিপুনাশের মৃত্যু সাবিত্রীকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তাই ভোট চাইতে আসা ভোট প্রার্থীকে কাছে পেয়ে যোগ্য জবাব দিয়েছেন, বলেছেন—

> "ছোট ছেলেটা মল যক্ষায়, তার কোনও চিকিৎসা হ'ল না, সর্বত্র ঘুষ চায়। আপনাদের ভোট দেব কেন..."[১৫]

আলোচ্য গল্পগুলির মাধ্যমে গল্পকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় নিজের চোখে দেখা এবং অনুভব করা মধ্যবিত্ত সমাজে জীবনের কঠিন বাস্তবতা ও সত্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। ঘটনার-ঘনঘটা বর্জিত, জটিলতাহীন সহজ-সরল ভাষা গল্পের বিষয়কে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। প্রতিটি গল্প স্বাভাবিক ভাবে শুরু করলেও সমাপ্তিতে পাঠককে চমকে দিয়েছেন বনফুল। বনফুলের দক্ষ হাতে প্রাণ পাওয়া, রক্ত-মাংসে গড়া চরিত্রগুলি তৎকালীন সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সেজন্যই, গল্পের কেন্দ্রবিন্দু মধ্যবিত্ত জীবন ও বেকারত্ব হলেও পুনরাবৃত্তি তাঁর লেখায় দেখা যায় না, আর এই বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির জন্যই তিনি অনন্য শিল্প।

তথ্যসূত্র:

১. বনফুল। পশ্চাৎপট। চতুর্থ বাণীশিল্প সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৪২।

২. মিত্র, সরোজমহন। ছোটগল্পের বিচিত্র কথা। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ: ১৯৬৪, পৃ. ২৩৮।

৩. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ২১১।

৪. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ২১১।

৫. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ২১৩।

৬. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ১৬৪।

৭. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ১৬৪।

৮. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ১৬৫।

৯. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ১৪৬।

১০. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ১৪৮।

১১. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ১৪৯।

১২. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ৩৯২।

১৩. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ৩৯৩।

১৪. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ৩১৪।

১৫. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন (সম্পা.) । বনফুলের গল্প সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৮, পৃ. ৩১৪-৩১৫।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 533-540
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.241

স্বদেশিকতার আলোয় অমৃতলাল বসুর ‘সাবাস বাঙালী’

নগেন মুর্মু, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিধান চন্দ্র কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the context of the anti–Partition of Bengal movement of 1905, many Bengali writers portrayed the contemporary situation and expressed their protest through their literary creations. The Swadeshi Movement awakened the entire Bengali nation in a new way. There emerged an urge to rediscover everything that was beneficial and beautiful for the country. From everyday life to trade and commerce, a renewed love for indigenous products developed in support of the Swadeshi Movement. Through the boycott of foreign goods, efforts were made to weaken the economic foundation of British imperial power.

In the farce, we see that people from ordinary middle-class households, educated youths, and even village housewives came forward to produce Swadeshi goods. However, not the entire Bengali community opposed British rule. Some opportunists, who were employees of the British government and whose lives and livelihoods depended on it, refused to boycott foreign goods. They never supported the Swadeshi Movement. Playwright Amritalal Basu included characters from this class in his farce as well. Their mean mentality and opportunistic outlook evoke a sense of disdain in the minds of readers.

In the anti-Partition movement, the entire Bengali nation participated collectively. People from both Hindu and Muslim communities joined the movement in support of an undivided Bengal, the impact of which reached the vast shores of Bengali literature. The Swadeshi Movement found expression in various forms through songs, poems, short stories, novels, essays, and plays. Writers and artists chose their creative works as a language of protest. Alongside protest and the creation of public awareness, they also initiated revolutionaries into the mantra of freedom. Amritalal Basu’s farce *“Sabas Bangali”* is one such creation.

Keywords: Swadeshi Movement, patriots, loyalty to indigenous culture, morally degenerated Bengali, self-reliant Bengali, self-reliant India

বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্য গগনে যখন বিরাজমান ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমূখের মতো মহান নাট্যব্যক্তিত্ব, ঠিক সেই সময়ে আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)। নাট্যশিল্পে তাঁর প্রথম পরিচয় অভিনেতা হিসেবে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সান্নিধ্য পেয়ে নাটক সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি জ্ঞান অর্জন করেন এবং পরবর্তীকালে নাট্যরচয়িতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠলেও নাটক ও প্রহসন রচনায় তাঁকে অনুসরণ করেননি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ যেখানে সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলিকে গুরুগম্ভীর ভাব ও ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন, সেখানে অমৃতলাল বসু একই বিষয়কে ফুটিয়ে তুলেছিলেন লঘু হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে। ব্যঙ্গনাটক

ও ব্যঙ্গপ্রহসন রচনাতেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে তিনি 'রসরাজ' উপাধি পেয়েছিলেন। সমসাময়িক কাল ও সমাজকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তৎকালীন নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অনাচার তার লেখনীর মধ্যে বারবার প্রকাশ পেয়েছিল। ব্রহ্মসমাজ, বিলেত ফেরৎ সভ্য বাঙালি সম্প্রদায়, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, স্ত্রীস্বাধীনতার নামে ব্যভিচার, অলীক স্বদেশী আন্দোলন, কোনও কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায়নি। অমৃতলাল বসুর নাটক ও প্রহসনগুলি ব্যঙ্গাত্মক হলেও পাঠকের মনকে তীব্রভাবে আঘাত করেছে।

তাঁর লেখা প্রথম নাটক 'হীরক চূর্ণ'। বিষয় সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা। বরোদা রাজ্যের ইংরেজ রেসিডেন্টকে হীরক চূর্ণ মিশ্রিত মদ্য পান করিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছিল মলহর রাজ গায়কোয়াড়ের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে রাজ্যচ্যুত ও নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনা নিয়েই রচিত 'হীরক চূর্ণ'। সাহিত্য সমালোচক ড. সুকুমার সেন অমৃতলাল বসুর সমগ্র নাট্যসৃষ্টিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন যথা-

১. বিশুদ্ধ প্রহসন- চোরের উপর বাটপাড়ি, তিল তর্পণ, ডিসমিস, চাটুজ্জে ও বাঁড়ুজ্যে, তাজ্জব ব্যাপার, রাজা বাহাদুর এবং কৃপণের ধন।

২. শিক্ষাত্মক প্রহসন- বিবাহ বিভ্রাট, সম্মতি সংকট, কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা, একাকার এবং গ্রাম্য বিভ্রাট।

৩. বিদ্রূপাত্মক প্রহসন- বাবু, বৌমা, সাবাস আটাশ, অবতার, বাহবা বাতিক, সাবাস বাঙালী, ব্যাপিকা বিদায়, দ্বন্দে মাতনম্।

৪. চিত্রনাট্য- বিলাপ, বৈজয়ন্ত বাস।

৫. গীতিনাট্য- ব্রজলীলা, যাদুকরী।[১]

নাট্যকার অমৃতলাল বসু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন। এই আন্দোলন চলাকালীন তিনি বাঙালি জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লক্ষ্য করেছিলেন। কোথাও দেখেছেন চরিত্রের অসঙ্গতি, কোথাও বা সাহেবের চাটুকারিতায় মত্ত, অথবা দেখেছেন পণলোভী বা চাকুরীলোভী, আত্মসম্মানত্যাগী, ভণ্ড দেশহিতৈষী, এবং উপাধিলোলুপ বাঙালিকে। এই আদর্শভ্রষ্ট বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভর, শিক্ষিত, আদর্শবান এবং স্বদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বাঙালি জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সাধনাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। 'সাবাস বাঙালী' প্রহসনে নাট্যকারের সেই উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে। এটি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে। গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ১৯০৫ সালে ২৫শে ডিসেম্বর 'স্টার থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়েছিল। প্রহসনটি দুটি অঙ্কে গঠিত। প্রথম অঙ্কে ছয়টি এবং দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য রয়েছে।[২] প্রহসনে কোনও একক কাহিনি নেই। তৎকালীন রাজনৈতিক চাপানোতরের ফলে যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল তার প্রভাব এখানে স্পষ্ট। আন্দোলনের ফলে বাঙালি সমাজের সর্বস্তরে যে পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল তারই প্রতিফলন এই প্রহসনে দেখা যায়। যুব সম্প্রদায়ের মনে দেশমাতৃকার প্রতি জাতীয়তাবোধ তৈরি করা এবং বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্যের প্রতি বাঙালিদের ভালোবাসা পুনরায় ফিরিয়ে আনার কাহিনি রয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যার বর্ননা রয়েছে 'সাবাস বাঙালী' প্রহসনে।

বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ নীতিকে কেন্দ্র করে। উনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতীয়দের বিশেষ করে বাঙালি জাতির মনে পরাধীনতার গ্লানি এক অস্বস্তিকর মানসিক

পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করে আসছিল। এই বিরোধিতা কোথাও সশস্ত্র, কোথাও বা লেখনীর মধ্য দিয়ে ঝলসে উঠেছিল প্রতিবাদের লেলিহান শিখা। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সমগ্র বাঙালি জাতি একত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ অখন্ড বঙ্গদেশের সমর্থনে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, যার ঢেউ এসে পড়েছিল বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ তটে। গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং নাটকে নানা রূপে স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল। সাহিত্যিক এবং বিভিন্ন শিল্পীরা প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে বেছে নিয়েছিল নিজেদের শিল্পকর্মকে। শুধু প্রতিবাদ এবং জনসচেতনতা নয়, তার পাশাপাশি বিপ্লবীদের স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। অমৃতলাল বসুর লেখা 'সাবাস বাঙালী' প্রহসন এমনই একটি সৃষ্টি।

এই প্রহসনে অমৃতলাল বসু একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বিশেষত আদর্শচ্যুত বাঙালিকে স্বনির্ভর ও আদর্শবান জাতিতে পরিণত করে এক স্বনির্ভর দেশ গড়তে চেয়েছিলেন। প্রহসনের প্রস্তাবনা অংশে আমরা দেখি অন্তঃপুর সংলগ্ন বাগানে মহিলাগনের গান। এই গানের মধ্যদিয়ে বিদেশি বস্ত্র, শিক্ষাব্যবস্থা, এবং আদব-কায়দাগুলিকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। হ্যাট, কোট পড়ে সাহেবিয়ানা দেখানোকে বাঁদর সাজ বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। অপরদিকে দেশি বস্ত্র অর্থাৎ ধুতি, চাদর পড়া বাঙালি যুবকদের বরণ ডালা নিয়ে উলুধ্বনি সহযোগে বরণ করা হয়েছে। নাট্যকার অমৃতলাল বসু শুরুতেই বিদেশি পণ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুকে বর্জন করে দেশীয় সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন যা স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রহসনের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় এক গৃহস্থ বাঙালি পরিবারের কথা। পরিবারের কর্তা নয়ানচাঁদ ও তাঁর স্ত্রী গরবিনীর কথাবার্তায় উঠে আসে স্বদেশী আন্দোলনের আঁচ। আন্দোলনের প্রভাব কীভাবে বাঙালিদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করতে পেরেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন নয়ানচাঁদ বলে, উচ্চশিক্ষা এবং ডিগ্রির পরিবর্তে দেশীয় পণ্য উৎপাদনে সক্ষম কারিগরের মূল্য বিয়ের বাজারে অনেক বেশি। মিটিং মিছিল করে সমস্ত বাঙালিদের মধ্যে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। সমস্ত যুবক এখন পড়াশোনা শিখে ডিগ্রি অর্জন না করে, ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরীবিদ্যা, নানারকম হাতের কাজ যেমন- কামার, কুমোর, ছুতোর এবং তাঁতির কাজ শিখে স্বনির্ভর হতে চাইছে।

প্রহসনের তৃতীয় দৃশ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র মতিলালের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়। স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য মতিলালকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সদ্য বি.এ পাস করার পর সে ব্যারিস্টারি নিয়ে পড়াশোনা করছে। বাবা মায়ের স্বপ্ন তাকে বিয়ে দিয়ে মোটা টাকা পণ হিসেবে ঘরে তুলবে। যেহেতু মতিলাল একজন শিক্ষিত যুবক সুতরাং পণের টাকার পরিমাণও নিশ্চয় বড়ই হবে, কিন্তু বাবা-মায়ের এই স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে। ঘটনাচক্রে সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য মতিলালকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই তার বাবা-মা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। পনের টাকা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ছেলে জামিন পেয়ে বাড়ি ফিরে এলে তাকে নানা উপায়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় সে যেন এই আন্দোলন, মিটিং, মিছিল থেকে দূরে থাকে, কারণ পুলিশের খাতায় একবার নাম উঠে গেলে বিয়ের বাজারে তার দাম অনেক কমে যাবে। কোনও ভদ্র ঘরের কন্যা সে পাবে না, পণের টাকা তো অনেক দূরের কথা। কিন্তু মতিলাল বিয়ে, সংসার এসব থেকে দূরে থাকতে চায়, স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চায়। দেশ তার কাছে মায়ের সমতুল্য। দেশের মানুষ যেখানে কোম্পানির অত্যাচারে জর্জরিত, সেখানে সে কোম্পানির চাকরি নিয়ে তাদের গোলামী করতে পারবে না। তার বাবা অঘোরনাথ ব্রিটিশ কোম্পানির দোকানে বড়োবাবু। এই পদ নিয়ে অঘোরবাবু যতটা গর্ববোধ করে, তার ছেলে

মতিলাল ঠিক ততটাই ঘৃণার চোখে দেখে। কোম্পানির অধীন কাজ করাকে মতিলাল গোলামী বলে মনে করে। সে তার বাবাকে মাঝে মাঝে বলে-

> "ছেড়ে দাও বাবা চাকরি। আমাদের সুর বংশ কত বড় বংশ, আর সেই বংশে জন্মগ্রহণ কোরে তুমি কিনা একটা দর্জির দোকানে গোলামী করছো।"[৩]

মতিলাল আরো বলেছে-

> "হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করি, কেন আপনি চাকরি করেছিলেন? কেন ঠাকুরদাদা মহাশয়ের ঘোটনা পাড়ার ভিটে ছেড়ে, সেখানকার চাষবাস উঠিয়ে দিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন? ঠাকুমার মুখে তো গল্প শুনেছি, যে আমাদের দেশের বাড়িতে কত সুখ ছিল, কত লোক অন্ন খেতে যেতো, কত পালা-পার্বণ হোতো! আর এই কলকেতার ইংরিজি পোড়ে, দাসত্ব করতে শিখেই বা আমরা কত সুখেই আছি।"[৪]

মতিলালের এই কথা থেকেই বোঝা যায় দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি তার কতটা আনুগত্য রয়েছে। কোম্পানির শাসনব্যবস্থায় কেউ সুখী নয় তা স্পষ্ট। বাঙালি নিজের পরিচয়, ব্যক্তিত্ব, শিল্প-সংস্কৃতি সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দিয়েছে সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে। কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করে দাসত্ব জীবনকেই অনেকে নিয়তি বলে মেনে নিয়েছিল। অথচ মতিলাল দেশের জন্য নিজের সুন্দর জীবন ত্যাগ করতে চেয়েছে, দেশের মানুষের পাশে থেকে তাদের জন্য কিছু করতে চেয়েছে। দেশহিতৈষী ভাবনা মতিলালকে আর সাধারণ বাঙালির থেকে উচ্চ উচ্চস্থানে নিয়ে গেছে। মতিলাল চরিত্রের মধ্যে এক বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। তার বাবা তাকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলে সে বলেছে- "আপনি তার জন্য কেন ভাবছেন, না হয় আমি দেশের জন্য দু'মাস জেল খাটলুম বা।" দেশের জন্য এই আত্মত্যাগ সত্যিই প্রশংসনীয়। বাবা-মায়ের প্রতি মতিলালের মন্তব্য থেকে স্বদেশচেতনার আরো পরিচয় আমরা পাই যেখানে সে বলেছে- "আমায় অনুমতি দিন যে- আমি উকিলির একজামিন দেব না। যাতে ভয়ে ভয়ে দেশের লোকে লোকে ঝগড়া বাড়ান যায়, সে ব্যবসা আমি কোরবো না। আমার ইচ্ছে হয়েছে, বিজ্ঞান শিখে শিল্পের উন্নতি কোরবো।" নাট্যকার অমৃতলাল বসু নিজে যেমন স্বদেশী আন্দোলন সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি তাঁর সৃষ্টি চরিত্র মতিলাল দেশের মানুষের জন্য সমস্ত সুখ ভোগ ত্যাগ করে দেশের যুবকদের মধ্যে স্বদেশচেতনার বীজমন্ত্র রোপন করতে চেয়েছে। দেশের প্রতিটি মানুষকে প্রথাগত শিক্ষার বাইরে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছে।

বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় শিল্পের উন্নতি ঘটানো এটাই ছিল মতিলালের স্বপ্ন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করতে উৎসাহ দিয়েছেন। প্রহসনের পঞ্চম দৃশ্যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একজন বাঙালি মেমসাহেব যখন ইংরেজদের দোকানে বিদেশি জামা কাপড় কিনতে আসে। সেই সময় মতিলাল ও তার কিছু সহপাঠী মেমসাহেবকে বিদেশি বস্ত্র কিনতে বাধা দেয়, তারা জানায় এই পণ্য কিনে কেন বিদেশিদের আর্থিকভাবে লাভবান করবেন, তার বদলে যদি দেশীয় বস্ত্র বা পণ্য কেনেন তাহলে কিছু দেশীয় ব্যবসায়ী লাভবান হবে এবং পরোক্ষভাবে দেশীয় শিল্পের অগ্রগতি ঘটবে। কিন্তু মেমসাহেব অর্থাৎ মিসেসগুপ্তা তাদের কথা মানতে চাননি তার স্পষ্ট বক্তব্য- "প্রতি মানুষ্যেরই স্বাধীন ইচ্ছা চালানোর ক্ষমতা আছে। আমার যা ইচ্ছে, আমার যা আবশ্যক সেই মতো আমি দ্রব্য সংগ্রহ করবো। তাতে কাহারও বাধা দেওয়ার অধিকার নেই।" কথাটার মধ্যে যুক্তি থাকলেও মতিলাল ও তার সহপাঠীরা সহজে হার মানে না। বিদেশি পণ্য বর্জনের মধ্য দিয়ে দেশ সেবার যে সংকল্প তারা নিয়েছে সেটা স্পষ্ট ভাবে তারা জানিয়ে দেয়-

> "আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি দেশীয় শিল্পের উন্নতির পক্ষে প্রাণপণে সাহায্য করবো, দেশের দাসত্বে জীবন উৎসর্গ করব।"[৫]

যুবকদের এই প্রতিজ্ঞার কাছে বাঙালি মেমসাহেব নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এবং দেশভক্তি দেখানোর সুযোগ পেয়ে প্রতিজ্ঞা করে যে, কোনও দিন সে বিদেশি বস্ত্র বা পণ্য ব্যবহার করবে না এবং বাড়ির সবাইকে দেশীয় পণ্য ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে।

অমৃতলাল বসু শুধুমাত্র হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে স্বদেশচেতনার প্রকাশ ঘটাননি। বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ও এ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার পরিচয় আমরা পাই প্রহসনের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে, যেখানে দেখা যায় কিছু যুবক একত্রিত হয়ে 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান দিতে দিতে গরিব ও দুঃস্থ মানুষদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করছিল। এমন সময় গোলাম উল্লাহ নামক এক মুসলমান সমাজপতি যুবকদের 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান দিতে বাধা দেয় এবং নিজেকে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে স্বদেশী আন্দোলনে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে দেয়, সে জানায়-

> "আমি এই দেশের সমস্ত মুসলমানের পক্ষ হয়ে বলছি যে, এই স্বদেশী আন্দোলন মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত নয়।"[৬]

অন্যদিকে আব্দুল শোভান একজন মুসলমান হয়েও হিন্দুদের স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করেছে এবং হিন্দু মুসলমানদের পরস্পর ভাই ভাই বলে সম্মোধন করেছে। নিজে একজন জমিদার হয়েও সাধারণ হিন্দু প্রজাদের এক মাতার সন্তান ভেবে আলিঙ্গন করেছে। যুবকদের সঙ্গে নিয়ে 'বন্দে মাতরম' জয়ধ্বনি উচ্চারণ করতে দ্বিধা বোধ করেনি। মুসলমানদের মধ্যে গোলাম উল্লাহর মতো সুবিধাবাদী মানুষজন যেমন ছিল, তেমনি আব্দুল শোভানের মত পরোপকারী ও নিঃস্বার্থ মানুষেরও অভাব ছিল না। দেশভক্ত মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে আব্দুল শোভান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রহসনের দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে নাট্যকার দেখিয়েছেন কীভাবে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়েছে সাধারণ বাঙালি পরিবারের অন্তঃপুরে। পরিবারের গৃহকর্তীরা আস্তে আস্তে বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্য ব্যবহারে আগ্রহী হয়েছে এবং এভাবেই আন্দোলনকারীদের হাত শক্ত করেছে। এই দৃশ্যে উল্লিখিত ভদ্রমহিলাগণ কামিনী, বিরাজ ও চারুবালা এদের পরস্পরের কথাবার্তায় উঠে আসে যুবকদের আত্মত্যাগের কথা। উচ্চশিক্ষিত ডিগ্রিধারী যুবকদল কোম্পানির অফিসে গোলামীর পরিবর্তে স্বনির্ভর হতে চেয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় দেশীয় বস্ত্র তৈরি করে দেশের অর্থনীতিকে শক্ত জায়গায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে। এই বিপ্লবে তারা পাশে পেয়েছে সচেতন বাঙালি গৃহবধূদের। এতদিন যারা দামি দামি শৌখিন বিদেশি পণ্য ব্যবহার করত, তারাই এখন দেশীয় পণ্যের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। তারা বুঝতে পেরেছে বিদেশি পণ্য ক্রয় করা মানে সমস্ত অর্থ বিদেশীদের হাতে তুলে দেওয়া এবং দেশীয় শিল্পের অবক্ষয় ঘটানো। তাই বাঙালি পরিবারের সমস্ত নারীগণ প্রতিজ্ঞা করেছে তাঁতিদের সঙ্গে মিশে নিজেরাই দেশীয় বস্ত্র উৎপাদন করবে। নাট্যকার অমৃতলাল বসু জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালিদের নিয়ে এক স্বনির্ভর ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন।

গানে স্বদেশীকতা: 'সাবাস বাঙালী' প্রহসনে স্বদেশী গানের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকার অমৃতলাল বসু খুব সচেতন ভাবেই এই প্রহসনে স্বদেশ চেতনামূলক গান ব্যবহার করেছেন। নাট্য সাহিত্যের স্বদেশ চেতনামূলক গানের ব্যবহার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে শুরু হয়েছিল। যদিও বাংলা সাহিত্যে গানের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই চর্যাপদের যুগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। তখন ধর্ম ও সাংস্কৃতিক চেতনার মধ্যেই গানের বিষয় সীমাবদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজদের আগমনের পরেই স্বদেশ চেতনার বিষয়টি প্রকাশিত হয়। ইংরেজ শাসনকালে দেশের মানুষের শোচনীয় দূরবস্থা, হীনমন্যতা এবং সর্বোপরি পরাধীনতার গ্লানি, স্বদেশী গান রচনার মূল অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। পরাধীনতার অপমান থেকে নিজেদের মুক্তির অভিপ্রায়ে সকলকে একাত্ম ও জাগ্রত করার নানা পথের সন্ধান শুরু হয়। এই প্রহসনে গানের ব্যবহারের মধ্য

দিয়ে নাট্যকার স্বদেশ চেতনাকে শুধুমাত্র শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলেন না, এই চিন্তা চেতনাকে দেশের সর্বশ্রেণির মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। হিন্দু মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতির বিষয়টি উঠে আসে এই গানগুলির মধ্যে। প্রহসনের শুরুতেই প্রস্তাবনা অংশে বঙ্গের সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মহিলাগণ গানের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির স্বজাত্যবোধ জাগ্রত করতে চেয়েছে। অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যানে সমবেত হয়ে তারা মুক্তকণ্ঠে গান গেয়েছে-

"আজ শুভদিনে শুভক্ষণে মাথায় নিছি বরণ ডালা।
হোলো বাঙালী ফের বাঙালী উলু দেলো বঙ্গবালা।।
(ওই দেখ) তারা পোরেছে দিশি ধুতি চাদর,
হ্যাট কোটের আর নাই কো আদর,
(এবার) বাঁদর সাজা ঘুচে গেছে দেলো সবার গলায় মালা।"[৭]

গানের এই অংশের মধ্যে ফুটে উঠেছে বাঙালি জাতির পুনরায় বাঙালি হয়ে ওঠার কথা। ইংরেজ শাসনকালে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির বিপর্যয় লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদব-কায়দা আয়ত্ত করতে গিয়ে কিছু বাঙালি যুবক নিজেদের মহান ও উদার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে ত্যাগ করেছিল। ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে গিয়ে খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, দৈনন্দিন জীবনের নানান সংস্কার পরিবর্তন করেছিল। বাঙালিয়ানা হারিয়ে যেতে বসেছিল। এই পরিবর্তন শুধু যুবকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ পরিবারের গৃহবধূরা পর্যন্ত সমাজে নিজেদের মেমসাহেব হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য বাঙালিয়ানা ত্যাগ করেছিল। নাট্যকার অমৃতলাল বসু সেই হারিয়ে যাওয়া স্বজাত্যভিমান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে গেছেন। পুনরায় স্বদেশী পণ্য, স্বদেশী বস্ত্র এবং বাঙালি আদব-কায়দার প্রতি তাদের সম্মান ফিরিয়ে এনেছেন। তাই গানের মধ্যে আমরা দেখি বাঙালি যুবকরা যখন হ্যাট, কোট ছেড়ে আবার ধুতি, পাঞ্জাবি, চাদর পড়েছে তখন মহিলাগণ তাদের বরণ ডালা নিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে গলায় মালা পরিয়ে সবাইকে বরণ করতে চেয়েছে। এ যেন এক শুভক্ষণ, বাঙালি সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের মহেন্দ্রক্ষন। নাট্যকার শুধু বিদেশি পণ্যের বিরোধিতা করেননি, পাশ্চাত্য শিক্ষারও সমালোচনা করেছেন। যে শিক্ষা মানুষকে চাকরবৃত্তিতে পরিণত করে, সেই শিক্ষাকে ধিক্কার জানিয়েছেন। বি.এ, এম.এ এবং আইন পাস করে ইংরেজ সরকারের গোলামী করাকে ঘৃণা করেছেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের জঞ্জাল জ্বালা বলে আখ্যায়িত করেছেন। গানের ভাষায়—

"ধিক ধিক ধিক বিএ, এমএ পাশ,
ডবল সেলাম দিয়ে গোলামীর আশ;
ধিক সে মামলা, ধিক সে সামলা, ধিক সে আমলা
দেশের জঞ্জাল জ্বালা।"[৮]

প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে একটা গানের উল্লেখ আছে যেখানে সমাজের সর্বনিম্নস্তরে বসবাসকারী মুচি শ্রেণির কথা বলা আছে। স্বদেশিকতার আবহে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছিল। বিদেশী পণ্যের পাশাপাশি ইংরেজ শাসক ও তৎকালীন বাবু শ্রেণির প্রতি তাদের ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে উক্ত গানে। গানের ভাষায়-

"বাবুদের জুতিটী ছিঁড়িয়ে গেলে কি হোবে।
এই মুচী বোলে ডাকলে হামায় কথাটী আর না কোবো।
বষ্টন, ডসন, ল্যাট্টিমার তাদের মুখে ঝাড়ু মার,
আরতো ও জুতিটী ভাই সিলাই কোরতে না লোবো।"[৯]

প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে জনতা চরিত্র মায়া-র কণ্ঠে একটি স্বদেশী গানের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনা প্রসঙ্গে এই দৃশ্যে দেখা যায় মতিলাল কিছু ছাত্রদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদেশি বস্ত্র পরিত্যাগ করে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারের জন্য মানুষদের সচেতন ও আগ্রহী করার কাজে উদ্যোগী হয়েছে। এমন সময় এক বাঙালি মেমসাহেব বিদেশি বস্ত্র ক্রয় করে বাড়ি ফিরছিলেন। ছাত্রদল ওই মেম সাহেবকে বিদেশি পণ্যের বদলে দেশীয় পণ্য ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করে। দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য তারা দেশের দাসত্ব জীবন উৎসর্গ করতে রাজি। ছাত্র সম্প্রদায়ের এই আত্মত্যাগ দেখে মেমসাহেব নিজের বিচারধারা পরিবর্তন করেন এবং দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারে উদ্যোগী হয়ে দেশভক্তির পরিচয় দেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মায়ার কণ্ঠে এই গান শুনতে পাওয়া যায়-

"ওগো তোরা আলো কর বঙ্গদেশের মুখ।
চেয়ে তোদের পানে আমার যেন বাড়ছে দশহাত বুক।।
ওরে আমার মায়ের বাচ্চা সব,শুনে তোদের 'মা মা' বোলে রব
কবো আর কেমন করে আমার মনে হচ্ছে কত সুখ।।
কিন্তু হাত ধরে মানা করি বাপ,পুণ্যের ভারতে আর এনো নাকো পাপ
নিজের কড়ি পুড়িয়ে দিয়ে আর বাড়িও নাকো দুখ।।"[১০]

দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের শেষ অংশে চারুবালা ও অন্যান্য ভদ্রমহিলাদের মিলিত কণ্ঠে একটি গান শোনা যায়, যে গানের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে দেশের শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় বি.এ, এম.এ পাস করে ইংরেজ সরকারের চাকরি গ্রহণ করে গোলামি করার পরিবর্তে দেশীয় শিল্পের উন্নতির কাজে ব্রতী হয়েছে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মোট বয়ে নিয়ে ধুতি, শাড়ি বিক্রি করছে। দেশীয় বস্ত্র শিল্পের উন্নতির জন্য তারা প্রাণপণে পরিশ্রম করে চলেছে। তাদের এই পরিশ্রমকে কুর্নিশ জানিয়ে এবং তাদের উৎসাহিত করতে মহিলারা গান বেঁধেছে।

"দাদারা মোট নিয়েছে মাথায়।
বেড়ায় বেচে ধুতি সাড়ী সবাই কলকাতায়।।
ওমা কোরে তিন চারটে পাশ,
ছেড়ে উকিলী কি বড় চাকরীর আশ,
হোয়ে দেশের দশের দাস, এরা ফিরচে খাতায় খাতায়।।"[১১]

প্রহসনের একেবারে শেষ অংশে চন্ডীমন্ডপে মহিলাগনের চরকা কাটতে কাটতে একটা গানের উল্লেখ রয়েছে। সেই গানের মাধ্যমেই নাটকের যবনিকা পতন হয়েছে। গানে উঠে এসেছে সর্বশ্রেণির মানুষের বিশেষ করে মহিলাগনের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার কথা। ইংরেজ শাসনের আগে বঙ্গদেশ স্বনির্ভর ছিল। দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় পণ্য দেশীয় পদ্ধতিতেই উৎপন্ন হতো। মানুষের জীবন-যাপন ছিল অতি সাধারণ। খাদ্য,বস্ত্র বাসস্থানের জন্য কোনও বিদেশি জাতির কাছে বা বিদেশি প্রযুক্তির কাছে নির্ভরশীল ছিল না। পুনরায় সেই স্বনির্ভর বাঙালি জাতি গড়তে, সর্বোপরি এক স্বনির্ভর দেশ গড়তে মহিলাগণ ডাক দিয়েছে এই গানের মধ্য দিয়ে-

"আমরা আবার কাটবো সুতো চরকাতে।
যাবনা আর সখী সেজে সভার মাঝে ফরকাতে।।
শুনেছি সেই ঠাকুর মা দিতেন নিজে ঢেঁকিতে পা,
পোড়তো নাকো এলিয়ে গতর কোনও কর্ম্ম করাতে।।
ঠাকুর পো ভাই বুঝিয়ে দিলে, প্রাণে প্রাণে গেল মিলে,

নিলে নিলে দেশের ধন, সব যাচ্চে পরের বরাতে।।
জ্যাকেট বডিস যাক উচ্ছন্ন, আমরা হবনা আর মতিচ্ছন্ন,
দেবো দেশের অন্ন কিসের জন্য বিদেশীর পেট ভরাতে।।
শুনছি এক আছে ছুতো, দেশে নাকি নাইকো সুতো,
আমরা ঘরে ঘরে কেটে সুতো দেবো তাঁতী তরাতে,
যদি বাবুরা হন লো নারাজ বিলিতী জুতা পরাতে।।"[১২]

গান ব্যবহারের মাধ্যমে নাট্যকার মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনে গানগুলি যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রহসনের সূচনা ও পরিণতি গানের সার্থক প্রয়োগের মধ্য দিয়েই ঘটেছে।

উপসংহার: ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যে বহু সাহিত্যিক নিজেদের সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে তৎকালীন পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন এবং প্রতিবাদ জানিয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক নতুন রূপে জাগিয়ে তুলেছিল। দেশের যা কিছু মঙ্গল, যা কিছু সুন্দর তাকে নতুন করে চিনে নেওয়ার তাগিদ দেখা দিয়েছিল। দৈনন্দিন জীবনকর্ম থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রেই স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে দেশীয় পণ্যের প্রতি নতুন ভাবে ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল। বিদেশি পণ্য বর্জনের মধ্যদিয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তির অর্থনীতিকে ভেঙে দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। প্রহসনে আমরা দেখি সাধারণ গৃহস্থ পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষিত যুবক এবং সর্বোপরি গ্রামের গৃহবধূরা পর্যন্ত স্বদেশী পণ্য উৎপাদনে এগিয়ে এসেছে। তবে সমগ্র বাঙালি জাতি ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করেছিল তা নয়, কিছু কিছু সুবিধাবাদী যারা ইংরেজ সরকারের কর্মচারী ছিল, যাদের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করেছিল ব্রিটিশ সরকারের ওপর, তারা বিদেশি পণ্য বর্জনে অস্বীকার করেছিল। তারা স্বদেশী আন্দোলনকে কখনোই সমর্থন করেনি। নাট্যকার অমৃতলাল বসু এই শ্রেণির চরিত্রগুলিকেও তাঁর প্রহসনে স্থান দিয়েছেন। তাদের হীন মানসিকতা ও সুবিধাবাদী চিন্তাভাবনা পাঠকদের মনে একপ্রকার ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করেছে। 'সাবাস বাঙালী' শুধুমাত্র একটি প্রহসন নয়, এটি স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাঙালি সমাজ এবং সাধারণ মানুষকে নাট্যকার যেভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তারই জীবন্ত চিত্র বলা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, অমৃতলাল। সাবাস বাঙালী। কিশোর প্রীন্টিং ওয়ার্কাস্, কলকাতা, ১৩১২।
২. সেন, সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স, সপ্তম মুদ্রণ- ১৪১৬ পৃ. ৩৫৬-৩৫৬।
৩. ঘোষ, তুষার কান্তি। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য। পৃ. ৩০১।
৪. বসু, অমৃতলাল। সাবাস বাঙালী। কিশোর প্রীন্টিং ওয়ার্কাস্, কলকাতা, ১৩১২, পৃ. ১৩।
৫. তদেব, পৃ. ২৭।
৬. তদেব, পৃ. ৩৯।
৭. তদেব, পৃ. ১।
৮. তদেব, পৃ. ১।
৯. তদেব, পৃ. ১৮।
১০. তদেব, পৃ. ৩০।
১১. তদেব, পৃ. ৬০।
১২. তদেব, পৃ. ৬২।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 541-548
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.242

ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় বৌদ্ধ নৈতিক দর্শনের আলোকে এর তাৎপর্য ও আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা

ড. সঞ্জয় পাল, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, রাইপুর ব্লক মহাবিদ্যালয়,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.01.2026; Accepted: 28.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The four Brahmavihāras Maitrī, Karuṇā, Muditā, and Upekkhā constitute the core of Buddhist ethical and spiritual philosophy. Rooted in the Buddha's teachings of non-violence, empathy, and inner purification, these four sublime states guide human consciousness toward universal harmony and liberation. Maitrī promotes unconditional love and goodwill toward all beings, eliminating hatred and enmity. Karuṇā inspires the sincere desire to alleviate the suffering of others, thus fostering an active sense of empathy and social responsibility. Muditā encourages rejoicing in others' happiness, countering jealousy and rivalry, and nurturing a spirit of collective well-being. Finally, Upekkhā teaches balance and impartiality amidst life's dualities gain and loss, praise and blame, joy and sorrow thus ensuring inner stability and wisdom.

In a world increasingly marked by violence, selfishness, and mental unrest, the practice of Brahmavihāra offers a profound path to personal and social peace. These four virtues are not merely religious ideals but universal principles of human conduct that transcend time, culture, and creed. When internalized, they transform individual consciousness and establish compassion, cooperation, and equanimity as the foundations of social harmony. Therefore, the four Brahmavihāras embody both an ethical ideal and a practical guide for achieving universal peace, psychological balance, and the ultimate realization of human goodness.

Keywords: Brahmavihāra, Buddhist Ethics, Compassion, Universal Love, Inner Peace

বৌদ্ধ ধর্ম মানবজীবনের এক গভীর মানসিক ও নৈতিক দর্শন, যার উদ্দেশ্য হলো জীবের মুক্তি, শান্তি ও সর্বজনীন কল্যাণ। বুদ্ধ মানুষের অন্তরের অশান্তি, হিংসা, লোভ, মোহ ও অহংকার থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। এই মুক্তি কেবল আধ্যাত্মিক নয়, বরং নৈতিক ও সামাজিক শান্তিরও ভিত্তি। বুদ্ধ বলেছেন-

"নহি বেরোনি বেরাণি, সমন্তীধা কুদাচনং।
অবেরেণ চ সংমন্তি, এস ধম্মো সনন্তানো।" (মহাস্থবির, শ্লোক নং-৫, ২)

অর্থাৎ "শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রুতা নিঃশেষ হয় না; কেবল অশত্রুতা বা মৈত্রী দ্বারা তা নিঃশেষ হয়।" এটাই সনাতন ধর্ম। গুণী, সহিষ্ণু, শান্তিপূর্ণ, সুখময় বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মবিহার ভাবনা অসাধারণ ভূমিকা রাখতে পারে। বৌদ্ধধর্ম দর্শন মানুষের মঙ্গল ও মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচারিত হয়েছিলো। বিশ্ব সভ্যতায় মানবতার প্রবক্তা বুদ্ধ এবং মানবতা সতত প্রকাশমান বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে। বৌদ্ধ দর্শন যে সম্পূর্ণরূপে মানবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে মুক্তির পথ দেখিয়েছে তা চিরন্তন ও শাশ্বত। মানুষের অন্তর সত্তা বিকশিত হলেই মনুষ্যত্ব, মানবিকতাবোধ

জাগ্রত হয়। মানবিকতা বিকাশে ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের অনুপম প্রকাশ ব্রহ্মবিহার ভাবনার আবেদন অনবদ্য। আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক, মানবিক গুণাবলীকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে ব্রহ্মবিহার ভাবনার অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন।

এই নীতিই ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয়ের মূল ভিত্তি। 'ব্রহ্মবিহার' বলতে শ্রেষ্ঠ, নির্দোষ, আদর্শ, মানবিক জীবন-যাপনকে বোঝায়। স্বীয় অন্তরে ও কর্মে অহিংসাবোধ বা মৈত্রী, দয়া, সাম্যভাব পোষণ, মনন ও লালন করাই হলো 'ব্রহ্মবিহার' ভাবনা। বৌদ্ধধর্ম দর্শনে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনাকে একত্রে ব্রহ্মবিহার দর্শন বা বিশুদ্ধির পথ হিসেবে অপ্রমেয় ভাবনা নামে অভিহিত করা হয়। উপর্যুক্ত কারণে বৌদ্ধ 'ব্রহ্মবিহার' অর্থ শ্রেষ্ঠ বা সাত্ত্বিকরূপে বসবাস করাকে বোঝায়। এই আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, ব্রহ্মার-আচার-আচরণরূপে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে বসবাস করাই হলো ব্রহ্মবিহার দর্শন। এ অনুভূতি প্রতিফলিত হবে আচরণীয় চারটি ধারায়।

১. মৈত্রী:

বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শনের প্রথম স্তর হলো মৈত্রী। 'মৈত্রী' শব্দের মূল অর্থ হলো সত্যগণের প্রতি প্রেম, সৌহার্দ্য ও কল্যাণের ইচ্ছা। মৈত্রী এমন এক মনোভাব, যা অন্যের প্রতি হিতভাব পোষণ করে এবং শত্রুতাকে নির্মূল করে। সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের ইতিবুত্তকে মৈত্রীকে অতি ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে। স্নেহ বা প্রীতি, সৌহার্দ্যে অনুরাগই মৈত্রীর নামান্তর। এর অর্থ হলো সকল সত্ত্বগণের প্রতি স্নেহ বা প্রীতিবহুল মৈত্রী ভাব পোষণ করা। মিত্র বা বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন কিংবা মিত্রত্বে সেরূপ প্রবর্তিত হওয়াকেই মৈত্রী নামে অভিহিত করা হয়। মৈত্রীতে লোভ, হিংসা বা দ্বেষ থাকে না, মোহ থাকে না নিঃস্বার্থতার পরিপ্রেক্ষিতে; শুধু অনাবিল প্রশান্তভাব তখন চিত্তের মধ্যে বিরাজ করতে থাকে।

মৈত্রীর বিপরীত হলো দ্বেষ, ঘৃণা ও শত্রুতা। সমাজে এই শত্রুতার উদ্ভব ঘটে স্বার্থবিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মনোভাব থেকে। যখন একজন ব্যক্তি অন্যের উন্নতি বা সাফল্যে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করে, তখন হিংসা জন্ম নেয় এবং শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধ সেই চক্র ভাঙার উপায় হিসেবে মৈত্রীর অনুশীলন শিক্ষা দিয়েছেন। বুদ্ধ মৈত্রী ভাবনার স্বরূপ সম্পর্কে সূত্তনিপাতে বলেন-

> "মাতা যথা নিযং পুত্তং আযুসা একপুত্তা মনুরকখে,
> এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং।" (মহাস্থবির ও বড়ুয়া, ৪৭)

অর্থাৎ মাতা যেমন একমাত্র সন্তানকে জীবন দিয়ে ভালোবাসেন, রক্ষা করেন অনুরূপভাবে তোমরাও সেভাবে সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে।

এই উপমা মৈত্রীর গভীরতা বোঝায়। যেমন মায়ের ভালোবাসায় কোনো শর্ত থাকে না, তেমনি প্রকৃত মৈত্রীর মধ্যেও স্বার্থ বা প্রত্যাশা নেই। মৈত্রী এমন এক নৈতিক চেতনা, যা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে সার্বজনীন মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃত মৈত্রী কোনো ইন্দ্রিয়সুখ বা তৃষ্ণা-র অনুসারী নয়। কারণ তৃষ্ণা সবসময় ব্যক্তিগত লাভের সঙ্গে যুক্ত, অথচ মৈত্রী সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। মৈত্রী দ্বারা মানুষ অন্যের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করে। এতে মানুষ নিজের মনকে পরিশুদ্ধ করে এবং জীবনের সব স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। মৈত্রী ধ্যান বৌদ্ধদের একটি প্রধান আধ্যাত্মিক অনুশীলন। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি চারদিকে মঙ্গল কামনা করেন- "সত্ত্বগণ সুখী হোন, নিরাপদ থাকুন, শান্ত থাকুন।" (করণীয় মেত্ত সুত্ত১.৮) এই অনুশীলনের ফলেই ক্রোধ, হিংসা ও আত্মকেন্দ্রিকতার পরিসমাপ্তি ঘটে।

২. করুণা:

করুণা হলো বৌদ্ধ নৈতিকতার দ্বিতীয় স্তম্ভ। সর্ব প্রাণীর প্রতি দয়া, কৃপা, পরদুঃখকাতরতা, অনুকম্পা, সহানুভূতি ইত্যাদি শব্দগুলো করুণার পরিপূরক। এরূপ চিত্ত এ করুণার সাথে সহজাত ও সংশ্লিষ্ট হয় বলে তাকে করুণাসহগত চিত্ত বলে অভিহিত করা হয়। করুণা প্রসঙ্গে বুদ্ধঘোষ, বিশুদ্ধিমাগ্গ গ্রন্থে বলেন- "পরদুঃখ অপনয়ন কামতা", অর্থাৎ অন্যের দুঃখ দূর করার প্রবল ইচ্ছা (বুদ্ধঘোষ, বিশুদ্ধিমাগ্গ, অধ্যায় ৯)। যখন কেউ অন্যের দুঃখ দেখে নিজের হৃদয়ে তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে, তখন করুণা জন্ম নেয়। এটি এক ধ্যানমূলক অবস্থা, যেখানে মানুষ অন্যের সুখের জন্য নিজের সুখও ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে।

করুণার অন্যতম দিক হলো হিংসা ও নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি। একজন করুণাশীল ব্যক্তি কখনো জীবহত্যা করে না, অন্যের দুঃখে আনন্দিত হয় না, বরং তার মুক্তির কামনা করে। যে ব্যক্তি করুণা চর্চা করে, সে ভয় ও দুঃখ উভয় থেকেই মুক্ত। এই করুণা কেবল মানবজাতির জন্য নয়, বরং সমস্ত জীবসত্তার জন্য। বুদ্ধের শিক্ষা সর্বজনীন জীবের দুঃখমোচনের উপর ভিত্তি করে। তাঁর দৃষ্টিতে করুণা মানে শুধু দয়া নয়; এটি এক গভীর জাগ্রত চেতনা, যা অন্যের কষ্ট নিজের মতো করে অনুভব করতে শেখায়। বৌদ্ধ নৈতিক দর্শনে আত্ম ও অপরের দুঃখের সমতা স্বীকার করে বলা হয়েছে- "যেহেতু সকলেই ভয় ও দুঃখকে অপ্রীতিকর মনে করে, তাই কেবল নিজের কল্যাণ নয়, অপরের কল্যাণ রক্ষাও নৈতিক কর্তব্য" (ধম্মপদ, শ্লোক ১২৯–১৩০)।

এই ভাবনা করুণার মূল ভিত্তি আত্মার সীমা অতিক্রম করে সার্বজনীন চেতনার সঙ্গে একাত্মতা। করুণা হলো চেতনাভিত্তিক। হিংসা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে পরের দুঃখ-কষ্টকে আপনাররূপে গ্রহণ করাই হলো করুণা। করুণার দুটি দিক আছে। একটি অনুভূতি প্রবণতা বা আন্তরিকতাবোধ, অন্যটি হল দুর্গতের দুর্দশা মোচনে ব্যবস্থা করা। একটি চেতনাভিত্তিক করুণা মানুষের মানবীয় গুণাবলীর একটি অন্যতম উপাদান। এটা মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়ক। বিশ্বশান্তি ও মানবিক মানব সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম উপাদান। করুণার কারণে মানুষ একে অন্যের আপদে-বিপদে এগিয়ে আসে। দুর্গত সর্বসত্ত্বের সাহায্যে এগিয়ে আসে, সাহয্যের হাত বাড়িয়ে দেন। সর্বসত্ত্বকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। এরূপে মানুষের, সমাজের, বিশ্বের প্রতি দায়িত্ববোধের জায়গা তৈরী হয়। যা মানুষের আচরণে দায়িত্বশীলতার শিক্ষা দেয়। এ করুণা ভাবনা সাধককে সামাজিক দায়বদ্ধতার শিক্ষা দেয়। এ ভাবনার দ্বারা আধ্যাত্মিকতা, মানবিকতা অর্জন করা সম্ভব হয়। এটাকে বুদ্ধের মানবিকতা, মানবতার শিক্ষা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

৩. মুদিতা:

মুদিতা হলো বৌদ্ধ নৈতিকতার তৃতীয় স্তম্ভ। 'মুদিতা' শব্দের অর্থ হলো অন্যের সুখ, সাফল্য ও সমৃদ্ধিতে আনন্দ অনুভব করা। এটি ঈর্ষা বা হিংসার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুদিতা তুষ্ট, হৃষ্ট, আনন্দিতভাব ও প্রফুল্লভাব প্রকাশ করে। পরের সুখ, সমৃদ্ধি সম্পদ, সৌভাগ্য, যশ, ঐশ্বর্য প্রভৃতিতে প্রসন্ন হওয়াই মুদিতা। ঈর্ষা, মাৎসর্যের ধ্বংস সাধন এর কৃত্য। সাধকের ঈর্ষা ও মাৎসর্যহীন মনেই উদার ও শুভ্র মনোবৃত্তির উদয় হয়। এর ঐকান্তিক অনুশীলনই মুদিতা ভাবনা। এর দ্বারা পরকে আপন করে নেওয়া যায়। মৈত্রী, করুণার সঙ্গে বোধিচিত্তে যে ইন্দ্রিয়াতীত অপরিসীম আনন্দ উৎপন্ন হয় তারই নাম মুদিতা।

মুদিতা অসন্তোষ ও ক্রোধ দূর করে হৃদয়কে প্রশান্ত করে। এটি আত্মার এক সূক্ষ্ম প্রশান্তি, যেখানে আনন্দ অনুরাগ বা স্বার্থ থেকে নয়, বরং নিঃস্বার্থ চেতনা থেকে উৎসারিত হয়। ধ্যানচর্চায় মুদিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। যখন ধ্যানকারী অন্যের সুখ, গুণ বা অর্জনের চিন্তা করেন এবং মনে প্রফুল্লতা আনেন, তখন তাঁর চিত্ত ঈর্ষামুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়। এই মনোভাবই মুদিতা ধ্যানের সার। এই মুদিতা ভাবনা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ

বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। স্বার্থান্ধতা দূরীভূত করতে সাহায্য করে। আত্মকেন্দ্রিকতা, ক্ষমতা প্রদর্শনে নিরুৎসাহিত করে। অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণের শিক্ষা দিয়ে থাকে এই মুদিতা ভাবনা। মাৎসর্য নির্মূলে সাহায্য করে, ঈর্ষার বিলুপ্তি ঘটায়। অন্যের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করলে শান্তি বিঘ্নিত হয়। এ ভাবনা অন্যের স্বার্থে আঘাত করাকে, হিংসা করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। বরং অন্যের সুখ দেখে ঈর্ষাকাতর না হয়ে সমসুখী হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়। ফলে সর্বক্ষেত্রে শান্তি বিরাজ করে। এ ভাবনা উদার হতে উদ্বুদ্ধ করে। এ ভাবনা বর্তমান সমাজ প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশিষ্ট বৌদ্ধ গবেষক শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী মুদিতা সম্পর্কে বলেন- "অপরের সুখ, সমৃদ্ধি ও সাফল্যকে আন্তরিকভাবে অনুমোদন ও আনন্দসহকারে গ্রহণ করাই হলো মুদিতা। যেমন- যুবক পুত্রের যৌবনাবস্থার স্থায়িত্ব কামনা করাকে মুদিতার প্রকৃষ্ট প্রকাশ বলা যায়।" ((মুৎসুদ্দী, ২৮৪)।

৪. উপেক্ষা:

ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয়ের শেষ স্তম্ভটি হলো উপেক্ষা। উপেক্ষার আক্ষরিক অর্থ 'সমদৃষ্টি' বা 'সমবেদনা'। এটি এমন এক মনোভাব, যেখানে মানুষ লাভ-অলাভ, যশ-অপযশ, নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি জীবনের পরিবর্তনশীল ঘটনাগুলিতে সমবস্থায় থাকতে শেখে। যে ব্যক্তি বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, সে প্রকৃত উপেক্ষাশীল। উপেক্ষা মানে উদাসীনতা নয়। এটি এক জ্ঞানমূলক স্থিতি, যেখানে আবেগের অস্থিরতা লুপ্ত হয়। উপেক্ষা মানুষকে শেখায় প্রত্যেক জীব তার কর্মফলের দ্বারা পরিচালিত। কেউ যদি মন্দ কাজ করে, সে দুঃখ ভোগ করবে; যদি সৎ কাজ করে, সে সুখ পাবে। তাই কোনো ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাত বা বিদ্বেষ পোষণ করার প্রয়োজন নেই। বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে- 'লাভ ও অলাভ, যশ ও অপযশ, নিন্দা ও স্তুতি, সুখ ও দুঃখ এই অষ্টলোকধর্মকে সমভাবে সহ্য করাই উপেক্ষা'। (খুদ্দকপাঠো, মঙ্গল সুত্তং মূল পালি)। এটা হলো লোভ ও দ্বেষ বর্জিত নিরপেক্ষ দর্শন। এটা মনের সাম্যাবস্থা। লোভ ও দ্বেষ উপেক্ষা দ্বারা ধ্বংস হয়। তিনি অষ্টলোক ধর্মে মনের সাম্যাবস্থা বজায় রাখেন। সমাধি প্রবণ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে অবলম্বন, অনুশীলন দ্বারা উপেক্ষা দর্শনে উন্নীত হয়। এর উৎপত্তি, প্রবৃদ্ধি এবং ভাবনায় পূর্ণতার জন্য বস্তু ও প্রাণীর প্রতি উপেক্ষাভাব পোষণ। নিম্নোক্ত চারটি বিষয় দ্বারা উপেক্ষাভাবের জাগরণ ত্বরান্বিত হতে পারে। (ভিক্ষু ও থের, ৫২)

- প্রাণীর প্রতি বিরাগ বা উপেক্ষাভাব, উন্নতি বিচার শক্তি ও অনুভূতির ভাব।
- বস্তুর প্রতি বিরাগ বা উপেক্ষা।
- নিজের বা স্বামীর প্রতি বিরাগ বা উপেক্ষা।
- দাম্ভিক বা স্বার্থপর ব্যক্তি বর্জন দ্বারা।

এই ধরনের ব্যক্তি নিজের ব্যবহার্য সামগ্রী কাউকে প্রদান করতে আগ্রহী নয়। কেউ কিছু চাইলে সে দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে অথবা কার্পণ্যবশত প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যকে বিমুখ করে তোলে। এ ধরনের সঙ্গ পরিত্যাগ যোগ্য, কারণ এতে উপেক্ষা ভাবের ক্ষয় ঘটে। উপেক্ষা চিত্তের একাগ্রতা, অন্তর্লীনতা এবং উত্তেজনার সমতা রক্ষা করে সম্বোধি উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। এটি আলম্বনের প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব ও বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞানের প্রকাশকে নির্দেশ করে। এই অর্থে উপেক্ষা হলো জ্ঞানসম্পৃক্ত শোভন চিত্তের এক বিশেষ অবস্থা। এখানে উপেক্ষা বলতে তত্রমধ্যস্থতা বা সমবস্থানের ভাবকেও বোঝানো হয়েছে। এই সমবস্থায় অধিষ্ঠিত উপেক্ষাশীল ব্যক্তি জীবনের দ্বন্দ্ব ও দোলাচল অতিক্রম করে শান্তিতে অবস্থান করেন। গীতায় যেমন বলা হয়েছে- "স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সুখে ও দুঃখে, লাভে ও ক্ষতিতে, জয়ে ও পরাজয়ে সমানভাবে অবিচল", (ভগবদ্গীতা- ২/৫৬)। এই শিক্ষার সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের গভীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। উপেক্ষার অনুশীলন মানুষকে জ্ঞানলাভের পথে অগ্রসর করে, অহংকার ও আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করে এবং মনকে মুক্ত ও স্বাধীন করে তোলে। ফলে উপেক্ষাশীল ব্যক্তির মধ্যে সহনশীলতা, নিরপেক্ষতা ও অন্তঃশান্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. ব্রহ্মবিহারের উপযোগিতা:

বুদ্ধের ধর্ম মূলত মানবকল্যাণমুখী। তিনি চতুরার্যসত্য ও মধ্যমার্গ প্রচার করে দুঃখ থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। তাঁর নৈতিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সহমর্মিতা, দয়া, প্রেম ও সমদৃষ্টি। এই চারটি গুণ- মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা একত্রে ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় নামে পরিচিত। "ব্রহ্মবিহার" শব্দের অর্থ 'দিব্য' বা 'মহৎ আবাস'। অর্থাৎ এমন এক মানসিক অবস্থান যেখানে মন স্বার্থ, হিংসা, লোভ, বিরাগ প্রভৃতি অশুভ প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত থাকে।

এই চারটি গুণ একে অপরের পরিপূরক। মৈত্রী প্রেম শেখায়, করুণা সহানুভূতি শেখায়, মুদিতা আনন্দ শেখায় এবং উপেক্ষা সমবোধ শেখায়। যদি মৈত্রী দ্বারা বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়, তবে করুণা সেই বন্ধুত্বে সহমর্মিতা যোগ করে; মুদিতা সেই সহমর্মিতাকে আনন্দে রূপান্তরিত করে; আর উপেক্ষা সেই আনন্দকে স্থায়িত্ব দেয়। বুদ্ধের মতে, এই চারটি মনোবৃত্তি বিকাশিত হলে চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়, মন নরম হয়, ক্রোধ ও হিংসা বিলুপ্ত হয়। মানুষ তখন নিজের ও অন্যের মধ্যে বিভাজন অনুভব করে না। এই চার গুণের মাধ্যমে মানুষ চতুর্ব্রহ্মবিহার স্থিতি অর্জন করে, যা নির্বাণের পথে একটি অপরিহার্য ধাপ। তাই বলা হয়েছে 'যে ব্যক্তি মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা সমানভাবে চর্চা করেন, সে জগতে ব্রহ্মলোকের অধিকারী হয়'। (দিঘ নিকায়- 'তেবিজ্জ সুত্ত'-১৩) নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রহ্মবিহারের উপযোগিতা অপরিসীম। সেগুলি হল-

ক. ব্যক্তিগত পর্যায়ে: এগুলি চিত্তশুদ্ধির সাধনায় সহায়ক। ক্রোধ, হিংসা, লোভ প্রভৃতি বিকার দমন করে আত্মিক প্রশান্তি এনে দেয়।

খ. সামাজিক পর্যায়ে: মৈত্রী ও করুণা সামাজিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। মুদিতা অন্যের অগ্রগতিতে আনন্দিত হতে শেখায়, ফলে সমাজে ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব হ্রাস পায়।

গ. আধ্যাত্মিক পর্যায়ে: উপেক্ষা চিত্তকে সমবস্থায় স্থিত রাখে, যা ধ্যান ও নির্বাণলাভের জন্য অপরিহার্য।

এই চারটি গুণ বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের মৌলিক ভিত্তি। নৈতিকতার উদ্দেশ্য কেবল বাহ্যিক আচরণ নয়, অন্তরের শুদ্ধি সাধন। ব্রহ্মবিহার সেই অন্তরের শুদ্ধিরই পথ। যিনি এই গুণগুলির অনুশীলন করেন, তাঁর মধ্যে আর ক্রোধ, হিংসা বা মোহের স্থান থাকে না।

অতএব বলা যায় ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় মানবধর্মের সর্বোচ্চ রূপ। এগুলি নৈতিকতা, করুণা ও সহমর্মিতার মেলবন্ধন, যা ব্যক্তি, সমাজ ও জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। বুদ্ধের দৃষ্টিতে সত্যিকার ধর্ম সেই, যা সকল জীবের কল্যাণে নিবেদিত। ব্রহ্মবিহার সেই ধর্মেরই নৈতিক প্রতিফলন।

৬. আধুনিক সমাজে ব্রহ্মবিহারের প্রাসঙ্গিকতা:

বৌদ্ধ ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো জীবের দুঃখ থেকে মুক্তি ও সর্বজনীন শান্তির প্রতিষ্ঠা। এই মুক্তি কেবল আধ্যাত্মিক নয়, নৈতিক ও সামাজিক শান্তিরও প্রতীক। বুদ্ধের প্রচারিত ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা মানবজীবনের নৈতিক ও মানসিক বিকাশের এমন এক আদর্শ ব্যবস্থা, যা আজকের আধুনিক সমাজেও গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। বর্তমান যুগে প্রযুক্তিগত উন্নতি, বস্তুবাদী আকর্ষণ, প্রতিযোগিতা, হিংসা ও বিভাজনের মধ্যেও মানুষ ক্রমশ মানসিকভাবে ক্লান্ত ও অস্থির হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে ব্রহ্মবিহারের শিক্ষাগুলি মানবসমাজের নৈতিক পুনর্জাগরণের এক কার্যকর দিশা দেখাতে পারে।

মৈত্রীর প্রাসঙ্গিকতা আধুনিক সমাজে অপরিসীম। আজকের যুগে ব্যক্তি-মানুষ ক্রমে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়েছে, মানুষ মানুষকে সন্দেহের চোখে দেখে। এই পরিস্থিতিতে মৈত্রী বা সর্বজনীন প্রেমের অনুশীলন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সৌহার্দ্য ও সহাবস্থানের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। মৈত্রী শেখায়

"সব সত্ত্বগণ সুখী হোন, নিরাপদ থাকুন", (করণীয় মেত্ত সুত্ত১.৮)। এই চেতনা যদি শিক্ষাব্যবস্থা, পরিবার ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে গৃহীত হয়, তবে হিংসা ও বিভেদ হ্রাস পাবে, এবং সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।

করুণা আজকের সমাজে মানবিকতার পুনর্নির্মাণের এক প্রধান শক্তি হতে পারে। আধুনিক মানুষ স্বার্থপরতা, প্রতিযোগিতা ও ভোগবাদের চাপে অন্যের দুঃখের প্রতি সংবেদনশীলতা হারাচ্ছে। করুণা মানুষকে শেখায় অন্যের দুঃখ নিজের মতো করে অনুভব করতে এবং তা দূর করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করতে। করুণা সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও সমতার ভিত্তি গড়ে তোলে। যদি রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতারা করুণার নীতি অনুসরণ করেন, তবে সমাজে হিংসা, যুদ্ধ ও শোষণ অনেকাংশে কমে আসবে। করুণা কেবল আবেগ নয়; এটি এক কার্যকর নৈতিক প্রেরণা, যা সামাজিক পরিবর্তনের শক্তি সৃষ্টি করে।

মুদিতা আধুনিক সমাজে ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার বিকল্প দর্শন। আজকের মানুষ প্রায়ই অন্যের সাফল্যে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে, ফলে জন্ম নেয় হিংসা ও অসন্তোষ। মুদিতা শেখায় অন্যের সুখ ও সাফল্যে আনন্দিত হতে, যা মানসিক প্রশান্তি ও সামাজিক ঐক্য আনে। যদি মানুষ মুদিতা অনুশীলন করে, তবে প্রতিযোগিতা সহযোগিতায় রূপান্তরিত হবে, এবং সমাজে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হবে।

উপেক্ষা আধুনিক জীবনের মানসিক ভারসাম্যের জন্য অপরিহার্য। আজ মানুষ লাভ-ক্ষতি, সাফল্য-ব্যর্থতা, প্রশংসা-নিন্দা, সুখ-দুঃখের দোলাচলে ক্রমাগত অস্থির। উপেক্ষা শেখায় এই দ্বৈততার মাঝেও সমবুদ্ধ ও স্থিতিশীল থাকা। এটি মানুষকে মানসিক দৃঢ়তা, সহনশীলতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয়। আধুনিক জীবনের স্ট্রেস, উদ্বেগ ও বিষণ্নতা দূরীকরণে উপেক্ষা এক কার্যকর মানসিক চিকিৎসা হতে পারে।

ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় কেবল ব্যক্তিগত সাধনা নয়, এটি সামাজিক শান্তি ও মানবসম্পর্কের পুনর্গঠনের দর্শন। বর্তমান বিশ্বে ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও মতাদর্শের বিভাজন ক্রমশ বাড়ছে। এই বিভাজন দূর করতে ব্রহ্মবিহারের শিক্ষা প্রয়োজন যা মানুষকে শেখায় সব জীবের প্রতি সমান ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে।

উপসংহার:

ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের এমন এক চিরন্তন শিক্ষা, যা মানবজীবনের নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারটি গুণ একসঙ্গে মানুষের মনকে পরিশুদ্ধ করে এবং সমাজকে শান্তি ও সৌহার্দ্যের পথে পরিচালিত করে। বুদ্ধের দর্শনে ধর্ম কেবল কোনো আচার বা উপাসনা নয়; এটি এক জীবন্ত নৈতিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে মানুষ আত্মশুদ্ধি অর্জন করে এবং অপরের মঙ্গলসাধনে নিবেদিত হয়। এই চারটি ব্রহ্মবিহার মানুষের মধ্যে অহংকার, লোভ, হিংসা ও বিদ্বেষের প্রবণতা দূর করে। ফলে ব্যক্তি নিজেকে অশুভ প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত করে চিত্তশান্তি ও আত্মোন্নতির পথে এগিয়ে যায়। ব্রহ্মবিহারের শিক্ষা ব্যক্তি-মানুষকে শেখায় অন্যের সুখে সুখী হতে, অন্যের দুঃখে দুঃখিত হতে এবং জীবনের উত্থান-পতনের মধ্যেও সমবুদ্ধ থাকতে। এই চারটি গুণ এমনভাবে পরস্পর পরিপূরক যে, এগুলি একত্রে মানবধর্মের পরিপূর্ণ রূপ প্রদান করে। ব্রহ্মবিহারের চর্চা মানেই নিজের ভেতরের শুভবোধকে বিকশিত করা যা বুদ্ধের নির্বাণধর্মী জীবনদর্শনের কেন্দ্রে অবস্থান করে।

আধুনিক বিশ্বে, যেখানে মানুষ বস্তুগত উন্নতির মোহে আত্মিক শান্তি হারিয়ে ফেলেছে, সেখানে ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় এক নতুন মানবিকতার দিশা দেখায়। প্রযুক্তি, প্রতিযোগিতা ও ক্ষমতার মোহ মানুষকে বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক ও নির্দয় করে তুলেছে। ফলে সমাজে বেড়েছে হিংসা, অসহিষ্ণুতা ও মানসিক অস্থিরতা। এই পরিস্থিতিতে ব্রহ্মবিহারের শিক্ষা একপ্রকার নৈতিক পুনর্জাগরণের আহ্বান। মৈত্রী শেখায় প্রেম ও সৌহার্দ্য, করুণা শেখায় সহানুভূতি ও দুঃখমোচনের ইচ্ছা, মুদিতা শেখায় অন্যের আনন্দে অংশীদার হওয়া, আর উপেক্ষা

শেখায় মানসিক স্থিতি ও সমবেদনা। যদি এই গুণগুলি আধুনিক জীবনের অংশ হয়ে ওঠে, তবে সমাজে পুনরায় প্রতিষ্ঠা পাবে সহাবস্থান, মানবতা ও শান্তি। রাষ্ট্র, ধর্ম, অর্থনীতি ও শিক্ষা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্রহ্মবিহারের নীতি প্রয়োগ করা গেলে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও নৈতিক ঐক্য বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং বলা যায়, ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় কেবল প্রাচীন ধর্মীয় আদর্শ নয়, এটি এক বিশ্বজনীন নৈতিক দর্শন যা অতীতের মতো আজও প্রাসঙ্গিক এবং ভবিষ্যত মানবসভ্যতার নৈতিক ভিত্তি স্থাপনে অপরিহার্য।

এইভাবে ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় বৌদ্ধ নৈতিক দর্শনের আলোকে এর তাৎপর্য ও আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে আলোচনা করে দেখালাম।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চৌধুরী, সুকোমল। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৯৯৭।
২. দত্ত, নারায়ণ। বুদ্ধের জীবন ও বাণী। বিশ্বভারতী প্রকাশন, শান্তিনিকেতন, ২০০৪।
৩. দত্ত, মণীন্দ্রনাথ। বৌদ্ধ নীতিতত্ত্ব ও মানবধর্ম। আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫।
৪. পূর্ণানন্দ, শ্রমণ অনূদিত, বিশুদ্ধিমার্গ। কলকাতা, ১৯৩৬।
৫. বাগচী, দীপক কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০০৯।
৬. বাগচী, দীপক কুমার। ভারতীয় নীতিবিদ্যা। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১৮।
৭. ব্রহ্মচারী, শ্রীশীলানন্দ, বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা। জেতবন বিহার পরিষদ, বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনা ট্রাস্ট, দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা।
৮. বুদ্ধঘোষ, বিশুদ্ধিমাগ্গ। নবম অধ্যায় (ব্রহ্মবিহার), ভিক্ষু ঞাণমোলি অনূদিত, বৌদ্ধ পাবলিকেশন সোসাইটি।
৯. ভট্টাচার্য, বিনয়কুমার। বৌদ্ধ দর্শন ও নৈতিকতা। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা, ২০০৮।
১০. ভট্টাচার্য, মৃণালকান্তি। বৌদ্ধ চিন্তা ও আধুনিক সমাজ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১।
১১. ভিক্ষু, শ্রীমৎ বুদ্ধবংশ অনূদিত ও থের, শ্রীমৎ তিলোকাবংশ সম্পাদিত, অভিধর্ম পিটকে সঙ্গায়ন-প্রশ্ন। প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী, চট্টগ্রাম, ৩০শে মে, ২০১১।
১২. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮।
১৩. মহাস্থবির, শান্তরক্ষিত, বৌদ্ধ সাধনা নীতি। চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৫ শে জুলাই ২০১০।
১৪. মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার অনূদিত। ধর্মপদ। কলকাতা, ১৯৫৪।
১৫. মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত। বৌদ্ধ তত্ত্বচিন্তা। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯।
১৬. মুৎসুদ্দী, শ্রীবীরেন্দ্রলাল অনূদিত ও সম্পাদিত, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ বা সংক্ষিপ্তসার অভিধর্ম। চট্টগ্রাম, ১৮ জুলাই ১৯৪০।
১৭. সামন্ত, বিমলেন্দু। নীতিতত্ত্ব। স্মার্ট বুকস্, কলকাতা, ২০২১।
১৮. Bodhi, Bhikkhu, translator. The Suttanipāta. Wisdom Publications, 2017. Karaṇīya Mettā Sutta (1.8).
১৯. Buddhaghosa. (2010). Visuddhimagga (The Path of Purification) (Bhikkhu Ñāṇamoli, Trans.). Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society. (Chapter IX: Brahmavihāra—Karuṇā).
২০. Gethin, Rupert. The Foundations of Buddhism. Oxford University Press, 1998.
২১. Harvey, Peter. An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices. Cambridge University Press, 2013.
২২. Hiriyanna, M., Outlines of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass, 2000.

২৩. Keown, Damien. Buddhism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2000.
২৪. Rahula, Walpola. What the Buddha Taught, Grove Press, 1974.
২৫. Sharma, Chandradhar, A Critical Survey of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass, 1960.
২৬. Sinha, Jadunath, Indian Philosophy, Vol-II, Motilal Benarsidass, Delhi, 2006.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 549-556
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.243

ব্রহ্মবিহারভাবনা: এক অভিনব ভাবনা

তনুজা খাতুন, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক-১, বারুইপুর কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 01.07.2025; Accepted: 31.12.2025; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The subject of philosophy is the search for truth and establishing truth in life. Indian philosopher did not stop at discussing the theoretical aspect of truth but also discussed its practical aspect of truth. Gautam Buddha, the founder of Buddhist philosophy discusses various aspect that are useful for life. The idea of Brahmabihar is inherited in the nature of Samyak Samadhi, which is the thought of Buddha. 'Maitri', 'Mudita', 'Karuna', 'Upekhya' the four-fold chitya vihara, in each of the vihar are called 'Brahmanang-sahavyatay-mag-go' (the path to attending the companionship a of bramha), 'Bramhalok-sahavyatay-mag-gong' (the path to attending the companionship of brahmalok) and the idea of Bramhavihar by Budhadeb. Brahmabihar is to express the feeling of free, boundless love and affection for all the people without anger, jealousy or hostility. Doing good to others, serving them without self-interest, care for others is called human Dharma. The essence of every religion and philosophy is to do good to living beings. The way to reach this goal is to abandon one 's own interest and wish happiness for others true love affection friendship and then find satisfaction in happiness. This human religion is hidden in the brahmabihar thoughts spoken by the Buddha. If a person practices this fourfold thought within himself then his mind will be pure and he will exist in a blissful state with an innocent image like Brahma. I think that, practicing these bhabna or thoughts spoken by the Buddha has become very useful in the present selfish society.

Keywords: Maitri, Mudita, Karuna, Upekhya, Humam dharma

ভারতীয় দর্শনে দুটি ধারা আছে- একটি আস্তিক ধারা, অন্যটি নাস্তিক ধারা। আস্তিক তারা যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আর যারা নাস্তিক তারা ঈশ্বরের বিশ্বাসী নয়। আর যেহেতু তারা ঈশ্বরের বিশ্বাসী নয়, সেহেতু তারা ধর্ম, কর্ম নীতি- নৈতিকতা এগুলি কোনটি স্বীকার করে না, অন্ততঃ সাধারন মানুষ হয়তো তেমন ভাবতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে নাস্তিক বলতে কিন্তু ঠিক তেমনটি বোঝায় না। বেদের প্রামাণ্যে যারা আস্থাশীল তারা হলেন আস্তিক আর যারা বেদের প্রামাণ্যে আস্থা জ্ঞাপন করে না তারাই নাস্তিক। এই নাস্তিকেরা ঈশ্বরের বিশ্বাস করেন না বলেই তারা নাস্তিক নয়। কারণ যাদের আমরা আস্তিক বলে জানি তাদের মধ্যেও সাংখ্য মীমাংসা প্রভৃতি সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। নাস্তিকেরা যেমন ঈশ্বরের বিশ্বাস করে না তেমন বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাস করে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় নৈতিকতায় আস্থাশীল। এই নৈতিকতা ঈশ্বরবিহীন বা শাস্ত্রবিহীন নৈতিকতা এবং এই নৈতিকতা ঈশ্বরবিহীন বা শাস্ত্রবিহীনভাবেও গড়ে উঠতে পারে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমরা পাই দুটি দর্শনে- এক জৈন দর্শন আর

এক বৌদ্ধ দর্শন। এই দুটি দর্শনে মুক্তি কে স্বীকার করা হয়েছে। মুক্তি লাভের পথে নৈতিক কর্ম অনুষ্ঠান করার কথাও বলা হয়েছে। নৈতিক কর্ম না করলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না, আর চিত্তশুদ্ধি না হলে নির্বাণ লাভ হয় না- এটি বৌদ্ধমত। চিত্তশুদ্ধি করার লক্ষ্যে যে নৈতিক আচার অনুষ্ঠানের বিধান দিয়েছেন তার পরিচয় আমরা পাই। সত্যি বলতে কি বুদ্ধদেব তথাগতভাবে কখনোই তাত্ত্বিক প্রশ্নে আগ্রহী ছিলেন না। তার কাছে মানব সমাজই মুখ্য। মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করাই তারা আসল লক্ষ্য ছিল এবং সেটাই তিনি করে গেছেন। মানুষের আত্মশুদ্ধি চিত্তশুদ্ধি বা নির্বাণ লাভের পথে আগ্রহী হওয়ার জন্য সমাজের দিকে তাকাতে হবে, মানুষের দিকে তাকাতে হবে। সেই মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি শীলের বিধান দিয়েছেন। তেমনি ব্রহ্মবিহারের বিধান দিয়েছেন। আমার এই আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত ব্রহ্মবিহারের উপরেই আলোকপাত করা হবে এবং সেই ব্রহ্মবিহার ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেটাও দেখানোর চেষ্টা করা হবে।

শীল শব্দের অর্থ সব রকমের পাপ থেকে বিরত থাকা, আবার শীল শব্দের আরেকটি অর্থ হল কতগুলি নিয়ম নীতি মেনে চলা। ইংরেজিতে যাকে Morality বলে। বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকে উল্লেখ আছে- 'বিনয় নাম বুদ্ধ আয়ু বিনয় ঠিতে শাসনং ঠিতো হোতি', অর্থাৎ শীল বা বিনয় বুদ্ধ শাসনের আয়ু স্বরূপ। বিনয়ের স্থিতিতেই বুদ্ধ শাসনের স্থিতি নির্ভরশীল। ব্যক্তির জীবনের নৈতিক উৎকর্ষতা ছাড়া জীবনের সফলতা আসে না, সেজন্য বৌদ্ধ দর্শনে নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে আর চারিত্রিক কল্যাণ সাধনই প্রত্যেক মানুষের নৈতিক দায়িত্ব।

ব্যবহারিক জগতে মানুষের জীবন বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় শীল সমাধি এবং প্রজ্ঞার অনুশীলনের দ্বারা। যখন ব্যক্তির জীবন সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় তখন তার সমস্ত কামনা-বাসনা বিনষ্ট হয়। এই অবস্থাতেই ব্যক্তি এক আনন্দঘন অবস্থায় বিরাজ করে। তখন ব্যক্তির মধ্যে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়, প্রজ্ঞার অধিকারী হয় সে। এই যথার্থ জ্ঞান হল– দুঃখ, দুঃখের কারন, দুঃখ বিনাশ করা সম্পর্কে জ্ঞান। এই প্রজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি কে অরহৎ বলা হয়। বৌদ্ধ দর্শনে শীল কথাটিকে নৈতিক শুদ্ধতা ও চারিত্রিক শূচিতা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।[১] সে অর্থে শীল যেমন অন্তরকে শুদ্ধ করে ঠিক তেমনি বাহ্যিক আচরণকে শুদ্ধ করে।

বুদ্ধদেবের মতে মনুষ্য জীবনের মূল লক্ষ্যই হল দুঃখ মুক্তি। তার মতে অবিদ্যা বা যথার্থ জ্ঞানের অভাবে দুঃখের মূল কারণ। যদি কোন ব্যক্তি এই চারটি মহান সত্যের জ্ঞান লাভ করে তাহলে তার দুঃখমুক্তি সম্ভব। এই চারটি মহান সত্য হলো জীবন দুঃখময়, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব, দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে। দুঃখ নিবৃতির পথকে বৌদ্ধ দর্শনে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়েছে। বৌদ্ধ নীতি তত্ত্ব এই আটটি পথের মধ্যে নিহিত আছে। এ একটি পথ হল সৎদৃষ্টি, সৎসংকল্প, সৎবাক, সৎকর্ম, সৎজীব সৎব্যয়াম, সৎ স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। উপরিউক্ত সাতটি পথ অনুসরণ করলে ব্যক্তির চিও শান্ত হয়, সংযত হয়। চিত্ত বিষয়ের সাথে একাত্ম হয়। শান্ত অবস্থায় বিরাজ করে এমন অবস্থায় সাধক নির্মাণ লাভ করে অর্থাৎ তার দুঃখের মুক্তি হয়। সম্যক সমাধির চারটি স্তর আছে প্রথম স্তরে বিচার বিতর্ক করা হয় এই স্তরের সাধক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি মনকে স্থিত করে। এটি মনকে আসক্তি শূন্য হতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় স্তরে কোন প্রকার সংশয় থাকে না সমস্ত বিচার বিতর্কের অবসান ঘটে। তৃতীয় স্তরে মন আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে এবং শেষ স্তরে আসক্তি শূন্য

[১] প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত ও পীযুষ কান্তি ঘোষ, নীতি শাস্ত্র ও ধর্ম দর্শন, ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃ ৬৬

হয়ে মনে এক উদাসীন ভাবের উদ্ভব হয়। শীলের যথাযথ অনুশীলন দ্বারা সাধক এমন অবস্থায় উপনীত হতে পারে। ধ্যানের শেষ স্তরে কোন প্রকার দৈহিক মানসিক চেতনা না থাকায় শুদ্ধ চৈতন্য বিরাজ করে এ অবস্থা মানব জীবনের এক তুরীয় অবস্থা নির্বাণের অবস্থা। নির্বাণ মানে নির্বাপন বা নিভে যাওয়া, এ অর্থে নির্বাণ হলো অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। এমন অবস্থা হল মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ। এমন অবস্থায় ব্যক্তি সমস্ত রকমের কর্ম বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হয়। সূও নিপাতে বলা আছে যে নির্মাণ লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি সর্বদা এমন কামনা করেন যে সমস্ত প্রাণী গন সুখী হোক ক্ষমাবান হোক। প্রাণীগনের প্রতি হিংসা, দ্বেষ পরিহার করার জন্য, মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ নির্বাণ লাভের জন্য ভগবত ধর্মের মত বৌদ্ধ ধর্মে মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা পরায়ণ হওয়ার বিধান আছে।[২] লোভ, দ্বেষ, মোহ, সন্দেহ, ঈর্ষা প্রভৃতি ঘৃণ্যতম ক্রিয়া থেকে মুক্তি পেতে, অন্তরকে মুক্ত করতে বুদ্ধদেব চারটি মহৎ গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন- সম্মিলিতভাবে এগুলিকেই বলা হয় ব্রহ্মবিহার।

দীঘানিকায় বুদ্ধদেব ব্রহ্মবিহারের আরেক অর্থ দেখিয়েছেন তা হলো অভ্যাস। যে অভ্যাস বিমুখ নয়, বিরাগ নয়, নীরবতা নয় থেমে যাওয়া নয় নির্বাণ নয়।[৩] শুধুমাত্র ব্রহ্ম জগতে পুনর্জন্ম। একজন ইন্দো তর্কবিদ তিনি বলেন পালি ভাষায় ব্রহ্মবিহার হল একটি জাগ্রত মানসিক অবস্থা এবং এটি অন্যান্য প্রাণীর প্রতি এক সহানুভূতির মনোভাবকে নির্দেশ করে তিনি বলেন বুদ্ধদেব শিখিয়েছিলেন যে দয়া মুক্তির উপায়। যেখানে থাকে সীমাহীন প্রেম।[৪] অংগুত্তায়নিকায় বুদ্ধদেব বলেন যে মানুষ এই ব্রহ্মবিহারের অনুশীলন করে ব্রহ্মবিহারের ভাবনাকে জীবনে ধারণ করে এবং এ ধারণাকে আমৃত্যু বহন করে তারাই পরবর্তী জীবনে স্বর্গীয় রাজ্যে পুনর্জন্মের জন্য নির্ধারিত হয়।

ব্রহ্মবিহার কথাটির অর্থ বিবিধ- যেমন ব্রহ্মের আবাসস্থল, স্বর্গীয় অবস্থা, চরম অবস্থা জীবনের প্রশান্তিররূপ বা প্রকার। ব্রহ্মবিহার এই শব্দটির মধ্যে দুটি শব্দ আছে এক হল ব্রহ্ম অন্যটি বিহার। তাহলে প্রথমেই আমাদের জেনে নেয়া দরকার যে বৌদ্ধ দর্শনে ব্রহ্ম বলতে কী বোঝানো হয়? উপনিষদে ব্রহ্মকে পদ ও ধাম বলা হয়েছে আরও বিশেষভাবে বললে মহৎ পদ বলা হয়েছে। উপনিষদ মতে সকল কিছু ব্রহ্ম থেকে জাত এবং প্রলয় কালে সকল কিছুই ব্রহ্মতেই লয় প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ উপনিষদে ব্রহ্ম পরম এবং মহৎ আবার ব্রহ্ম সকল কিছু আধার বা আশ্রয়, তাই তা ধাম ও। ব্রহ্ম বিশ্বরূপ সুতরাং বিশ্বধাম। বেদে ব্রহ্মকে প্রধান বলা হয়েছে 'আনংনদাদয়ঃ প্রধানস্য'। আচার্য শংকরাচার্য বলেছেন যাই প্রধান তাই ব্রহ্ম। প্রধানের আনন্দদায়ী ধর্ম হলো তা আনন্দ স্বরূপ, বিজ্ঞান ঘনত্ব সর্বগতত্ব সর্বতমকত্ব। শ্রুতিতে বলা হয়েছে 'আকাশ শরীরং ব্রহ্ম' অর্থাৎ ব্রহ্ম আকাশ সম। ভগবত শাস্ত্রে বলা হয়েছে ব্রহ্ম অগ্নিসম ব্রহ্মকে অগ্নির সাথে তুলনা করা হয়েছে। ব্রহ্মের এই বহুবিধ অর্থ থাকলেও বৌদ্ধ মতে ব্রহ্মকে প্রশান্তি উৎকৃষ্ট বা প্রধান সর্বোচ্চ প্রভৃতি শব্দের সাহায্যে বুঝতে হবে। ব্রহ্মকে পরম সত্ত্বা বলা হয়েছে। ব্রহ্ম সীমাহীন আকাশের ন্যায় অসীম অগ্নির ন্যায় স্বচ্ছ বিশুদ্ধ। অর্থাৎ বৌদ্ধ দর্শনে ও ব্রহ্মের মধ্যে শুভ ও সৎচিন্তা অবস্থান। আর বিহার মানে বাস করা, বেঁচে থাকা। কাজেই যেসব মানুষেরা ব্রহ্মের ন্যায় জীবন যাপন করেন তারাও সৎচিন্তা শুভবুদ্ধির অধিকারী হন। রবীন্দ্রনাথ তার শান্তিনিকেতন নামক গ্রন্থে ব্রহ্মবিহারভাবনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের একান্ত অনুরাগী ছিলেন তিনি ব্রহ্মবিহার ভাষণে লিখছেন-

---

[২] স্বামী বিদ্যারন্য, বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৯, পৃ ১০১

[৩] The Buddha, Digha Nikaya, II.251 Harvey B. Aronson

[৪] Bijoy kumar Sarkar, Buddhist concept of bramabihar-An Analysis of moral. Research Review international journal multidisciplinary, ISSN-2455-3085

> "মনে ক্রোধ, দ্বেষ, লোভ, ঈর্ষা থাকলে মৈত্রী ভাবনা সত্য হয় না- এজন্য শীল গ্রহণ শীল সাধন প্রয়োজন। কিন্তু সেই সাধনার পরিনাম হচ্ছে সর্বোচ্চ মৈত্রী কে বাধাহীন করে বিস্তার। এই উপায়েই আত্মাকে সকলের উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।"[৫]

ব্রহ্মবিহারের অর্থ উত্তম এবং শ্রেয়। ব্রহ্ম বা নৈতিকতার অর্থ এক উৎকৃষ্ট অবস্থা। এখানে অবস্থান করাই হলো ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মবিহার বলতে সাত্ত্বিক রূপকে বোঝায়। অন্যভাবে বললে ব্রহ্মবিহার ভাবনায় ব্যক্তি এমন আচরণ ও গুণাবলীর অধিকারী হয় যে তার মধ্যে সর্বজীবের প্রতি প্রেম প্রীতি ভালবাসা বোধ জাগ্রত হয়। ব্রহ্মবিহারের এই চারটি গুণাবলী আবেগের অপরিমানযোগ্য ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় যা সারা জগত পরিব্যাপ্য করে থাকে তাই তাদের অপ্পামন্ন বলা হয়।[৬] এগুলি পরিমাপ যোগ্য নয় তাই এর কোন সীমা নেই। তাই তা অসীম। বুদ্ধ ঘোষ ব্রহ্মবিহার কে বিশুদ্ধিমাজ্ঞ বলেছেন। সকল জীবের প্রতি মমত্ববোধ, পূণ্যবানকে দেখে আনন্দিত হওয়া, পীড়িতের প্রতি করুনাও সহানুভূতি, অসৎ অহংকারী ব্যক্তির প্রতি সহনশীল হওয়াই পরম ধর্ম। এটি হল বৌদ্ধ নীতি, তাই হল ব্রহ্মবিহার ভাবনা। ভাবনার অনুশীলন বা চর্চা নির্বাণ ইচ্ছুক ব্যক্তির অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বা আচরণ। এমন ভাবনাতেই চিওকে প্রসারিত করে এবং সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে ব্রহ্মানন্দ লাভ অর্থাৎ ব্রহ্মবিহার সম্ভব।

মৈত্রী:

ব্রহ্মবিহার ভাবনার মধ্যে প্রথম ভাবনাই হল মৈত্রী বা মেত্তা। এটি পালি শব্দ, সংস্কৃতে এটি মৈত্রী। মৈত্রী প্রকৃত প্রতিশব্দ হলো শুভেচ্ছা, হিতাকাঙ্খা, পরোপকারিতা। অন্যভাবে বলা যায় মেত্তা কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো বন্ধুত্বপূর্ণতা এবং এটি বন্ধুর অবস্থাকে নির্দেশ করে। যেখানে প্রেম বা ভালোবাসার স্পর্শ থাকে যে প্রেম নির্মল প্রেম। মেত্তা সূত্রে প্রেমের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন গৌতম বুদ্ধ। একে শুভ বুদ্ধিও বলা হয়। মৈত্রীর মাধ্যমে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতাকে জয় করা যায়। এখানে সর্ব প্রাণীর প্রতি মমতারভাব চিত্তে জাগ্রত রাখাই হলো মৈত্রী। কোন ব্যক্তি মৈত্রী অনুসারী হলে তার মধ্যে লোভ দ্বেষ মোহ ক্রোধ সরপরি অহং বোধ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য হয়। সকলকেই নিজের আত্মীয়রূপে প্রেম প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ রাখার মানসিকতা তৈরি হয়। সূও নিপার অন্তর্গত মেত্তাসূত্রে মৈত্রী সম্পর্কে বলা আছে- মা যেমন তার একমাত্র পুত্রকে প্রেম প্রীতি স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে রাখে সন্তানকে সমস্ত রকমের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি মানুষ তার সীমাহীন ভালোবাসা দিয়ে অপর মানুষকে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ রাখবে। এই সীমাহীন ভালবাসায় কোন বাধা ঘৃণা এবং শত্রুতা, হিংস্রতা থাকে না। এই ভাবনা একে অপরকে মৈত্রী ভাবনায় আবদ্ধ করে রাখে। একজন মায়ের ভালোবাসা মধ্যে কোন স্বার্থ থাকে না সন্তানের মঙ্গল চিন্তাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয় ঠিক তেমনি নিঃস্বার্থ প্রেম ভালবাসা দ্বারা অন্যের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তুলতে হবে। অন্যের মঙ্গল বা কল্যাণ কামনাই মৈত্রী ভাবনার মূল লক্ষ্য। যখন দুই ব্যক্তি একে অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় তখন তারা একে অপরকে মেনে চলতে পারে না যদি তাদের মধ্যে দৃঢ় আনুগত্য থাকে প্রেম প্রীতি ভালবাসার বন্ধন থাকে তাহলেই তারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন। সহানুভূতিশীল হতে পারে। কলুষতা স্বার্থ লোভ ও আসক্তির বিপরীত অবস্থা হল মৈত্রী অবস্থা।

---

[৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন প্রথম খণ্ড, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯০৮, পৃ ১৭৭

[৬] প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত ও পীযুষ কান্তি ঘোষ, নীতি শাস্ত্র ও ধর্ম দর্শন, ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ২০০৬ পৃ ৭১

বুদ্ধ মতে মনের সুখ এবং শান্তি থাকার জন্য এটি সঠিক আচরণ। মৈত্রী সূত্রে ১৫টি গুণ রয়েছে যেগুলিকে বলা হয় চরিত্রশিলা বা নৈতিক নীতি। মৈত্রী বিকাশের জন্য চারিত্র্য ও বৈরিত্র্য উভয় অনুশীলন করতে হয়।

পালি মেত্তা শব্দটির অর্থ হল ভালোবাসা, কিন্তু এখানে ভালোবাসা বলতে সখ্যতা বা বন্ধুত্বটাকে বোঝায়, আসক্তি মিশ্রিত প্রেম বা ভালোবাসা নয়। এই ভালোবাসা দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ ঊর্ধ্বে ভালোবাসা । এই ভালোবাসা সর্বজীবের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা। মৈত্রী ভাবনার উদ্দেশ্য হলো সকল জীবের কল্যাণ সাধন, হিত সাধন করা। মৈত্রী বলতে মনের অসদ গুণ বা ক্ষতিকারক প্রবণতার দূরীকরণকেও বোঝায়। যারা মৈত্রী ভাবনার অনুশীলন করেন তারা অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করার মানসিকতা রাখেন । রবীন্দ্রানাথ ঠাকুর প্রেম সম্পর্কে বলেন যে ভালবাসাই সমস্ত সুখের চাবিকাঠি। তিনি বলেন when love prepares yours seat, she prepares it for all.[৭] তিনি আরও বলেন ভালবাসার নিজস্ব জগত আছে, সগত কারণ আছে, তার নিজস্ব লক্ষ্য নিজ দায়িত্ব আছে। Love is its own reason, its own goal and is its own respondsibility.[৮]

করুণা:

করুণা শব্দটি বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ যেমন বিশুদ্ধমাগ শিলাখন্দবজ্ঞ ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। করুণা শব্দটির সাধারণ অর্থ দয়া মমতা। কোন ব্যক্তির কষ্ট দেখে অন্য কোন ব্যক্তি হৃদয় যদি সহানুভূতিশীল হয় তবে তাকে করুণা বলা হয়। এটি হলো ব্রহ্মবিহার ভাবনার দ্বিতীয় অঙ্গ। করুণা সর্বদাই অপরের কল্যাণে প্রসারিত হয়। অন্য ব্যক্তির দুঃখ দূর করার স্বার্থহীন সহানুভূতির নামই হলো করুণা। এটি সম্পূর্ণরূপে অন্তরে সেই আবেগ যা অন্যের দুঃখ দূর করার অনুকূল। এটি একটি মানসিক কারণ যা অপরের দুঃখ দূর করার উপযোগী। বৌদ্ধ ধর্মে মানুষে মানুষে কোনো ভেদ করা হয়নি এ ধর্ম সর্বজনীন এখানে সকল মানুষ সমান গুরুত্বের দাবিদার। বৌদ্ধ ধর্মের মত ভাবনার দ্বিতীয় অঙ্গ করুণাও মানুষ মানুষের পার্থক্য করে না। সকল মানুষ করুণার অধিকারী হতে পারে আবার করুণার দাবিদার হতে পারে। করুণাকে যে কোন ব্যক্তির চরিত্রের মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায়। করুণার বিকাশ ঘটে করুনার মাধ্যমে অর্থাৎ এই করুণার প্রকাশ ঘটে শান্তি ও অক্ষতিকারক চিন্তার মধ্য দিয়ে। অন্যকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকার ভেতর দিয়েই করুণার প্রকাশ ঘটে। অন্তর থেকে ক্রুরতা, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা দূর করলেই করুণার জন্ম হয় আর যদি কারো হৃদয়ে নিষ্ঠুরতা হিংস্রতা স্থান পায় তাহলে সেখানে কখনোই করুণার উদ্ভব প্রকাশ বা বিকাশ কোনটাই সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রভাবনায় ভালবাসার আর এক অর্থ ত্যাগ, অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা । তিনি বলেন প্রেম ও ত্যাগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি বলেন "Trust love even it bring sorrow…. Let sorrowful love wake in your eyes."[৯] ভালোবাসার তাত্ত্বিক দিক যেমন আছে তেমনি ব্যবহারিক দিক আছে ভালোবাসার তাত্ত্বিক দিক হল কোন কিছুর প্রতি ভালোবাসা আর তার ব্যবহারিক দিক হলো ভালোবাসার অনুভূতি থেকে উদ্ভূত কিছু সৎ ক্রিয়া।

মুদিতা:

মুদিতা কথাটি অর্থ হল সহানুভূতি, সহানুভূতিপূর্ণ আনন্দ। মুদিতা হল ব্রহ্মবিহার ভাবনার তৃতীয় অঙ্গ বা গুণ। যখন কেউ অপরের সুখ দেখে খুশি হয় তখন তাকে মুদিতা বলে। কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ না রেখে, সকলের

---

[৭] Basant Kumar lal, contemporary Indian philosophy, Motilal Banarasidass publisher's, 2010, p-83

[৮] Rabindranath Tagor, Prem, Shantiniketan ,1st series,1908,

[৯] Basant Kumar lal, contemporary Indian philosophy, Motilal Banarasidass publisers, 2010, p-84

আনন্দে নিজে আনন্দিত হওয়ায় হলো মুদিতা। অধিকাংশ মানুষই অপরের সুখ দেখে ঈর্ষান্বিত হন। তারা অপরের উন্নতি কামনাই করেন না, অন্যকে দুঃখ দেবার জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন করেন। বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মূলক কার্যে লিপ্ত হন। এটি হলো হিংসার স্বভাব। মুদিতা ঈর্ষার বা হিংসার বিপরীত। ঈর্ষা বা হিংসা অন্তরের শুদ্ধতাকে নষ্ট করে অন্তরকে কলুষিত করে। যে ব্যক্তি হিংসা করে না, অপরের সফলতা দেখে আনন্দিত হয়, অপরের খুশিতে খুশি হয় তাকে সহানুভূতিপূর্ণ আনন্দ বলে। মুদিতা হল স্বাস্থ্য, সম্পদ, যশ, খ্যাতি ইত্যাদি প্রশংসা করার অভিব্যক্তি। মুদিতার বৈশিষ্ট্য হল আনন্দ ও হিংসার মনোভাব শূন্যতা। কাছের মানুষ প্রিয় মানুষ আত্মীয়-স্বজনের সুখে বা খুশিতে সুখী বা খুশি হয় সহজ ব্যাপার। কিন্তু অপছন্দ ব্যক্তির সাফল্য খুশিতে আনন্দিত হওয়া অতটাও সহজ ব্যাপার নয়। একমাত্র মুদিতাভাব সম্পন্ন ব্যক্তি এই কঠিন কাজকে সহজ করতে পারে। তাই মনের কলুষতা মলিনতা দূর করে অন্তর শুদ্ধি করার একমাত্র উপায় হল মুদিতার অনুশীলন করা। রবীন্দ্র চিন্তায় আনন্দ হল তাই- কবির আনন্দ তার কবিতায় শিল্পী আনন্দ তার শিল্পে জ্ঞানী মানুষের আনন্দ তার সত্যের বিচক্ষণতায় এবং তার বিচক্ষণ মূলক বিভিন্ন কর্মে, তেমনি ব্রহ্মের আনন্দ তার সমস্ত রকম দৈনিক কাজে ছোট বড় যেকোনো রকম কাজে সত্যে সৌন্দর্যে সুশৃঙ্খলতা এবং কল্যাণে।[১০]

উপেক্ষা:

উপেক্ষা কথাটির অর্থ হল সমতা, ন্যায় সঙ্গতভাবে বিচার করা, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা, সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা। যখন একজন ব্যক্তি সুখ এবং দুঃখের মধ্যে নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকে তখন তাকে বলে উপেক্ষা। এটি মনের এমন এক অবস্থাকে নির্দেশকরে যেখানে মন বিচলিত হয় না, স্থির থাকে। কি দুঃখ কি সুখে তার অবস্থান একই থাকে। উপেক্ষার বৈশিষ্ট্যই হলো পক্ষপাত শূন্যতা, নিরপেক্ষতা। এটি হলো জীবের প্রতি গড়ে ওঠা এক মহৎ গুণ, যা মানুষের প্রয়োজনীয় গুণাবলী- ভালোবাসা, সহানুভূতিশীলতা, মমতা এগুলো কে রক্ষা করে। এই গুণের অধিকারী হতে গেলে আমাদেরকে ধৈর্যশীল হতে হবে এবং সংকল্প গঠন করতে হবে। এ হলো এক মধ্য পন্থা যেখানে না আমরা সুখে খুব আনন্দিত বা উত্তেজিত হই আবার না দুঃখে বিচলিত হই, সুখ ও দুঃখের মাঝামাঝি অবস্থায় আমরা অবস্থান করি। অর্থাৎ এক উদাসীনতাবোধ তৈরি হয়। এই নিরপেক্ষতা ভাব বা উদাসীনতার বোধ আমাদের জন্মগত নয়। অনেক সাধনা ও চর্চার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। এক অর্জিত স্বভাব যা চিত্তকে স্থিত রাখে। এই অবস্থায় চিও সুখ- দুঃখ, হাসি- কান্না, ভালো-মন্দ, নিন্দা-প্রশংসা, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি দ্বারা বিচলিত হয় না। উপেক্ষার বিপরীত স্বভাব হল লোভ বা মোহ বা আসক্তি। লোভ থাকলে সেখানে কখনোই উপেক্ষার ভাব তৈরি হয় না বা জন্ম নেয় না।

উপসংহার:

বৌদ্ধ দর্শনে পরম পুরুষার্থ হল নির্মাণ বা মুক্তি। নির্বাণং পরমং সুখনং। নির্বাণ কেবল কামনা বাসনার বিলোপ নয়, নির্বাণ হল কলুষতা মুক্ত আনন্দঘন অবস্থা। উপনিষদে আনন্দ ও সত্য সম্পর্কে বলা আছে 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি' অর্থাৎ যিনি সকল জীবকে আত্মবোধ বা নিজের বলে জানেন তিনি সত্য কে জানেন এবং তিনি আনন্দে স্বরূপ উপলব্ধি করেন। এভাবে সকল জীবকে প্রেম প্রীতি ভালবাসার মাধ্যমে একাত্ম্য করে নেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে বুদ্ধমতে সেই আনন্দঘন অবস্থা হলো নির্বাণ প্রাপ্তি। বুদ্ধমতে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় শীল আর লক্ষ্য হল মৈত্রী ভাবনাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া। ব্রহ্মবিহার ভাবনা সম্পর্কে বলা যায় এই ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে যেমন মানুষের জীবনে পরিপূর্ণতা আসে তেমনি সমাজ জীবনে উৎকর্ষতা

[১০] Lal Basant Kumar Lal, contemporary Indian philosophy, Motilal Banarasidass publisers, 2010, p-86

বৃদ্ধি পায়। সমাজকে শান্তিপূর্ণভাবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এই ভাবনার গুরুত্ব আছে- একথা স্বীকার্য সত্য। এই ভাবনার লক্ষ্যই হলো মন থেকে অশুভ ইচ্ছাকে দূর করা, ঈর্ষা, মোহ, কামনা বাসনা, নিষ্ঠুরতা, ক্রুরতা ইত্যাদি অশুভ চিন্তা দূর করা অর্থাৎ চিও শুদ্ধ করা। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য চিওশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা যেমন আছে তেমনি ব্যবহারিক জীবনে সুন্দর ভাবে পরিচালনা করার জন্য চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে। চিত্ত নির্মল হলে, শুদ্ধ হলে, পবিত্র হলে শুভ চিন্তার উন্মেষ হয়। আর চিত্ত চঞ্চল হলে, অশুদ্ধ হলে, অপবিত্র হলে, অশুভ চিন্তার জন্ম হয়। আধুনিক প্রযুক্তিগত ব্যস্তময় জীবনে মানুষ অনেকটাই যান্ত্রিক হয়ে গেছে, স্বার্থপর হয়ে গেছে। এই বর্তমান সময়ে স্বার্থলোভী মানুষ কেবল নিজের সফলতা, সুখকেই কামনা করে অপরের কথা চিন্তা করার দুদণ্ড সময়, মানসিকতা দুটোর কোনটাই নেই। প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে তাল মিলিয়ে তাই আজ মানুষের আত্মিক উন্নতি বা অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবা উচিত।

বহু বছর পূর্বে যে ব্রহ্মবিহার ভাবনার কথা অর্থাৎ মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষার কথা বুদ্ধদেব বলে গেছেন বর্তমান সময়ে বর্তমান সমাজে সেই ভাবনার অনুশীলন খুব দরকার, তা না হলে অন্যান্য জীবের প্রতি মমত্ববোধ সহানুভূতির বোধ তৈরি হতে পারে না। তাই ব্রহ্মবিহার ভাবনাগুলি সামগ্রিকভাবে মহৎ মনোভাবের চর্চা করে যা এই জীবন যাপনে একেবারে উপযোগী। এই ভবনাই আত্মত্যাগ, সেবা, সাহায্য, প্রেম প্রীতি ভালবাসার মধ্যে দিয়ে মানুষের প্রতি উচ্চতর মনোভাব পোষনের শিক্ষা দেয়। রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের সমস্ত চিন্তায় কাজে অবশ্যই ধৈর্যশীল দয়াবান ও আত্মত্যাগী হতে হবে। ভক্তি সেবা সদাচারণ ও প্রেমের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্ম করার কথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেন এমন কর্ম করলে আমরা আনন্দিত হব এবং অসীমের উপলব্ধি করতে পারবো। বিশ্বব্যাপীপ্রেমের মধ্যে দিয়ে চিত্তকে প্রসারিত করে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করাই বুদ্ধদেব মতে ব্রহ্মবিহার। জাগতিক দুঃখ-কষ্ট হতাশার মাঝে বুদ্ধদেব সত্যিই এক আশার বাণী শুনিয়েছিলেন, নৈতিক চেতনায় মানুষকে উদ্বোধিত করেছিলেন। তার তত্ত্ব প্রচলিত অর্থে দার্শনিক তত্ত্ব না হলেও যথার্থ অর্থে অভিনব নীতি তত্ত্ব।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. বিদ্যারন্য স্বামী। বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ISBN-81-247-0305-1, 1999.

২. মহাস্থবির বিশুদ্ধানন্দ আচার্য। বৌদ্ধ দর্শনে সত্য দর্শন। মহাববোধি বুক এজেন্সি, ISBN:978-93-80336-23-7, 2015.

৩. মহাস্থবির ধর্মাধর পন্ডিত। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বিরচিত বৌদ্ধ দর্শন। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ISBN-978-93-80336-6, 2015.

৪. সেনগুপ্ত, প্রমোদ ও ঘোষ, পীযুষ কান্তি। নীতি শাস্ত্র ও ধর্ম দর্শন। ব্যানার্জি পাবলিশার্স, 2006.

৫. বাগচী, দীপক কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগতিশীল প্রকাশক, 2015.

৬. মিত্র, গৌরী। গৌতম বুদ্ধ। গ্রন্থ তীর্থ প্রকাশক, ISNN -978-81-7572-176-0, 2013.

৭. চৌধুরী, সুকোমল। মহামানব গৌতম বুদ্ধ। মহাবোধি বুক এজেন্সি, 978-93-8033-6381,2011.

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতন প্রথম খণ্ড। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯০৮।

English book:

1. Lal, Basant Kumar. contemporary Indian philosophy, Motilal Banarasidass publisers, 2010, ISBN -978-81-208-0260-5.
2. Tagore, Rabindranath, sadhana, Ananda publishers,2003, ISBN 9789388870160.
3. Tagore, Rabindranath, santiniketan vol. 1. Indian publishing house. Bolpure ,1908.

4. Sarkar, Bijoy kumar. Buddhist concept of bramabihar-An Analysis of moral, Research Review international journal multidisciplinary, ISSN-2455-3085.
5. Tagore, Rabindranath. The Gardener. Macmillian, and Co Landon (Indian Edition) 1919.
6. Tagore, Rabindranath. Lover's gift and crossing. Macmillian, and Co Landon (Indian Edition) 1927.

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 557-563
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.244

সকল বিজ্ঞানের রাণী ও জননী হিসেবে দর্শন: একটি সমীক্ষণ

খোকন সেখ, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.01.2026; Accepted: 15.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

From ancient times, philosophy has been regarded as the queen and mother of all sciences. At a stage when human knowledge had not yet been divided into distinct disciplines, philosophy functioned as the comprehensive field of intellectual inquiry. Although mathematics, physics, biology, sociology, and other sciences later emerged as independent disciplines, their fundamental concepts, methods, and guiding questions were rooted in philosophy. The aim of this survey is to analyze how philosophy has shaped the foundational questions, conceptual frameworks, and epistemological bases of the sciences, and to explain, with reasoned arguments, why philosophy is still regarded as the mother of all sciences. The paper argues that philosophy is not merely speculative or doctrinal but serves as a critical and integrative framework that guides scientific reasoning, innovation, and self-reflection. Thus, philosophy remains indispensable as both the origin and ongoing foundation of all scientific disciplines.

Keywords: Science, Philosophy, Philosophy of Science, Foundations of Knowledge, Scientific Method, Epistemology, Philosophy and Science, Queen of all Sciences, Mother of all Subject

মানুষ যখন থেকে পৃথিবীতে এসেছে, তখন থেকেই তার মধ্যে জানার স্পৃহা বিদ্যমান। মানুষ অজানাকে জানতে ও বুঝতে চায়; প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের আকাঙ্ক্ষা তার চিরন্তন। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ এই রহস্যময় জগতের সামনে বারবার 'এটা কী?'— এই প্রশ্ন উত্থাপন করে জানার ও বোঝার চেষ্টা করে আসছে। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ অজানাকে জানার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে চায় এবং সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জগৎ ও জীবনের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা চালায়। জ্ঞান সংগ্রহের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত করে। অজানাকে জানার এই অনুরাগই হলো দর্শন (Philosophy)। অতএব, দর্শন হলো জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ। প্রাচীনকাল থেকেই দর্শন সবকিছুর ওপর অধ্যয়ন হিসেবে স্বীকৃত। দর্শন এমন এক ধরনের অধ্যয়নকে বোঝায়, যা বিভিন্ন বিষয়কে সমালোচনামূলক ও যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে। 'দর্শন' শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত— 'ফিলো' (Philo), যার অর্থ প্রেম, এবং 'সোফিয়া' (Sophia), যার অর্থ জ্ঞান। সুতরাং দর্শনের অর্থ হলো জ্ঞানের প্রতি প্রেম। এই অর্থে, একজন দার্শনিক হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি জ্ঞানকে ভালোবাসেন এবং তা অর্জনের জন্য নিরন্তর অনুসন্ধান করেন।

গ্রিক দর্শনের পর্যালোচনা: প্রাচীন গ্রিক দর্শনের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সে সময়ে ফিলোসফি বা দর্শন ছিল একটি 'বিষয়পুঞ্জ'[১]। এই বিষয়পুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ছিল সকল প্রকার জ্ঞানের অনুসন্ধান ও আলোচনা;

অর্থাৎ জগতের প্রায় সব বিষয় নিয়েই দর্শনের আওতায় আলোচনা হতো। পিথাগোরাসই প্রথম এই অনুসন্ধানমূলক জ্ঞানচর্চার নামকরণ করেন 'ফিলোসফি'। বর্তমানে যেসব বিষয়কে আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science) বলে গণ্য করি, সেগুলোর আলোচনাও প্রাচীন গ্রিক দর্শনের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক থেলিস যে প্রশ্নটি করেছিলেন— "What is the stuff of this world?"[২] —তা মূলত পদার্থবিজ্ঞানের একটি মৌলিক প্রশ্ন, কোনো অধিবিদ্যামূলক (metaphysical) প্রশ্ন নয়। তিনি বাস্তবতা (reality) বা অবাস্তবতা (unreality) নিয়ে প্রশ্ন না তুলে জগতের মূল উপাদান কী—সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেছিলেন।এই প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ বলেন জগতের মূল উপাদান জল[৩], কেউ বলেন আগুন[৪], আবার কেউ বলেন বায়ু[৫]। থেলিসের এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের অনুসন্ধান, জগতের স্বরূপ অন্বেষণ এবং সর্বোপরি একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সূচনা করা।

দর্শন তার সূচনা করে বিস্ময় থেকে এবং 'কেন'— এই মৌলিক প্রশ্নের মাধ্যমে। এই প্রশ্নই জ্ঞানচর্চার অন্যান্য শাখার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি নির্মাণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশ দর্শনের সঙ্গে তার এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে, যার ফলে তার অধ্যয়নের ক্ষেত্র আরও গভীর ও শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সত্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতির ওপর বিশ্বাস করা উচিত— তা নিয়ে দর্শনে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। এই প্রবন্ধ বিশেষভাবে যুক্তিবাদী ও অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। তবে আধুনিক অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানীদের ব্যবহৃত পদ্ধতির কিছু মৌলিক দুর্বলতা রয়েছে। এই পদ্ধতি প্রধানত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেহারা বা প্রকাশের ওপর নির্ভর করে, যা আমাদের অনেক সময় অচল অবস্থায় নিয়ে যায়। কারণ আমরা জানি, বাস্তবতা বা সত্য কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে যা উপস্থাপিত হয়, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

আধুনিক অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানীদের দর্শনের ভূমিকাকে কেবল একটি সূচনা বিন্দু হিসেবে নয়, বরং সমস্ত জ্ঞানের উপসংহার হিসেবেও বিবেচনা করা ও উপলব্ধি করা উচিত। দর্শনকে গ্রহণ করলে বিজ্ঞানীরা একটি শক্তিশালী বৌদ্ধিক ভিত্তি লাভ করবেন, যা তাদের নতুন প্রযুক্তি ও সমস্যার সমাধান উদ্ভাবনে আরও সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী করে তুলবে।প্রাচীনকাল থেকেই দর্শন সবকিছুর ওপর অধ্যয়ন হিসেবে স্বীকৃত। দর্শন এমন এক ধরনের অধ্যয়নকে বোঝায়, যা বিভিন্ন বিষয়কে সমালোচনামূলক ও যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে। 'দর্শন' শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত—'ফিলো' (Philo), যার অর্থ প্রেম, এবং 'সোফিয়া' (Sophia), যার অর্থ জ্ঞান। সুতরাং দর্শনের অর্থ হলো জ্ঞানের প্রতি প্রেম। এই অর্থে, একজন দার্শনিক হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি জ্ঞানকে ভালোবাসেন এবং সত্যের অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকেন।

বিজ্ঞানের রাণী ও জননী হিসেবে দর্শন: প্রাচীনকাল থেকেই দর্শনকে সকল বিজ্ঞানের রাণী ও জননী হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে আসছে। এর প্রধান কারণ হলো— প্রাথমিক পর্যায়ে দর্শনই ছিল জ্ঞানের সকল শাখার উৎস। অর্থাৎ, বিজ্ঞানের যেসব শাখা আজ স্বতন্ত্র রূপে বিকশিত হয়েছে, সেগুলোর বীজ নিহিত ছিল দর্শনের মধ্যেই। ফলে দর্শন এসব বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত মূল্য, অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত। যদিও আধুনিক যুগে এসব শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন নাম ও পরিভাষা গ্রহণ করেছে, তবু ব্যুৎপত্তিগত ও ধারণাগতভাবে সেগুলো গ্রিক দর্শনের বোধগম্যতার সঙ্গেই যুক্ত।

প্রাচীন দার্শনিকদের অন্তর্দৃষ্টি থেকেই বহু আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো ডেমোক্রিটাসের পরমাণু তত্ত্ব। প্রায় ২৩০০ বছরেরও বেশি সময় আগে তিনি পরমাণুর ধারণা উপস্থাপন করেন। ডেমোক্রিটাস বিশ্বাস করতেন যে জগতের সকল বস্তু ক্ষুদ্র, অবিভাজ্য কণার সমন্বয়ে গঠিত এবং তিনি সবকিছুর অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় এই ধারণায় উপনীত হন। যদিও

সে সময় এই ধারণাটি অনেকের কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়েছিল, আধুনিক বিজ্ঞান পরবর্তীকালে পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে এবং এই আবিষ্কার আমাদের জগৎ সম্পর্কে বোঝাপড়াকে আমূল পরিবর্তন করেছে। ডেমোক্রিটাস, যিনি প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে তাঁর দর্শন বিকশিত করেন, পদ্ধতিগতভাবে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সমগ্র মহাবিশ্ব বিভিন্ন আকার, আকৃতি ও বিন্যাসের ক্ষুদ্র বস্তুগত কণা—পরমাণু—দ্বারা গঠিত, যা শূন্যের মধ্যে গতিশীল এবং নির্দিষ্ট কার্যকারণ নীতির অনুসরণে একে অপরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে। এই অর্থে, ডেমোক্রিটাসকে পারমাণবিক তত্ত্বের জনক বলা হয়, যা প্রায় ২৩০০ বছর পরে বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে[৬] এই উদাহরণটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে দার্শনিকরা আধুনিক অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞানের বিকাশে কতটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এটি আরও নির্দেশ করে যে ধারণা ও তাত্ত্বিক চিন্তা এক অত্যন্ত শক্তিশালী উপাদান, যা আধুনিক বিজ্ঞানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। সত্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি দীর্ঘ ও গৌরবোজ্জ্বল যৌথ ইতিহাস রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মার্টিন হাইডেগার উল্লেখ করেন যে, "দর্শন বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা ও প্রস্তাবনার ওপর ধ্যান করে এবং এর মাধ্যমে বিজ্ঞানকে তাদের কঠোর শ্রম থেকে মুক্তি দেয়।" এই বক্তব্য আরও প্রমাণ করে যে দর্শনকে সমস্ত জ্ঞানের সার্বজনীন কাঠামো পরিচালনার জন্য একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।[৭]

একইভাবে ল্যামন্ট বলেন, "দার্শনিকরা সর্বদা মানুষকে জিনিসের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেন; যা কৃত্রিমভাবে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত করা হয়েছে, তা পুনরায় একত্রিত করেন। সংক্ষেপে বলা যায়, ক্রমবর্ধমান বিশেষায়নের এই যুগে সাধারণীকরণে বিশেষজ্ঞ হওয়াই দার্শনিকের প্রধান কাজ, যা আজ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"[৮]

"বিজ্ঞানের জননী কোনো মতবাদ নয়"— এই আপাত-বিরোধাভাসী দাবিটি থেকেই এই অনুসন্ধানের সূচনা। আধুনিক যুগে দর্শনকে প্রায়ই নিছক চিন্তার খেলা বা একটি মতবাদ হিসেবে খারিজ করা হয়। কিন্তু যদি দর্শনের প্রকৃত কাজ বিশ্বাস প্রদান না হয়ে প্রশ্ন নির্মাণ হয়, তবে কি দর্শনের ভূমিকা নতুন করে ভাবার প্রয়োজন নেই? আমি সবসময় বিজ্ঞানকে ভালোবাসতাম। কিন্তু একসময় লক্ষ করলাম, আমি ক্রমাগত একটি প্রশ্নই করছি—"কেন? কেন আমরা যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি করি? কেন মানুষ মরণশীল? কেন আমরা বিরোধিতার মুখোমুখি হতে ভয় পাই? এই প্রশ্ন করতে করতেই আমি শেষ পর্যন্ত দর্শনের জগতে এসে পড়ি। অথচ আধুনিক জগতে দর্শনকে ক্রমেই অস্পষ্ট ও অপ্রয়োজনীয় করে তোলা হয়েছে— প্রায়ই একে মতবাদ হিসেবে দেখা হয়। এই সংকোচনের ফলে আমরা হয়তো ভুলে গেছি একটি মৌলিক সত্য: দর্শন যদি প্রথমে "কেন?" প্রশ্ন না করত, তবে বিজ্ঞানের অস্তিত্বই হয়তো সম্ভব হতো না। ক) বিজ্ঞান হলো সেই পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমরা পর্যবেক্ষণ, অনুমান ও যাচাইয়ের সাহায্যে পৃথিবী কীভাবে কাজ করে তা বোঝার চেষ্টা করি। এটি যুক্তি, পুনরাবৃত্তি এবং পরিমাপযোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রতিটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সূচনায় থাকে একটি সরল অথচ গভীর প্রশ্ন— "এটা কেন ঘটে?" এই অর্থে, প্রশ্ন করাই বিজ্ঞানের মৌলিক উপাদান। খ) এই "কেন?" আসে কোথা থেকে? এটি জন্ম নেয় পর্যবেক্ষণ থেকে— অস্বস্তি, বিরোধিতা কিংবা প্রত্যাশিত প্রবাহে বিঘ্ন ঘটলে। প্রশ্ন করার এই প্রবণতাটাই মূলত দর্শন। প্রাচীন দার্শনিকরা কেবল চিন্তাবিদ ছিলেন না; তাঁরাই ছিলেন প্রথম প্রকৃতি-বিজ্ঞানী। থেলিস, ডেমোক্রিটাস, আর্কিমিডিস— তাঁদের প্রশ্ন থেকেই পদার্থবিদ্যা, গণিত ও বিজ্ঞানের জন্ম। গ) আজ দর্শনকে প্রায়ই মতবাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু এটি একটি মৌলিক ভুল বোঝাবুঝি। মতবাদ যেখানে বিশ্বাস ও আবেগের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, দর্শন সেখানে দাঁড়ায় যুক্তি ও লজিক্যাল সামঞ্জস্যের ওপর।

সম্ভবত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের একটি অংশ ভাষাগত জটিলতা ও অস্পষ্ট বিমূর্ততাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করায় তার প্রকৃত ভূমিকা আড়াল হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো চিন্তা যদি লজিক্যালভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে তাকে কি নিছক মতবাদ হিসেবে খারিজ করা যায়? ঘ) যদি দর্শন সত্যিই বিজ্ঞানের হয়, তবে বিজ্ঞান কেন তার থেকে দূরে সরে গেল? এর উত্তর নিহিত আছে দর্শনের একটি বিকৃতিতে। যখন আবেগনির্ভর দাবি ও যাচাই-অযোগ্য ভাষা যুক্তিনির্ভর অনুসন্ধানকে ঢেকে ফেলল, তখন বিজ্ঞান নিজেকে সেই পরিসরে কাজ করতে অক্ষম মনে করল। বিজ্ঞান চায় স্পষ্টতা—অস্পষ্টতা নয়। ফলে একসময় দর্শন তার "প্রশ্নকর্তা" ভূমিকা ছেড়ে বিশ্বাস ও চূড়ান্ত ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকে পড়লে, বিজ্ঞান বাধ্য হয় দূরে সরে যেতে। ঙ) বিজ্ঞান ও চিন্তার মধ্যে প্রকৃত বিভাজন বিষয় বা লেবেল নয়—বিভাজন হলো সামঞ্জস্য। এমনকি সবচেয়ে অদ্ভুত ধারণাও, যদি তা পর্যবেক্ষণ থেকে আসে এবং লজিক্যাল সামঞ্জস্য বজায় রাখে, তবে তা বৈজ্ঞানিক হাইপোথিসিস হতে পারে। অন্যদিকে, সামঞ্জস্যহীন ধারণা পড়ে থাকে বিশ্বাস, মতবাদ বা কল্পনার জগতে। যতক্ষণ দর্শন লজিক্যালি কোহেরেন্ট থাকে, ততক্ষণ তা বিজ্ঞানের অংশ। চ) মানুষ বিরোধিতাকে ভয় পায়। কিন্তু বিরোধিতা উপেক্ষা করলে তা অদৃশ্য হয় না—বরং জমে ওঠে এবং একসময় ধ্বংস ডেকে আনে। দর্শন তার শ্রেষ্ঠ অবস্থায় হলো এই বিরোধিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আবার প্রশ্ন করার সাহস। এই সাহসই নতুন বিজ্ঞানের জন্ম দেয়। ছ) বিজ্ঞান দর্শন থেকে জন্মেছে—এটি সত্য। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান অনেক সময় নিজের "কেন?" নিজে তৈরি না করে বাইরের উৎস থেকে ধার করে। ফলে বিজ্ঞান ধীরে ধীরে অনুসন্ধানীর বদলে কেবল মাপজোখকারী হয়ে ওঠে। হয়তো সময় এসেছে বিজ্ঞানের আবার দর্শনের দিকে ফিরে তাকানোর। দর্শন কি এখনও বিজ্ঞানের মা কিন্তু মতবাদ হিসেবে নয়, বিশ্বাসব্যবস্থা হিসেবে নয়। শুধু কোহেরেন্ট প্রশ্ন নির্মাণের কাঠামো হিসেবে দর্শন এখনও বিজ্ঞানের মা হতে পারে। দর্শন প্রশ্ন তৈরি করে, বিজ্ঞান উত্তর দেয়। একটিকে বাদ দিলে চিন্তা অসম্পূর্ণ থাকে। বিজ্ঞানের মা মতবাদ নয়— সে হলো সামঞ্জস্য নিজেই, সেই প্রশ্নের কাঠামো যা চুপ থাকতে অস্বীকার করে।

Alex Rosenberg তাঁর *Philosophy of Science: A Contemporary Introduction* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, প্রাথমিকভাবে দর্শন ছিল জ্ঞানের একটি সমগ্র বিষয়পুঞ্জ। পরবর্তীকালে যখন এই বিষয়পুঞ্জ থেকে বিভিন্ন শাস্ত্র ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র বিষয় (subject-matter) হিসেবে পৃথক হয়ে যেতে শুরু করে, তখন তারা তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যায় নির্দিষ্ট গবেষণাক্ষেত্র ও পদ্ধতি[৯]। কিন্তু একই সঙ্গে কিছু মৌলিক ও ভিত্তিমূলক প্রশ্ন দর্শনের ক্ষেত্রেই থেকে যায়[১০]। এই প্রশ্নগুলো এমন, যেগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীরা অতীতে আলোচনা করেননি এবং ভবিষ্যতেও করবেন না।এই প্রেক্ষাপটেই প্রায়ই বলা হয়—*philosophy is the mother of all subjects*। তবে এখানেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়: বিজ্ঞানীরা কেন এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন না, কিংবা ভবিষ্যতেও কেন দেবেন না?

এর উত্তরে Rosenberg বলেন—

> "...initial questions are itself a matter that can only be selected by philosophical arguments."[১১]

অর্থাৎ, কোনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু করার আগেই যে প্রশ্নগুলো নির্বাচন করা হয়, সেগুলোর নির্বাচন নিজেই একটি দার্শনিক প্রক্রিয়া; এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আওতাভুক্ত নয়। ফলে এই ভিত্তিমূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর না দিয়েও বিজ্ঞান তার নিজস্ব সীমার মধ্যে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। তবু এখানেই একটি সূক্ষ্ম দার্শনিক সমস্যা রয়ে যায়— যে বিজ্ঞান তার সূচনা প্রশ্নগুলোর যৌক্তিকতা ও অর্থ নির্ধারণ করতে পারে

না, সে বিজ্ঞান কীভাবে নিজের জ্ঞানগত ভিত্তিকে সম্পূর্ণ বলে দাবি করতে পারে? এই ধরনের প্রশ্নই বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে এক গভীর ও সূক্ষ্ম দার্শনিক বিতর্কের জন্ম দেয়।

দর্শন ও গণিতের সম্পর্ক:

দর্শন ও গণিতের মধ্যকার সম্পর্কের আলোচনায় সর্বপ্রথম প্লেটোর দর্শন ও সংখ্যাবিষয়ক ধারণার কথা উল্লেখযোগ্য। প্লেটো বিশ্বাস করতেন যে গাণিতিক সত্যসমূহ হলো বিমূর্ত সত্তা (abstract entities), যেগুলো বাস্তব জগতের বস্তুসমূহের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয়। তাঁর মতে, সংখ্যা কোনো ভৌত বস্তু নয়; বরং এগুলো এমন এক ধরনের সত্য, যা আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি নির্মাণ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে সংখ্যার ধারণা এবং সংখ্যাকে প্রকাশকারী প্রতীক এক নয়। উদাহরণস্বরূপ, "2", "II" অথবা "দুই"— সবগুলোই একই সংখ্যাকে নির্দেশ করে, কিন্তু প্রতীকগুলো ভিন্ন। এতে স্পষ্ট হয় যে সংখ্যা নিজেই একটি বিমূর্ত ধারণা, আর প্রতীক কেবল তার প্রকাশমাত্র। এই উপলব্ধি আমাদের জ্ঞান, বাস্তবতা এবং বিমূর্ততার প্রকৃতি নিয়ে গভীর দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপন করে।

দর্শন ও পদার্থবিজ্ঞানের সম্পর্ক: সময়ের সমস্যা

দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পদার্থবিজ্ঞানে। উদাহরণস্বরূপ, নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী বল (F) ভর (m) এবং ত্বরণ (a)- এর গুণফলের সমান,
অর্থাৎ

F = ma।
এখানে ত্বরণ হলো বেগের সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তন,
অর্থাৎ

a = dv/dt।

এই সূত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সমস্যা সামনে আসে— সময় কী? স্থান (space) পরিমাপের জন্য যেমন মিটার বা গজের মতো নির্দিষ্ট একক রয়েছে, সময়ের ক্ষেত্রেও সেকেন্ড, মিনিট বা ঘণ্টার মতো একক ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো— এই এককগুলোর দার্শনিক ভিত্তি কী? সময় কি একটি স্বাধীন বাস্তব সত্তা, নাকি এটি কেবল পরিবর্তনের পরিমাপক? এই প্রশ্নটি প্রায় ৩০০ বছর ধরে দর্শন ও বিজ্ঞানের একটি কেন্দ্রীয় সমস্যা। বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে আলবার্ট আইনস্টাইন দেখান যে সময় কোনো পরম সত্তা নয়; বরং এটি পর্যবেক্ষকের রেফারেন্স ফ্রেমের উপর নির্ভরশীল। ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষকের কাছে একই ঘটনার সময়কাল ভিন্ন হতে পারে।

এখানেই নিউটনের ধারণার বিরুদ্ধে দার্শনিক লাইবনিজের সমালোচনার গুরুত্ব বোঝা যায়। নিউটন যেখানে স্থান ও সময়কে স্বাধীন পাত্র (absolute containers) হিসেবে দেখেছিলেন, লাইবনিজ সেখানে সময়কে ঘটনাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। এটি দেখায় যে সময়ের প্রকৃতি সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান।

দর্শন ও জীববিজ্ঞানের সম্পর্ক: বিবর্তন ও উদ্দেশ্যের প্রশ্ন

দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট, বিশেষত ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বে। বিবর্তনবাদ অনুযায়ী, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবের বৈচিত্র্য এবং মানবজাতির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে। কিন্তু ডারউইনের তত্ত্বে কোনো পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই। অনেক জীববিজ্ঞানী ও দার্শনিক মনে করেন, বিবর্তন একটি অন্ধ প্রাকৃতিক

প্রক্রিয়া—এতে কোনো "অর্থ" বা "উদ্দেশ্য" আরোপ করা হয় না। এই বিষয়টি দর্শন ও ধর্মের জন্য গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করে:

যদি প্রকৃতিতে কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, তবে মানব জীবনের অর্থ কী?

উপসংহার:

উপরের আলোচনাগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান— সব ক্ষেত্রেই কিছু মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে, যেগুলোর উত্তর কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেওয়া সম্ভব নয়। সংখ্যা কী, সময় কী, বা বিবর্তনে কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না— এই প্রশ্নগুলো মূলত দার্শনিক।এই কারণেই দর্শনকে প্রায়ই সকল বিজ্ঞানের জননী বলা হয়। বিজ্ঞান নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান দেয়, আর দর্শন সেই সমস্যাগুলোর অর্থ, ভিত্তি ও সীমা নির্ধারণ করে। দুটিকে আলাদা করা সম্ভব নয়— দর্শন ছাড়া বিজ্ঞান অন্ধ, আর বিজ্ঞান ছাড়া দর্শন শূন্য।দর্শন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের অনুঘটক এবং সকল বিজ্ঞানের মা/জননী ও রাণী দর্শনকে বৈজ্ঞানিক ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তির একটি অনুঘটক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। একই সঙ্গে দর্শনকে সকল বিজ্ঞানের মা ও রাণী বলা হয়, কারণ বিজ্ঞানের মৌলিক প্রশ্ন, সীমা ও অর্থ নির্ধারণের কাজ দর্শনই করে থাকে।

প্রথমত, বিজ্ঞানের এমন বহু প্রশ্ন রয়েছে— ভৌত, জৈবিক, সামাজিক ও আচরণগত—যেগুলোর উত্তর বর্তমান বিজ্ঞান দিতে অক্ষম এবং সম্ভবত ভবিষ্যতেও দিতে পারবে না। এই প্রশ্নগুলোর আলোচনাই দর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ। অর্থাৎ, দর্শন সেই সকল প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করে যেগুলো এখনো বৈজ্ঞানিকভাবে সমাধানযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, দর্শন শুধু এসব প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করে না; বরং আরও একটি গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করে— কেন বিজ্ঞান এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারে না? এই পর্যায়ে দর্শন বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, পদ্ধতিগত গঠন এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসর বিশ্লেষণ করে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, দর্শন মূলত এমন সব প্রশ্ন নিয়ে কাজ করে, যেগুলোর উত্তর বিজ্ঞান এখনও দিতে পারে না, অথবা হয়তো কখনও দিতে পারবে না। এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াতেই দর্শন নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়। এই ধরনের প্রাথমিক বা মৌলিক প্রশ্নসমূহ নিজেরাই এমন এক বিষয়, যেগুলোর মীমাংসা কেবল দার্শনিক যুক্তির মাধ্যমেই সম্ভব। যদি এমন প্রশ্ন না থাকত, তবে বিজ্ঞানকেও তার অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর উত্তর খুঁজতে দর্শনের দ্বারস্থ হতে হতো। ফলে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যকার সম্পর্ক একটি অনিবার্য দার্শনিক বিতর্কের জন্ম দেয়। এই কারণেই বিজ্ঞানীদের জন্য দর্শনের ইতিহাসের একটি মৌলিক অধ্যয়ন অপরিহার্য। গ্রিক দর্শন থেকে শুরু করে নিউটন, ডারউইন এবং আধুনিক বিজ্ঞান পর্যন্ত— বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এমন প্রশ্ন থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যেগুলো প্রথমে ছিল দার্শনিক। এই ইতিহাস আমাদের এমন অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি করে, যেগুলোর এখনো বৈজ্ঞানিক উত্তর পাওয়া যায়নি।অতএব বলা যায়, বিজ্ঞান কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, কারণ সেগুলো বিজ্ঞানের বিষয় নয়— সেগুলো দর্শনের বিষয়। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে বিজ্ঞানীদের উচিত দর্শনের সাহায্য নেওয়া এবং বিজ্ঞানের ইতিহাস ও দার্শনিক ভিত্তি গভীরভাবে অধ্যয়ন করা। তবেই বিজ্ঞান তার সীমা অতিক্রম করে আরও সৃজনশীল, উদ্ভাবনী ও অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।

তথ্যসূত্র:

1. Rosenberg, Alex. Philosophy of Science: A contemporary introduction. Routledge, 2005, New York and London, pp. 1.
2. Masih, Y. A critical history of western philosophy. Motilal Banarashidass PVT. LTD., 2017 Delhi, pp. 4.
3. Ibid., pp. 4.
4. Ibid., pp.17.
5. Ibid., pp.6.
6. Lamont, Corliss. The Philosophy of Humanism, 8th Edition. pp. 42.
7. Shanker, G. Stuart Cf., eds. Philosophy of Science. Logic and Mathematics in Twentieth Century, Vol. Ix, 235.
8. Lamont, Corliss. The Philosophy of Humanism, 8th Edition. pp. 7.
9. Rosenberg, Alex. Philosophy of Science: A contemporary introduction. Routledge, 2005, New York and London, pp. 1.
10. Ibid., pp. 1.
11. Ibid., pp. 12.

সহায়ক গ্রন্থ:

1. Heidegger, Martin. Modern Science, Metaphysics and Mathematics. Yale University, London, 2000.
2. Meiklejohn, J.M.D trans. Immanuel Kant, The Critique of Pure Reason.
3. Shanker, G. Stuart, eds. Philosophy of Science. Logic and Mathematics in Twentieth Century, Vol. Ix, Routledge: London, 1996.
4. Rosenberg, Alex. Philosophy of Science: A contemporary introduction. Routledge, New York and London, 2005.
5. Masih, Y. A critical history of western philosophy. Motilal Banarashidass PVT. LTD. Delhi, 2017.
6. Lamont, Corliss. The Philosophy of Humanism, 8th Edition. Humanist Press, New York, 1997.

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 564-569
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.245

অরবিন্দের দর্শন চিন্তার আলোকে মানবোত্তরণ: একটি সমীক্ষা

জয়দেব হাজরা, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 12.01.2026; Accepted: 13.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article explores the concept of human Emancipation (Manbottaran) and the transformation of consciousness through the lens of Sri Aurobindo's Integral Philosophy. Unlike conventional progress or social development, Sri Aurobindo defines 'Emancipation' as an internal ascent—moving from the depths of primal instincts to the heights of divine consciousness. While traditional Indian philosophy often views 'emancipation' (Mukti) as a release from worldly existence, Sri Aurobindo presents a revolutionary perspective where the ultimate goal is the manifestation of a 'Divine Life' here on Earth.

The core of this study focuses on the Triple Transformation, which Sri Aurobindo identifies as the essential process for reaching the Supramental state:

1. Psychic Transformation: The process of bringing the 'Psychic Being' (the soul-element) to the forefront to govern and purify the mind, life, and body.

2. Spiritual Transformation: The ascent of consciousness into higher spiritual realms and the subsequent descent of divine peace, light, and power. This stage involves transitioning through the levels of Higher Mind, Illumined Mind, Intuitive Mind, and Overmind.

3. Supramental Transformation: The final and most decisive stage where the Supermind (Truth-Consciousness) descends to radically transform the very fabric of terrestrial nature, erasing the divide between knowledge and will.

The article concludes that Sri Aurobindo's vision of Emancipation is not merely a philosophical theory but a practical roadmap for a collective shift in human existence. By transcending the limitations of the mental ego and establishing the Supramental Truth, humanity can evolve into a new divine species, turning earthly life into an expression of unity, harmony, and infinite delight.

Keywords: Uttaran, Triparba, Chinmoy, Bodhi, Atimānasik

উত্তরণ বলতে বোঝায় এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া। এক কথায় বলা যায় ঊর্ধ্বে গমন করা। উত্তরণের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Emancipation। বাংলা ভাষায় উত্তরণের প্রতিশব্দ হিসাবে প্রগতি, উন্নয়ন, বিপ্লব ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়। তবে এই প্রগতি, উন্নয়ন ও উত্তরণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। উন্নয়ন বা প্রগতি মূলত বাহ্যিক পরিবর্তনের কথা বলে, যেমন— সামাজিক পরিবর্তন। কিন্তু উত্তরণ মানুষের অন্তরের পরিবর্তনের কথা বলে। তাই এখানে উত্তরণ মানবোত্তরণ অর্থাৎ প্রবৃত্তির তলদেশ থেকে চেতনার শিখরে আরোহণ।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে এই 'উত্তরণ' শব্দটি মুক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। চার্বাক ব্যতীত প্রত্যেক দর্শন প্রণেতা আত্মার মুক্তিকেই দর্শনের পরম উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সমকালীন ভারতীয় দর্শনচিন্তায় এক নতুন মাত্রা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, মহাত্মা গান্ধী, বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর, প্রমুখ দার্শনিকগণ উত্তরণকে কেবল পারলৌকিক মুক্তির বিষয় হিসাবে নয় বরং মানবচেতনার ক্রমোন্নয়ন হিসাবে দেখেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের বক্তব্যে এটা স্পষ্ট হয় যে, প্রবৃত্তির গণ্ডী ছাড়িয়ে নিবৃত্তির শিখরে আরোহণই হল উত্তরণ। যেখানে মানুষ স্বার্থের সীমা ভেঙে সার্বজনীন মানবতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে, গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রাচীন ও সমকালীন উভয় ভাবধারার ভাবনাই মূলত একে অপরের পরিপূরক। দুই ক্ষেত্রেই মুক্তি ও উত্তরণের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য এক— মানুষকে তার সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব থেকে বের করে চেতনার মুক্ত আকাশে উত্তীর্ণ করা। কারণ, প্রবৃত্তির গণ্ডী কখনোই মুক্তির পথ দেখাতে পারে না, মুক্তি নিহিত আছে নিবৃত্তির শান্ত শিখরে।

সমকালীন ভারতীয় দর্শনচিন্তায় যে সকল মনীষিদের নাম পাই তাঁদের মধ্যে শ্রী অরবিন্দ অন্যতম। কারণ, তিনি তাঁর জীবনের যাপনকে যেভাবে উত্তরণের ধারায় প্রবাহিত করেছেন তা অন্য কোন মনীষিদের মধ্যে পাই না। এই গবেষণামূলক নিবন্ধে শ্রী অরবিন্দের জীবনের যাপনে যে উত্তরণ, তার দিকে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হবে। শ্রী অরবিন্দের জীবন শৈলী এমন এক সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করে যা সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব থেকে বের করে চেতনার মুক্ত আকাশে উত্তীর্ণ করে।

সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সাধারণ মানুষ শ্রী অরবিন্দকে দুইভাবে চেনেন, এক) ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনকারী বিপ্লবী হিসাবে এবং দুই) সংসার-বিরাগী একজন ঋষি হিসাবে। এই দুই পরিচয়ের ঊর্ধে তাঁর আর এক পরিচয় হল তিনি দার্শনিক। তাঁর দর্শনিক ভাবনা গভীর। তিনি ভারতবাসীর জীবনের যাপন দেখে ব্যথিত হয়ে সমাধান দিয়েছেন তাঁর ত্রয়ী বিদ্যায়— বেদ, উপনিষদ ও গীতা ভাষ্যে। এই ত্রয়ী বিদ্যাকে কেন্দ্র করে লিখলেন—*The Secret of the Veda, Eight Upanishads* এবং *Essays on the Gita* । তিনি সেই ব্যথিত হৃদয়ে মানুষের দিব্য নিয়তির একটি চিত্র উপস্থাপন করলেন তাঁর *The Life Divine* গ্রন্থে। আর দিব্য জীবন লাভের উপায় নির্দিষ্ট করলেন *The Synthesis of Yoga*-এ। এ সবকিছুকে ঘিরে তাঁর অপরূপ কাব্য হল *Savitri* ।

শ্রী অরবিন্দের চিন্তায় বুদ্ধির যুক্তি আর বোধির যুক্তির ধারা এক নয়। অনেক তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে একটা সিদ্ধান্তকে দাঁড় করানো— এ হল যুক্তির রীতি। কিন্তু ইন্দ্রিয়নির্ভর বুদ্ধির পক্ষে কোনও বিষয়েরই সকল তথ্যের সম্পূর্ণ সঙ্কলন সম্ভব নয়। ফলে সিদ্ধান্ত হয় একপেশে। যুক্তির দীপ একটা বিশেষ ক্ষেত্রের খানিকটা আলোকিত করতে পারে মাত্র, তার উপরে-নিচে, আশে-পাশে থেকে যায় সমান অন্ধকার। এর প্রমাণ পাই যখন আমরা জৈন স্যাদবাদের দিকে তাকাই। যুক্তির দীপের ক্ষেত্রে থেকে যাওয়া যে অন্ধকার সেই অন্ধকার তরল হতে পারে বোধির আলোকে। এক্ষেত্রে আত্মবোধ এবং আত্মব্যাপ্তি হল তার ভিত্তি। বিষয়কে জানতে হবে আমার বাইরে রেখে নয়, তাকে আমার ভিতরে টেনে এনে, নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে। আগে ইন্দ্রিয়কে শান্ত করতে হবে, মনকে করতে হবে স্তব্ধ, তারপর নিস্তরঙ্গ আত্মবোধের স্বচ্ছ শূন্যতায় জাগিয়ে তুলতে হবে বিষয়ের সংস্কারকে। ফলে আত্মা আর অনাত্মার ভেদ দূর হয়ে আত্মব্যাপ্তির প্রসন্ন জ্যোতিতে তখন অনাবৃত হবে বিশ্বের মর্মরহস্য। সান্তে-অনন্তে, ব্যক্তে-অব্যক্তে, রূপে-অরূপে, সগুণে-নির্গুণে, একত্বে-বহুত্বে কোনও দ্বন্দ্ব তখন আর থাকবে না। আত্মবোধের কেন্দ্র হতে বিশ্ববোধের বৈচিত্র জাগবে বিশ্বোত্তীর্ণ অনুভবেরই সত্য বিভূতিরূপে।[১]

[১] *দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ,* অনির্বাণ, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির। পৃষ্ঠা-১৩৪

ব্যবহারিক জগতে দ্বন্দ্ব থাকবেই— ব্যবহারের প্রয়োজনে। ব্যবহারে ভেদজ্ঞান যেমন দরকার, তত্ত্বদর্শনে তেমনি দরকার পূর্ণ অভেদজ্ঞানের। আমাদের চেতনায় কতকিছু এসে স্তুপাকার হয়, সেগুলিকে আমরা ঠিকমত গুছিয়ে নিতে পারি না, ফলে দেখা দেয় আমাদের চিন্তায় এবং কর্মে নানা অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতিই তত্ত্বদর্শনের ক্ষেত্রে পূর্ণ অভেদজ্ঞানে বাধা সৃষ্টি করে। শ্রী অরবিন্দের দর্শন ভাবনায় দেখা যায় যে, এই পার্থিব জগতে একটা খেলা চলছে, অজ্ঞানতার খেলা, সেই খেলা তখনই পূর্ণতা পাবে যখন চেতনার এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে অর্থাৎ অতিমানসে পৌঁছাবে। এই পরিবর্তনের পথই হল উত্তরণ। আসলে উত্তরণের মাধ্যমে যে স্থিতিতে আমরা পৌঁছাতে চাই, সেই চেতনার স্বরূপ বুঝতে হলে শ্রী অরবিন্দের ত্রিপর্বা রূপান্তর উপলব্ধি করা আবশ্যক। এই উপলব্ধিই নির্দেশ করে উত্তরণের পর চেতনা কিভাবে ঐক্য ও বহুত্বের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। অজ্ঞানতা থেকে অতিমানসে পৌছানোর জন্য যে পথটি অনিবার্য তা হল ত্রিপর্বা রূপান্তর অর্থাৎ চেতনার তিনটি মৌলিক পরিবর্তন।

শ্রী অরবিন্দকে অনুসরণ করে বলা যায়, মানুষের মন যখন বিকশিত হতে থাকে, তখন তাকে প্রথমে অধিমন (overmind) এর অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়, যেখানে সে বিশ্বজনীন চেতনার অভিজ্ঞতা পায়। কিন্তু পুর্ণ রূপান্তরের জন্য তাকে অধিমন (overmind) কেও অতিক্রম করে অতিমানসে আরোহন করতে হবে, কারণ, কেবল অতিমানসই পারে সেই চূড়ান্ত সত্যকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে।[২]

অতিমানস, মনেরও ঊর্ধে শ্রীঅরবিন্দ যে পরম সত্যকে স্থাপন করেছেন, তা হল সচ্চিদানন্দ। উত্তরণের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল এই পরম সত্যকে উপলব্ধি করা এবং পৃথিবীতে এর প্রকাশ ঘটানো। অতিমানস সচ্চিদান্দেরই একটি শক্তি, যা সৃষ্টির কার্য সম্পাদনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে।

মানব চেতনার বর্তমান অবস্থাটি হল এক বিশেষ ধরণের খেলা যেখানে মন অজ্ঞানতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জ্ঞানের অনুসন্ধান করে। আমাদের এই সত্তা সীমাবদ্ধতা, দ্বৈততা এবং অহং-এর জালে আবদ্ধ, যা বিশ্বসত্তার অখণ্ড আনন্দ ও সত্য থেকে আমাদের বিছিন্ন করে রাখে। এই বিচ্ছিন্নতা দূর করে মানবপ্রকৃতিকে তার আসল দিব্য প্রকৃতিতে উন্নীত করায় ছিল শ্রী অরবিন্দের লক্ষ্য যাকে উত্তরণ নামে অভিহিত করা যায়। এই উত্তরণ কিন্তু সরল নয় বরং তিনটি মৌলিক রূপান্তরের একটি সমন্বিত অভিযান।

এই প্রক্রিয়ার সূচনা হয় চৈত্যিক রূপান্তরের মাধ্যমে। এই প্রকৃতিতে মন, প্রাণ এবং দেহ হল প্রধান চালিকা শক্তি। কিন্তু তাদের গভীরে আছে আত্মার প্রতিচ্ছবি চৈত্য পুরুষ। এই চৈত্য পুরুষকেই সামনে আনতে হবে, যাতে এটি অহং-এর পরিবর্তে সমগ্র সত্তার নিয়ন্ত্রক হতে পারে। এটিই উত্তরণের ভিত্তি স্থাপন করে।

চৈত্য পুরুষের উপরেই নির্ভর করছে প্রকৃতিতে ব্যক্তিসত্তারূপে আমাদের অবস্থান। এই চৈত্য পুরুষের অন্যান্য অংশ (মন, প্রাণ এবং দেহ) কেবল যে পরিবর্তনশীল তাই-ই নয়, নশ্বরও বটে। তারা সময়ের সাথে সাথে এবং অভিজ্ঞতার চাপে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়, ভুলের শিকার হয় এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চৈত্য পুরুষ অবিনশ্বর, শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। সেকারণেই বিকাশের কোন অসম্পূর্ণতার জন্য সে দায়ী নয়। এই অসম্পূর্ণতা আসে অজ্ঞানতা থেকে। ঈশ্বরের অংশরূপে চিরপবিত্র দীপশিখার ন্যায় চৈত্য পুরুষ আমাদের মধ্যে বিরাজমান। এই চৈত্য পুরুষকেই সামনে আনতে হবে। এই চৈত্য পুরুষ যখন সামনে আসে তখন জীবনে এক নতুন শক্তি ও বিশুদ্ধতা নিয়ে আসে। শ্রী অরবিন্দের মতে, চৈত্য পুরুষকে সামনে আনার তিনটি প্রধান উপাদান হল, অভীপ্সা (Aspiration), অজ্ঞানতা বর্জন (Rejection of the Ignorance) এবং আত্মসমর্পণ

[২] *The Life divine,* sri aurobindo, P-935

(Surrender)।[৩] চৈত্য পুরুষ সাধারণত হৃদয়ের গভীর কেন্দ্রে বাস করে। অভীপ্সা অর্থাৎ এক ধরণের অভ্যন্তরীণ আগুণ হৃদয়ের গভীর কেন্দ্রে বাস করা চৈত্য পুরুষকে নাড়া দেয়। ফলে চৈত্য পুরুষ তার গূঢ়াবস্থা থেকে উত্থিত হয়ে চেতনার সম্মুখভাগে চলে আসে। চৈত পুরুষের সম্মুখে চলে আসা বলতে এটাই বোঝায় যে, এর উপস্থিতি দৈনন্দিন জাগ্রত চেতনায় অনুভূত হয়; দেহ, প্রাণ ও মনের উপর এর প্রভাব এমনই যে, এটি এদের অভাবের পরিপূরণ ঘটায়, এদের উপর কর্তৃত্ব করে, এদের ক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন আনে, এমনকি দেহের ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও।[৪]

চৈত্যিক ভিত্তি প্রস্তুত হওয়ার পর শুরু হয় আধ্যাত্মিক রূপান্তরের পর্ব। এটিই হল আরোহন এবং উপর থেকে শক্তির অবতরণ। একাধিক মধ্যবর্তী ক্রমের মাধ্যমে এই উত্তরণ সম্ভব হয়। এই ক্রমগুলি হল উত্তর মন, প্রভাস মন, বোধি মন এবং অধিমন।

'উত্তর মন' হল সাধারণ যুক্তিনির্ভর মনের ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রথম ও প্রাথমিক স্তর। একে একটি 'উজ্জ্বল ভাবচিত্ত' (a luminous thought-mind)[৫] ও বলা হয়, কারণ এখানে জ্ঞান কোনো যুক্তি বা তর্কের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, বরং আধ্যাত্মিক একত্ব থেকে সরাসরি ধারণার আকারে নির্গত হয়। আমাদের সাধারণ মন যেখানে অবিদ্যা বা অজ্ঞতার মধ্যে খুঁড়িয়ে চলে এবং প্রমাণের মাধ্যমে সত্যে পৌঁছাতে চায়, উত্তর মনে সেই সীমাবদ্ধতা নেই। এটি স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বচ্ছ জ্ঞানের আধার, যা মূলত অতিমানস থেকে উদ্ভূত হয়ে সত্যের আলোক ছড়িয়ে দেয়।

উত্তর মনের দুটি দিক আছে— একটি জ্ঞানাত্মক এবং অন্যটি ইচ্ছা বা কার্যকারিতার দিক। এটি কেবল সত্যকে জানে না, বরং 'ভাব-শক্তি'র মাধ্যমে আমাদের দেহ, প্রাণ এবং নিম্নতর মনকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে। তবে এই রূপান্তরের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের অবর প্রকৃতির অন্ধ অভ্যাস, আবেগ এবং জড়তা। অনেক সময় এই বাধার কারণে উত্তর মনের শক্তি সাধারণ মানসিক স্তরে নেমে এসে স্তিমিত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও, উত্তর মন আমাদের চেতনার আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে এবং সত্তাকে আরও উচ্চতর স্তর, যেমন 'প্রভাস মন'-এর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

'প্রভাস মন' হল চেতনার এমন এক উচ্চতর স্তর যা চিন্তার সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে সরাসরি সত্যের আলো ও দর্শনের দ্বারা পরিচালিত হয়। সাধারণ মন যেখানে যুক্তি ও চিন্তনের মাধ্যমে সত্যের একটি প্রতিরূপ তৈরির চেষ্টা করে, প্রভাস মন সেখানে দিব্য আলো বা 'ভিশন'-এর মাধ্যমে সত্যের মর্মবস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করে।[৬] এই স্তরে জ্ঞান আর পরোক্ষ থাকে না, বরং তা হয়ে ওঠে অব্যবহিত এবং ব্যাপক। প্রভাস মন 'এক বীর্যশালী ও কর্মশীল সমাহরণ' (powerful and dynamic integration)[৭] সম্পন্ন করতে পারে। এটি কেবল আমাদের মনকে নয়, বরং হৃদয়ের আবেগ, প্রাণের গতিশীলতা এবং এমনকি জড় দেহের কোষগুলোকেও আধ্যাত্মিক শক্তিতে উদ্ভাসিত করে। প্রভাস মন আমাদের সত্তার জড়তা ও সন্দেহ দূর করে পরমেশ্বরের সঙ্গে এক মূর্ত ও জীবন্ত সংযোগ স্থাপন করে, যার ফলে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে দিব্য অস্তিত্ব অনুভব করা সম্ভব হয়।

'বোধি মন' হল চেতনার এক উচ্চতর জ্যোতির্ময় শক্তি, যা উত্তর মন ও প্রভাস মনের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে তাদের পূর্ণতা দান করে। এটি মূলত অতিমানস আলোকরেখার একটি প্রান্তীয় প্রকাশ এবং

---

[৩] *দিব্যজীবনের সন্ধানে*, পশুপতি ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা-৪৮ থেকে উদ্ধৃত

[৪] *শ্রী অরবিন্দের দর্শন*, ডঃ দিলীপ কুমার রায়,পৃষ্ঠা -১২০-২১ থেকে উদ্ধৃত।

[৫] *The life divine*, sri Aurobindo, P-974

[৬] *The life divine*, sri Aurobindo, PP -979-980

[৭] *The life divine*,Sri Aurobindo, P-980

তাদাত্ম্যজ্ঞানের অত্যন্ত নিকটবর্তী এক অন্তরঙ্গ শক্তি। বোধি মনের অবস্থান প্রভাস মনেরও ঊর্ধ্বে; সেখান থেকে আহরিত সত্যকে উত্তর মন ও প্রভাস মন যথাক্রমে মনন ও দর্শনের রূপ দিয়ে মানুষের রূপান্তরের জন্য প্রেরণ করে।

বোধি মনের এই আলোক বিচ্ছুরণ সাধারণত তিনটি ধারায় ঘটে থাকে। প্রথমত, যখন কোনো বিষয়ের সংস্পর্শে এসে চেতনা সেই সত্যের সাথে প্রতিধ্বনিশীল হয়, তখন স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বোধি জাগ্রত হয়। দ্বিতীয়ত, চেতনা যখন বাহ্যিক সংস্পর্শ ছাড়াই আত্মমুখী হয়ে নিজের অন্তরের গূঢ় সত্য বা শক্তিকে অপরোক্ষভাবে অনুভব করে, তখন বোধির স্ফুরণ ঘটে। তৃতীয়ত, পরমার্থ সৎ বা আধ্যাত্মিক সত্তার সঙ্গে চেতনার গভীর সংযোগ ঘটলে সেখানে আকস্মিক বিদ্যুৎ-চমকের মতো বোধিসম্পন্ন সত্য-প্রত্যক্ষ প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে।[৮]

এই বোধি মন মূলত স্বরূপসত্যের এক অনন্য স্মৃতি বা বাহন। এর সামর্থ্য চারটি প্রধান বিভাবে বিভক্ত: প্রত্যাদেশ বা সত্য-দর্শন, ভাবগ্রাহ বা সত্য-শ্রুতি, বোধিমূলক প্রত্যক্ষ বা মর্মসত্যের অধিকার এবং বোধিমূলক বিচার বা সত্যের যথাযথ সম্বন্ধ নির্ণয়।[৯] বোধি মন বুদ্ধির সমস্ত কাজই সম্পন্ন করে, তবে তা বুদ্ধির চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ায়। এটি কেবল মানুষের চিন্তা জগতকে নয়, বরং হৃদয়, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এমনকি দৈহিক চেতনাকেও নিজের জ্যোতিতে গ্রহণ করে এক আমূল রূপান্তর সাধন করে।

'অধিমন' হল আধ্যাত্মিক চেতনার একটি উচ্চতর স্তর, যা মূলত অতিমানসের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। এটি দিব্য জ্যোতিতে ভাস্বর হলেও একাধারে সত্যের অখণ্ড আলোকে আমাদের থেকে আড়াল করে রাখে। সাধকের চেতনা যখন এই স্তরে আরোহণ করে, তখন সে বিশ্বাত্মার সাথে যুক্ত হতে পারে এবং পরম সত্যের দর্শন পায়; কিন্তু এই স্তরের পক্ষে ব্যক্তিকে ব্রহ্মাণ্ডের সীমানা অতিক্রম করিয়ে পরম সত্যের মূল উৎস বা অতিমানসে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ, কেবল অতিমানসই নিজের আধারে সত্য ও ঋতের (Divine Law) পূর্ণ সামর্থ্য ধারণ করে।[১০]

মানুষের জীবনের আমূল এবং স্থায়ী রূপান্তরের জন্য অতিমানস স্তরে আরোহণ এবং সেই দিব্য চেতনার মর্ত্যে অবতরণ অনিবার্য। অতিমানসের স্পর্শ ছাড়া উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলো মনের গহনে স্থায়ী হয় না। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, জড়, প্রাণ ও মনের মতোই অতিমানস এই সৃষ্টিতে সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান। তাই বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই এর পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে। যখন নিম্নতন আধারে অতিমানসী আলোকের অবতরণ ঘটবে, তখনই পৃথিবীতে এক দিব্য জীবনের সূচনা সম্ভব হবে।

এই রূপান্তরে উচ্চতর জগতের আলো, শান্তি, জ্ঞান, শক্তি এবং আনন্দের এক প্রবল ধারা তখন শরীর ও জীবনের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত অবতরণ করতে শুরু করে। এই উত্তরণকালে চেতনা উচ্চতর মন, আলোকিত মন এবং বিশেষত অতিমানস পরবর্তী (Over mind) স্তর পর্যন্ত উন্নীত হয়। এই অতিমানস পরবর্তী স্তরেই ঐক্যবোধ বজায় থাকলেও বহুত্বের পৃথিকীকরনের উপর মনোযোগ পড়ে। এটিই হল চেতনার বিভাজনের সুচনা। এই আধ্যাত্মিক পরিবর্তন অজ্ঞানতার বাঁধন থেকে মুক্ত করে এক বিশাল আধ্যাত্মিক মুক্তি এনে দেয়। তবে মুক্তিই এই উত্তরণের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, চূড়ান্ত লক্ষ্য হল অতিমানসিক রূপান্তর।

এই অতিমানস হল সেই সত্য চেতনা যা ঐক্য ও বহুত্বকে এক সাথেই অবিভাজ্যরূপে জানে। এই শক্তির অবতরণের ফলে মন, প্রাণ ও দেহ চিরতরে পরিবর্তিত হয়ে যায়। মানব মন রূপান্তরিত হয় আলোকময় মনে।

---

[৮] *শ্রী অরবিন্দের দর্শন,* ডঃ দিলীপ কুমার রায়,পৃষ্ঠা -১২৮ থেকে উদ্ধৃত।

[৯] *The life divine,* sri Aurobindo, p-983-984

[১০] *শ্রী অরবিন্দের দর্শন,* ডঃ দিলীপ কুমার রায়,পৃষ্ঠা -১২৯ থেকে উদ্ধৃত।

সমগ্র প্রকৃতি তখন অজ্ঞতা, ভুল ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে দিব্য প্রকৃতিতে পরিণত হয়। এই ত্রিমুখী রূপান্তরের মাধ্যমে একজন সত্তা যখন অতিমানসিক স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হন তখন তাঁর চেতনা পৃথিবীতে এক নতুন জীবন ও সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেয়।

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা বোধগম্য হয় যে, শ্রী অরবিন্দের চেতনার উত্তরণ প্রক্রিয়া কেবল কোনো দার্শনিক তত্ত্ব নয়, বরং পৃথিবীতে পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌছানোর একমাত্র উপায়। আমাদের সাধারণ মন এই মহাজাগতিক সত্যকে খণ্ড খণ্ড করে দেখে এবং এই বিভেদই জীবনের সমস্ত দ্বন্দ্ব, দুঃখ বরং অপূর্ণতার কারণ। উত্তরণের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল এই মানসিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে অতিমানস-এ স্থিত হওয়া।

উত্তরণের এই পথটি নির্ধারিত হয়েছে ত্রিপর্বা রূপান্তরের মাধ্যমে। প্রথমে চৈত্যিক রূপান্তর আমাদের সত্তার অভ্যন্তরীণ কেন্দ্র আত্মাকে সামনে এনে সমগ্র মন, প্রাণ ও দেহকে শুদ্ধ করে উচ্চতর শক্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে। এরপর আধ্যাত্মিক রূপান্তর চেতনার বিশ্বজনীন প্রসার ঘটায় এবং উচ্চতর জগত থেকে শান্তি, শক্তি ও জ্ঞানের অবতরণ নিশ্চিত করে, যা আমাদের অহং-এর শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু মুক্তি প্রাপ্তিই শ্রী অরবিন্দ-এর উত্তরণের শেষ কথা নয়। চূড়ান্ত পর্ব হল অতিমানসিক রূপান্তর, যেখানে অতিমানসের সত্য-চেতনা এবং ত্রিবিধ অবস্থা আমাদের প্রকৃতির সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত নেমে আসে। এই রূপান্তর অতিমানস পরবর্তী মায়া (overmind Maya)-বিভাজনকারী প্রভাবকেও মুছে ফেলে এবং সম্পূর্ণ সত্তাকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে যায় যেখানে জ্ঞান এবং শক্তি সম্পূর্ণভাবে অভ্রান্ত ও সমন্বিত। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মন রূপান্তরিত হয় আলোকময় মনে। প্রাণ রূপান্তরিত হয় দিব্য শক্তিতে এবং দেহ রূপান্তরিত হয় এক নতুন দিব্য প্রকৃতির আধারে।

অতএব, উত্তরণ একটি ব্যক্তিগত যাত্রা হলেও এর ফলিত দিকটি হল বিশ্বজনীন। এই রূপান্তর শুধু ব্যক্তির আত্মার মুক্তি আনে না, বরং পৃথিবীর সামগ্রিক চেতনাকে প্রভাবিত করে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) অনির্বান। দিব্য-জীবন। (২০২০) তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির।
২) অনির্বান। দিব্য-জীবন প্রসঙ্গ। (২০২০), তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির।
৩) ঘোষ, পঙ্কজকুমার। শ্রীঅরবিন্দ-কথা। (২০২১), দ্বিতীয় মুদ্রণ, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
৪) চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ। উপনিষদাবলী। (২০১৯), তৃতীয় মুদ্রণ, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
৫) বসু, সুরেন্দ্রনাথ। ভারতীয় সংস্কতির ভিত্তি। (২০১৫) দ্বিতীয় সংস্করণ, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
৬) ভট্টাচার্য, পশুপতি। দিব্যজীবনের সন্ধানে। (২০২১) দশম মুদ্রণ, পন্ডিচেরি: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট।
৭) মজুমদার, আশিস। আত্মজীবনীমূলক কথা। (২০২৩) চতুর্থ মুদ্রণ, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
৮) রায়, সুনীল। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন মন্থনে। (২০০৭) প্রথম প্রকাশ, প্রকাশনা বিভাগ: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
৯) রায়, দিলীপ কুমার। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শন। (২০১৭), কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির।
১০) শ্রীঅরবিন্দ। চিন্তাকণা ও সূত্রমালা। (২০১৮) চতুর্থ মুদ্রণ, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
১১) শ্রীঅরবিন্দ। পৃথিবীতে আতিমানস বিকাশ। (২০১৯) পঞ্চম মুদ্রণ, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
১২) শ্রীঅরবিন্দ। মানব যুগচক্র। (২০১৯) দ্বিতীয় সংস্করণ, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
১৩) শ্রীঅরবিন্দ। যোগসমন্বয়। (২০১৬) তৃতীয় মুদ্রণ, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
১৪) শ্রীঅরবিন্দ। আদর্শ মানব ঐক্য। (২০২৩) প্রথম প্রকাশ পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
১৫) Sri Aurobindo. The Life Divine. (2020) fifth impression Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram.

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No.570-576
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.246

প্রসঙ্গ নৈতিক আদর্শ ও মুল্যবোধ: প্রেক্ষাপট ভারতীয় নীতিদর্শন

পারমিতা রায়, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 17.01.2026; Accepted: 20.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The article mainly talks about two great Indian philosophies: Buddhism and Jainism. First, it explains Buddhism. Lord Buddha taught the Four Noble Truths. He said that suffering is a part of life, but there is a way to end it. To find peace, people should follow the Eightfold Path. This path includes simple things like speaking the truth, doing good work, and having good thoughts. These rules help people improve themselves and find a balance between old and new ways of living.

Second, the article discusses Jainism. Jainism gives us Five Main Rules (*Pancamahāvrata*). The most important rule is Non-violence (*Ahimsā*). It means we should not hurt any living being with our work, our words, or even our thoughts. It also teaches us to be honest and not to take things that do not belong to us. These rules help people live a disciplined and kind life.

The article shows that true values are timeless. Just like a river that keeps flowing even if its path changes, moral truths remain the same in every age. These ancient Indian lessons serve as a guiding light for the new generation. They teach us how to be more compassionate, how to help others, and how to find real happiness in today's busy world.

Keywords: Ideal values, Moral ideals, Buddhist philosophy, Jain philosophy, good character, non-violence, eternal peace and a disciplined way of life

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এ ভাবনা স্বাভাবিক যে, নীতিহীনতা বা তথাকথিত দুর্নীতিপরায়ণতাই বোধ হয় বর্তমান নীতি। তাই সমকালীন মানুষের মনে প্রশ্ন— আমাদের পুরনো মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা কী সম্ভব? সনাতন আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা কী আমাদের টেনে নিয়ে যাবে অবলুপ্তির পথে? যা কিছু এতদিন সত্য বলে মেনেছি, ধ্রুব বলে জেনেছি, কল্যাণ-সুন্দর বলে চিনেছি সে সবই কী বিসর্জন দিতে হবে? প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের মতো আমরাও কী লুপ্ত হয়ে যাবো? প্রাচীন ও নবীন জীবন বোধের মধ্যে কোথাও কী সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব? এ বিশ্বে সত্যিই কী আছে শাশ্বত কোনো নৈতিক আদর্শ যা নতুন প্রজন্মের কাছে প্রকাশ করবে? এই প্রশ্নগুলি এবং এরকম অনেক সম্যসার সমাধান করতে হলে ভারতের সনাতন নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হতে হবে, অবহিত হতে হবে। ভারতের সনাতন নৈতিক আদর্শ মানুষকে কেবল নৈতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেনা, সেই সঙ্গে নতুন নীতিনিষ্ঠ হওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের জীবনচর্যাকেও অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়। কয়েক সহস্র বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর আজও ভারতীয় নীতিদর্শনের আনুগামীরা জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে ভারতের নৈতিক ধ্যান ধারণা আনুসারে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপন করে চলেছেন। ভারতীয় নীতিদর্শন মানুষকে শুধু যে সুন্দর চরিত্র লাভের আধিকারী করতে চেয়েছেন তা নয়, তাঁকে

মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে। মানবজীবনের নৈতিক সাধনা সর্বদাই এক গভীর অনুসন্ধানের ইতিহাস— যেখানে মানুষ নিজের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে চেয়েছে মুক্তি, শুদ্ধি এবং এক চিরস্থায়ী শান্তি। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এই আত্মিক সাধনার সর্বোচ্চ রূপ প্রকাশ পেয়েছে বৌদ্ধ ও জৈন নীতিদর্শনে। উভয় দর্শনের মূল চেতনা এক আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের দিকে ইঙ্গিত করে— যেখানে ধর্ম মানে কোনো দেবতাপূজিত কর্তব্য নয়, বরং নৈতিক বোধের জাগরণ। এই জাগরণই মানুষকে করে তোলে মানবিক, সহানুভূতিশীল এবং মুক্ত। বৌদ্ধ নীতিদর্শনের চারটি আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, পঞ্চশীল এবং জৈন নীতিদর্শনে মহাব্রত বা অনুব্রত প্রকৃতপক্ষে মানুষকে চরিত্রবান করার নীতি। বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত দুটি নীতিদর্শনকে অনুসরণ করে নৈতিকতার আলোকে উপরিউক্ত জিজ্ঞাসাগুলির নীতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণই মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

বৌদ্ধ নীতিদর্শনের অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস হল আর্যসত্যচতুষ্টয়, অর্থাৎ চারটি মহাসত্য, যা মানবজীবনের দুঃখ ও দুঃখমুক্তির তত্ত্বকে এক নৈতিক ও অস্তিত্ববাদী কাঠামোয় রূপ দিয়েছে। একে এক শাশ্বত নৈতিক আদর্শ বলা যেতে পারে। কারণ, পৃথিবী ধ্বংস হলেও এই নৈতিক আদর্শের কোন হানি ঘটবে না। এই শাশ্বত নৈতিক আদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে এক আশীর্বাদস্বরূপ। এই চিরন্তন নৈতিক আদর্শ প্রাচীন ও নবীন জীবনবোধের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আর্যসত্যচতুষ্টয়:

ক্রম	আর্যসত্য	অর্থ
প্রথম আর্যসত্য	দুক্খং অরিয়সচ্চং	দুঃখ সত্য
দ্বিতীয় আর্যসত্য	দুক্খসমুদয়ং	দুঃখ সমুদায় সত্য
তৃতীয় আর্যসত্য	দুক্খনিরোধং	দুঃখ নিরোধ সত্য
চতুর্থ আর্যসত্য	দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা	দুঃখ নিরোধ মার্গ সত্য[১]

প্রথম আর্যসত্য:

গৌতমবুদ্ধের বোধিলব্ধ প্রথম আর্যসত্য হল দুঃখ সত্য। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল 'সর্বম্ দুঃখম্ দুঃখম্'[২]। এখানে দুঃখ কেবল যন্ত্রণার প্রতীক নয়, বরং অস্তিত্বের অস্থিরতার প্রতীক। প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি সম্পর্ক, প্রতিটি বস্তুই যেহেতু ক্ষণিক, তাই তার মধ্যে চিরস্থায়ী আনন্দের বাস অসম্ভব। এই ক্ষণিকতার বোধই বৌদ্ধ নীতির প্রথম পাঠ— যে পাঠ মানুষকে শেখায় সমস্ত সুখ-আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও বিচ্ছেদের অনিবার্যতা। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই এই দুঃখ জীবনের সঙ্গী। শিশুর প্রথম কান্না যেন সেই দুঃখেরই ঘোষণা— "জীবন মানেই অনিত্যতার স্বীকারোক্তি।"

জীবন মানেই প্রবাহ, পরিবর্তন, ক্ষয়—অর্থাৎ অনিত্যতা। যে মুহূর্তে আমরা কোনও আনন্দ বা সুখকে আঁকড়ে ধরতে চাই, সেই মুহূর্তেই দুঃখের বীজ রোপিত হয়। কারণ, যা ক্ষণিক, তাকে স্থায়ী ভাবার মোহ থেকেই জন্ম নেয় অসন্তোষ। এইভাবে দুঃখ শুধু অনুভূতির নয়, বরং জ্ঞানগত এক উপলব্ধির নাম— অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত অস্থিরতার স্বীকৃতি।

গৌতমবুদ্ধের কথায়, "জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ; প্রিয়জন থেকে বিচ্ছেদ দুঃখ, অপ্রিয়ের সংস্পর্শ দুঃখ, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ না হওয়া দুঃখ।"[৩] এই কথার অর্থ, জীবনের প্রতিটি অবস্থাই দুঃখের সম্ভাবনায় পূর্ণ। তবে, গৌতমবুদ্ধ দুঃখকে হতাশার প্রতীক হিসাবে দেখেন নি; বরং জাগরণের দ্বার হিসেবে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন।

দুঃখ সত্য স্বীকার মানেই পরাজয় নয়, বরং আত্মজাগরণের সূচনা। কারণ, যে দুঃখকে দেখে, সে ধন দেখে না, সুখ দেখে না; কিন্তু সে দেখে মুক্তি— যা দুঃখের ওপারে।

দ্বিতীয় আর্যসত্য:

গৌতমবুদ্ধ কেবল দুঃখের ঘোষণা করেই থেমে যাননি; তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন— "কেন এই দুঃখ?"। যেমন এক চিকিৎসক রোগ নিরাময়ের আগে রোগের কারণ নির্ণয় করেন, তেমনি গৌতমবুদ্ধ দুঃখের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তার মূল উৎস সন্ধান করেছেন। এই অনুসন্ধানের ফলই হল দ্বিতীয় আর্যসত্য— সমুদয় সত্য।[৪]

দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গৌতমবুদ্ধ কারণশৃঙ্খলের কথা বলেছেন। তিনি মোট বারোটি কারণশৃঙ্খলের কথা বলেছেন।[৫] সেই কারণ শৃঙ্খলের চরম ও সর্বপ্রথম কারণ হল অবিদ্যা। এই অবিদ্যা হল সকল দুঃখের মূল কারণ। অবিদ্যা বশতঃ জীব নানা কর্ম করে এবং তার ফলস্বরূপ দুঃখ ভোগ করে থাকে। এই মূল কারণ অবিদ্যা নিরসন হলে পরম্পরাক্রমে সকল কারণ বিনষ্ট হয়, ফলে দুঃখও নিরুদ্ধ হয়।

অবিদ্যা থেকে সংস্কারের উৎপত্তি—অজ্ঞতার কারণে মানুষ কর্ম করে, কর্ম থেকে জন্ম নেয় চেতনা, চেতনা থেকে নাম-রূপ, এভাবে চলতে থাকে দুঃখের কারণচক্র। এই কারণচক্রই সংসারের মূল। যদিও অবিদ্যা মূল কারণ, তাসত্ত্বেও গৌতমবুদ্ধ কখনও কখনও তৃষ্ণাকেও দুঃখের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

তৃতীয় আর্যসত্য:

অবিদ্যা নিরসনে পরম্পরাক্রমে যে কারণ বিনষ্ট হয়, তার ফলস্বরূপ দুঃখও নিরুদ্ধ হয়। এর থেকেই এটা স্পষ্ট হয় দুঃখ নিরোধ সম্ভব। এই সত্যের নাম নিরোধসত্য, যার অর্থ— দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি।[৬] এই চূড়ান্ত অবস্থা, যেখানে আর কোনো জন্ম, মৃত্যু, বা দুঃখের পুনরাবির্ভাব নেই, তাকে বলে *নির্বাণ*। এই *নির্বাণ* অবস্থায় মানুষ সমস্ত প্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে উঠে যায়; সেখানে নেই কোনো আকাঙ্ক্ষা, নেই কোনো দ্বন্দ্ব, নেই কোনো 'আমি' ও 'আমার'—আছে কেবল নিস্তরঙ্গ শান্তি ও মুক্তি। তবে, নির্বাণ কোনো স্থান নয়, কোনো বাহ্য জগৎও নয়; এটি এক অবস্থান—এক চিত্তশুদ্ধি, যেখানে মন ও বুদ্ধি সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে পরম প্রশান্তিতে স্থিত হয়। এর থেকেই আমরা শিক্ষা পাই— মুক্তি বাহিরে নয়, অন্তরে নিহিত; অবিদ্যা ও আসক্তির অন্ধকার যতক্ষণ মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ততক্ষণ মুক্তির অভাব থেকেই যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল— মুক্তির এই পরম শান্তির অবস্থায় মানুষ কীভাবে প্রবেশ করবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই চতুর্থ আর্যসত্য—মার্গসত্যের আলোচনাই প্রবেশ করবো।

চতুর্থ আর্যসত্য:

মানবজীবনের পরম লক্ষ্য হল নির্বাণ। কারণ, নির্বাণ হল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এই নির্বাণের পথে পৌঁছানোর জন্য জীবের সর্বাঙ্গীণ সাধনা ও প্রস্তুতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সেই পূর্ণ প্রস্তুতির পথ নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে গৌতমবুদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গ-এর কথা বলেছেন[৭], যা মার্গসত্য নামে পরিচিত। এই আটটি মার্গ হল– সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।[৮]

দুঃখের নিবৃত্তি যে সম্ভব—এ বোধই যথেষ্ট নয়; কারণ মুক্তি কেবল ধারণা নয়, তা এক অন্তরযাত্রা, এক চেতনার রূপান্তর। মানুষ যতদিন কেবল জানে, ততদিন সে পথের বাইরে; কিন্তু যখন সে চলতে শুরু করে, তখনই সে মুক্তির পথে পা রাখে।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ:

সম্যক দৃষ্টি-অবিদ্যা এবং অবিদ্যাপ্রসূত আত্মা ও জগৎ সম্পর্কে মিথ্যাদৃষ্টিই দুঃখের মূল উৎস। সম্যক দৃষ্টির মাধ্যমে এই ভ্রান্ত দৃষ্টির বিনাশই হল নির্বাণ প্রাপ্তির প্রথমিক স্তর। মানুষের দৃষ্টি বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কর্মের প্রতিফলন ঘটে, কারণ ভ্রান্ত দৃষ্টি থেকেই অশুভ কর্মের উদ্ভব হয়। বৌদ্ধ দর্শনে কর্ম ও জ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক। বৌদ্ধ দর্শনে চারটি আর্যসত্যের যথার্থ জ্ঞানকেই বলা হয় সম্যক দৃষ্টি। দৈনন্দিন জীবনে সম্যক দৃষ্টি আমাদের শেখাই যে সকল বিষয়কে নিরপেক্ষ ভাবে অর্থাৎ কোন পূর্বগ্রহ বা মোহ ছাড়া সত্যকে উপলব্ধি করতে।

সম্যক সংকল্প- সম্যক দৃষ্টি থেকেই সম্যক সংকল্প উদ্ভূত হয়। অহিংসা, বৈরাগ্য ও বিশ্বমানবতা হল সম্যক সংকল্পের মূল ভাব। সম্যক দৃষ্টির আলকে সকলের প্রতি সদ্ভাব পোষণ করা, এছাড়া অন্যের প্রতি বিদ্বেষ না রাখার যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাই হল সম্যক সংকল্প, অন্যথায় নির্বাণের অন্বেষণে সম্যক সঙ্কল্প অর্থহীন হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনি দৈনন্দিন জীবনেও সম্যক সংকল্পের প্রয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম। যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় এবং তার উদ্দেশ্য যদি অন্যের কল্যান, সহমর্মিতা ও সততার ভাবনা থেকে করা হয় তখন ই তা সম্যক সংকল্পের প্রকাশ পেয়ে থাকে।

সম্যক বাক্-সম্যক সংকল্পকে বাস্তব জীবনে কার্যরূপ দেওয়া জরুরি। বাক্ বিভিন্ন কর্মের একটি প্রধান উপাদান। শুধু মিথ্যা কথা না বলাই বাক্ সংযম নয়, পরনিন্দা, পিশুনবাক্য ও অন্যের প্রতি কঠোর বাক্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকাও বাক্ সংযমের অন্তর্ভুক্ত। সম্যক বাক্ের অনুশীলন ব্যক্তিকে আত্মসংযমী, সহানুভূতিশীল ও নীতিবান করে তলে। এটি কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক বিকাশের উপায় নয় বরং সামাজিক সৌহার্দ্য ও সুষ্ঠ আচরণের প্রকাশ ঘটায়।

সম্যক কর্মান্ত-শুধু বাক্ সংযমেই সম্যক সংকল্পের পূর্ণতা লাভ হয়না। সম্যক সংকল্পের সঙ্গে কর্ম সংযমও অপরিহার্য। কর্ম সংযম অর্থাৎ সৎকর্ম ও নৈতিক আচরণ পালন করা, একই সঙ্গে হত্যা, স্বার্থপর কার্যকলাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। চুরি, হিংসা, মিথ্যাবাক্য ও মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকাই হল সম্যক কর্মান্তের মূল শিক্ষা।

সম্যক আজীব- সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য নানা উপকরণের প্রয়োজন হয়, তবে সেই প্রয়োজন মেটাতে অসৎ পথ বেছে নেওয়া উচিত নয়। জীবনের জন্য যা দরকার তা সৎ ও ন্যায়সঙ্গত উপায়ে অর্জন করা কর্তব্য। প্রতারণা, কপটতা ও অন্যায় উপায় পরিহার করে সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করাই হল সম্যক আজীব। সম্যক ব্যায়াম- 'ব্যায়াম' শব্দের অর্থ পরিশ্রম বা সচেতন প্রচেষ্টা। শারীরিক ব্যায়ামে যেমন দেহ সুস্থ থাকে ঠিক তেমনি মানসিক ব্যায়ামেও মন সুস্থ থাকে। চঞ্চল মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে মানসিক শুদ্ধতার চর্চা প্রয়োজন। যেমন অশুভ চিন্তা মন থেকে দূর করা, নতুন অসৎ ভাবনার উদয় রোধ করা, সৎ ও কুশল চিন্তার বিকাশ ঘটানো ইত্যাদি। সম্যক ব্যায়ামের মাধ্যমে অশুভ চিন্তা দূর করে নির্বাণার্থী নির্বাণ লাভের পথ প্রশস্থ করে।

সম্যক স্মৃতি—সম্যক স্মৃতি হল সমস্ত বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ও সজাগ থাকা। চারটি আর্যসত্য, ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয়বস্তু, শারীরিক ও মানসিক অবস্থার যথার্থ জ্ঞানের স্মৃতি যদি লোপ পায় তবে অর্জিত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। তাই কেবল জ্ঞান অর্জনই যথেষ্ট নয়, সেই জ্ঞানকে অক্ষুণ্ণ রাখতে ও অবিদ্যার পুনরাবির্ভাব রোধ করতে প্রতিটি বস্তুর যথার্থ স্বরূপ সদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

সম্যক সমাধি-বুদ্ধদেবের প্রদত্ত দুঃখ নিরোধ মার্গের শেষ স্তর হল সম্যক সমাধি, যা ধ্যান নামেও পরিচিত। অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথম সাতটি স্তর অতিক্রম করার পর নির্বাণার্থী ব্যাক্তি সকল অশুভ চিন্তা ও অনুভূতি থেকে

মুক্ত হয়ে শেষ স্তরে অর্থাৎ সম্যক সমাধিতে উপনীত হন। এই অবস্থাকে সপ্ত-সমাধি-পরিস্কার বলা হয়। সম্যক সমাধির মূলত চারটি স্তর এবং এই স্তরগুলির মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে চিত্তের শুদ্ধতা এবং নির্বাণলাভ সম্ভব হয়।

জৈন পঞ্চমহাব্রত:

জৈন দর্শনের যে নৈতিক আদর্শ উপস্থাপিত হয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়। জৈন নীতিতত্ত্বের এমন কিছু ভাবনা রয়েছে যা একদিকে যেমন অনন্য তেমনি বর্তমান সময়ের সঙ্গেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বৌদ্ধধর্মের অষ্টাঙ্গিক মার্গ যেমন নৈতিক পরিশুদ্ধি এবং আত্মোন্নতির পথ নির্দেশ করে তেমনি জৈনধর্মে পঞ্চমহাব্রত নৈতিক আর্দশ প্রতিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধির মূলভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। জৈন ধর্মের মতে জীবের শুধু জ্ঞান বা কর্মের দ্বারা মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়না। বরং জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিনটির সমন্বয়েই মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়। এই মোক্ষ লাভের জন্য সহায়ক পাঁচটি প্রধান কর্ম হল– অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। এই পাঁচটি একত্রে 'পঞ্চব্রত' নামে পরিচিত[৯]। এই ব্রতগুলি গৃহীদের এবং শ্রমণদের পালনীয় ব্রত। গৃহীদের ক্ষেত্রে এগুলি অনুব্রত এবং শ্রমণদের ক্ষেত্রে এগুলি মহাব্রত। কারণ, গৃহীদের ক্ষেত্রে এই ব্রতগুলি শিথিল করা হয়েছে এবং শ্রমণদের ক্ষেত্রে কঠোর করা হয়েছে, তাই অনুব্রত এবং মহাব্রত বলা হয়।

অহিংসাব্রত–অহিংসাকে ভিত্তি করে জৈন নীতিতত্ত্বে যে পঞ্চব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায় তা বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অহিংসা বলতে বোঝায় সকল প্রকার হিংসা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা কোনো জীবের ক্ষতি না করায় অহিংসার মূলভাব। যদিও অহিংসা শব্দটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় তবুও এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য গভীর। এটি কেবল কারোর ক্ষতি বা আঘাত না করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনা বরং সকল জীবের প্রতি ভালোবাসা ও মঙ্গল সাধনের মধ্যেই অহিংসা ব্রতের মূল অর্থ নিহিত।

সত্যব্রত–সত্যব্রতের অর্থ হল মিথ্যাভাষণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। জীবের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম যেন সর্বদা কল্যাণকর হয় এবং একই সঙ্গে হিতকর হয় সেই নীতিই সত্যব্রতের সারমর্মের মধ্যে নিহিত। শ্রমণদের জন্য সত্যব্রত কঠোর ভাবে পালনীয় হলেও গৃহস্থদের জন্য এই নিয়ম কিছুটা শিথিল। লক্ষণীয় যে, যে সত্যচর্চা অহিংসার পরিপন্থী, সেই সত্য পালন জৈনধর্মে স্বীকার্য নয়। কারণ জৈনধর্মে অহিংসা সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ। জৈনধর্ম অনুযায়ী সত্য বলার ফলে যদি কোনো জীবের প্রতি কষ্ট, আঘাত কিংবা ক্ষতি হয় তবে সেই সত্যও হিংসার অন্তর্গত বলে গণ্য হয়। তাই অহিংসার আদর্শ অক্ষুন্ন রাখতে সত্য বলার ক্ষেত্রেও সংযম পালন করা জরুরি।

অস্তেয়ব্রত— অস্তেয়ব্রত অহিংসাব্রতের পরিপূরক। অজ্ঞাতে কিংবা অনিচ্ছায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ না করায় হল অস্তেয়ব্রত। জীবের বেঁচে থাকার জন্য সম্পদের প্রয়োজনীয়তা একান্ত তবে তা অন্যের অনুমতি বা সম্মতি ব্যাতীত যদি গ্রহণ করা হয় তবে তাকে স্তেয় বা চোর্য বলা হয়। গৃহস্থদের জন্য এই ব্রতটি আংশিক ভাবে পালনীয় হলেও সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে এই ব্রত সম্পূর্ণ ভাবে পালনীয়। এই অস্তেয়ব্রতের চর্চা দৈনন্দিন জীবনে শুধু বস্তুগত চুরি থেকে বিরত থাকার শিক্ষা নয় বরং সত্যনিষ্ঠা, সততা এবং ন্যায়বোধের প্রতিফলন।

ব্রহ্মচর্য্যব্রত— ব্রহ্মচর্যের অর্থ এমন জীবনধারা বা আচরণ, যা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার উদ্দেশে গৃহীত হয়। সমস্ত ধরণের যৌনাচারে কায়িক, বাচিক ও মানসিক কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও সংযমই হল ব্রহ্মচর্যব্রত। সন্ন্যাসীদের জন্য এই ব্রত কঠোর ভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।

অপরিগ্রহব্রত— সমস্ত ভোগ্য-বস্তুর আসক্তি থেকে মুক্ত থাকাই অপরিগ্রহ। সঙ্ঘের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে শ্রমণদের সম্পূর্ণ ত্যাগী হতে হয়। কেবল জাগতিক বিষয়ই নয়, নিজের দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রতিও আসক্তি বিহীন হতে হয়। গৃহস্থদের জন্য অপরিগ্রহের পালন সীমিত ও সংযত ভাবে নির্ধারিত। অপরিগ্রহ আমাদের

এই শিক্ষাই দেয় যে, যা প্রয়োজন শুধু তাই গ্রহণ করা এবং অপ্রয়োজনীয় ভোগ থেকে বিরত থাকা। এই ভাবেই অপরিগ্রহ মানুষকে নৈতিক ও সুষম জীবনের পথে পরিচালিত করে।

ভারতীয় নীতিচিন্তার ইতিহাসে বৌদ্ধ ও জৈন নীতিদর্শন এক অনন্য সংলাপের জন্ম দিয়েছে— একদিকে করুণার তীব্র মানবতাবোধ, অন্যদিকে কঠোর আত্মসংযমের সুনিদিষ্ট আচার। আধুনিক সমাজ যখন ক্রমশ ভোগবাদিতা, প্রতিযোগিতা ও আত্মকেন্দ্রিকতায় আচ্ছন্ন, তখন এই দু'টি নীতিবোধ যুগের গহ্বরে লুকিয়ে থাকা শাশ্বত সত্যকে আমাদের সামনে নতুন করে উন্মোচিত করে। প্রাচীন ভারতীয় নীতিদর্শনের সত্যগুলি কেবল অতীতের স্মারক নয়; সমকালীন নীতি-সঙ্কটের অন্ধকারে এরা পথপ্রদর্শক আলোকশিখা। উক্ত দুই নীতিদর্শনের সম্মিলিত চেতনা প্রমাণ করে— নীতি কখনও পুরনো হয় না; সত্য কখনও লুপ্ত হয় না। মানবতার সৎ-প্রচেষ্টা যতদিন বহমান থাকবে, ততদিন সনাতন নৈতিক আদর্শই প্রাচীন ও নবীন জীবনবোধের মধ্যে সামঞ্জস্যের সেতুবন্ধন রচনা করবে। সবশেষে বলা যায়, নদী যেমন তার রূপ বদলায়, কিন্তু স্রোত বদলায় না, তেমনি নৈতিকতার মূল চেতনাও যুগে যুগে রূপান্তরিত হয়ে নতুন প্রজন্মকে পথ দেখিয়ে চলে।

---

১ *দীঘনিকায়, মহাবগগ,* মহাসতিপট্ঠান সূত্রান্ত, 'দুঃখসূত্র', *সংযুক্তনিকায়* ২১/৩/১/২

২ মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। *ভারতীয় দর্শন।* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,২০১৫, পৃষ্ঠা, ৮২।

৩. *দীঘনিকায়,* মহাসতিপট্ঠান সূত্রান্ত।

৪. Bodhi, Bhikkhu. *The Noble Eightfold Path: Way to the End of Suffering.* Buddhist Publication Society,1994, p. 5.

৫. Buddhaghosa. *The Path of Purification (Visuddhimagga)*, Translated by Bhikkhu Nanamoli, Buddhist Publication Society,2010, p. 599.

৬. Gethin, Rupert. *The Foundations of Buddhism.* Oxford University Press, 1998, p. 75.

৭. Bukkyo Dendo Kyokai. *The Teaching of Buddha*. 66th ed. Bukkyo Dendo Kyokai, 2005, p.163.

৮. Warder, A. K. *Indian Buddhism*. 3rd ed. Motilal Banarasidass,2000, p. 99.

৯. Bhargava, Dayanand. *Jaina Ethics*. Motilal Banarasidass, 1968.

গ্রন্থপঞ্জি:

বাংলা গ্রন্থ:

১. আচার্য মহাপ্রজ্ঞ। *অহিংসার এক অদৃশ্য দিক*। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক অনুব্রত সমিতি, ১৯৯৮।

২. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীকুমার। *সমন্বয় মার্গ*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭।

৩. চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী। *পালী ত্রিপিটক* (বাংলা ভাষায় পালি ত্রিপিটকের সার সঙ্কলন)। মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা ২০১১।

৪. চৌধুরী, সাধনকমল (সম্পাদিত ও ভাষান্তরিত)। *বিশুদ্ধ মজ্ঝিমনিকায়*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৫।

৫. ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ। *বৌদ্ধধর্ম্ম*। মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ ১৯০১।

৬. ভট্টাচার্য, অমিত। *বৌদ্ধ দর্শনম্* । সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা ২০০৭।

৭. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার। *ভারতীয় দর্শন*। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮।

৮. মহাস্থবির, রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন (সঙ্কলিত ও অনূদিত)। *মহাপরিনিব্বান সুত্তং*। মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ ১৯৪১।

৯. মুনিজী, শ্রীসুজষ। *জৈনধর্ম ও শাসনাবলী*। শ্রী অখিলভারতীয় স্বারক জৈনসংগঠন, ১ম সংস্করণ, ৬ই মে ২০০০।

১০. শাস্ত্রী, পঞ্চানন (সম্পাদিত)। *বৌদ্ধ-দর্শনম্*। গুপ্তপ্রেস, কলকাতা, ১৪০১।

১১. শ্যামসুখা, পূরণচাঁদ। *ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম*। জৈনভবন, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৩৮১।

ইংরেজি গ্রন্থ:

১২. Bodhi, Bhikkhu. *The Noble Eightfold Path: Way to the End of Suffering.* Kandy: Buddhist Publication Society,1994.

১৩. Buddhaghosa. *The Path of Purification (Visuddhimagga).* Translated by Bhikkhu *Ñāṇamoli*. Kandy: Buddhist Publication Society, 2010

১৪. Gethin, Rupert. *The Foundation of Buddhism*. Oxford: Oxford University Press, 1998.

১৫. *Ñāṇamoli*, Bhikkhu, trans. *The Path of Discrimination (Patisambhidāmagga).* London: Pali Text Society, 1982.

১৬. Warder, A. K. *Indian Buddhism*. Motilal Banarasidass Publishers, 1970.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 577-584
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.247

সাক্ষীপ্রতীতি দ্বারা অজ্ঞানের সিদ্ধি: মাধ্ব এবং অদ্বৈতমত বিচার

রাহুল ভৌমিক, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 09.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

One of the most significant and extraordinary subjects of discussion in Advaita Vedanta is Ajñāna. In the Advaita school, 'Ajñāna' is acknowledged as a distinct fundamental category or *Prasthāna*. Since Ajñāna is defined as *Sadasadbhyāmabilakṣaṇa*, an apprehension may arise that it is impossible to define its *Lakṣaṇa.* In response, the Advaitins state that the cessation of ignorance occurs when the knowledge of the identity between the *Jība* and *Brahman* is attained. Therefore, Jñānanibartyatba is the defining characteristic of Ajñāna. Even if the characteristic of Ajñāna is defined in this manner, an objection arises: since Brahman is the only *Pramēẏa* in Advaita school and Ajñāna is *Apramēẏa*, so no proof can be presented regarding Ajñāna. And if no proof can be provided, Ajñāna cannot be accepted as a distinct category. For the scriptures state— *"Lakṣaṇa-Pramāṇabhyāṁ-hi-Bastusid'dhiḥ"*. In reply to this objection, the Advaitins argue that although Ajñāna is not established through conventional means of proof, it is not entirely unproven; this is because Ajñāna is established through Sākṣī Pratīti. However, Mādhabācārya Byāsatīrtha, in his work *N'yāẏāmṛta*, presents various objections against the Advaita position of the *Sākṣībēdyatba* of Ajñāna and attempts to refute it. In this essay, I shall discuss the nature of the Sākṣī according to Advaitins and, by refuting all the objections raised by Mādhabācārya, explore how the Advaitins specially Madhusūdana Sarasbatī establish the *Sākṣībēdyatba* of Ajñāna.

Keywords: Ajñāna, *Sadasadbhyāmabilakṣaṇa,* Jñānanibartyatba, Sākṣī, *Sākṣībēdyatba*

অদ্বৈতবেদান্তে ব্রহ্মই হইল একমাত্র প্রমেয়। ব্রহ্মসূত্রকার মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"[১] সূত্রে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই হইল অদ্বৈতশাস্ত্রের একমাত্র বিচার্য বিষয়। ব্রহ্মই যে সমগ্র শ্রুতির একমাত্র তাৎপর্য তাহাও মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয়াখ্যা প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইবে যে, অদ্বৈতশাস্ত্রে যদি ব্রহ্মভিন্ন অপর কোনও প্রমেয় পদার্থ না থাকে, তাহা হইলে ঐ শাস্ত্রে অজ্ঞানবিষায়ক আলোচনার অবকাশ কোথায়?

উক্ত প্রশ্নের উত্তর এইরূপ– "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রে মহর্ষি বাদরায়ন প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, মোক্ষার্থীর পক্ষে ব্রহ্মই একমাত্র বিচার্য বিষয়। কিন্তু "আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"[২]

[১] ব্র. সূ. ১।১।১

[২] বৃহ. উপ. ৪।৫।৬

"তরতি শোকমাত্মবিৎ"[৩] প্রভৃতি উপনিষদ বাক্যে আত্মদর্শনেই মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে। ইহাতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আত্মজ্ঞানই যদি মুক্তির হেতু হয়, তাহা হইলে মোক্ষার্থী পুরুষ ব্রহ্মবিচারে কেন প্রবৃত্ত হইবে? ইহার উত্তরে অদ্বৈতাচার্যগণ বলেন যে, আত্মা এবং ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়াই ব্রহ্মই মুমুক্ষ পুরুষের একমাত্র বিচার্য বিষয়। ফলত শ্রুতি এবং সূত্রের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। জীবাত্মা ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন, তাহা "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"[৪], "তত্ত্বমসি"[৫], "অহং ব্রহ্মাস্মি"[৬] প্রভৃতি মহাবাক্যের দ্বারাও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আপত্তি হইতে পারে যে, এইরূপ শ্রৌতসিদ্ধান্ত অনুভববিরোধী। কারণ, মনুষ্যোঽহম্, "ব্রাহ্মণোঽহম্" প্রভৃতি অহমাকার প্রতীতিতে জীব নিজেকে ব্রহ্মভিন্ন মানুষরূপেই অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতচার্যগণ বলেন যে অহমাকার প্রতীতিসমূহ ভ্রম বলিয়াই উহারা জীব ও ব্রহ্মের শ্রুতিসিদ্ধ ঐক্যের বাধক হইতে পারে না; কারণ ভ্রম প্রমাণকে বাধিত করিতে পারে না। সুতরাং জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধির নিমিত্ত অহমাকার প্রতীতিসমূহের ভ্রমত্বসিদ্ধি আবশ্যক। কিন্তু অহমাকার প্রতীতিসমূহের ভ্রমত্ব উপপাদন করিলেই প্রদর্শন করা যায় না যে ব্রহ্মই একমাত্র প্রমেয়; কারণ তাহার জন্য ব্রহ্মাভিন্ন সকল পদার্থই যে অপ্রমেয় বা মিথ্যা তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। কিন্তু দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির ভ্রমত্ব সিদ্ধ হইলেই দেহাদির এবং তদুপলক্ষিত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব স্থাপিত হয় না এবং আত্মা বা ব্রহ্মাই যে একমাত্র প্রমেয়, তাহাও সিদ্ধ হয় না। এতদ্ব্যতীত নৈয়ায়িক, বৈশেষিকপ্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায় দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন, তাঁহারা সকলেই দেহে আত্মবুদ্ধিকে ভ্রমই বলিয়া থাকেন। কিন্তু ন্যায়াদিসম্প্রদায়মতে মিথ্যাজ্ঞান দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তির কারণ হইলেও[৭] ঐ সকল সম্প্রদায় অদ্বৈতসম্প্রদায়ের ন্যায় জগৎকে মিথ্যা বলেন না। সুতরাং, অহমাকার প্রতীতিসমূহের ভ্রমত্ব স্থাপিত হইলেই জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপিত হয় না এবং অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত অদ্বৈতশাস্ত্রের পার্থক্যও নিরূপিত হয় না। অতএব প্রশ্ন হইবে যে অদ্বৈতী কীরূপে জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপনপূর্বক জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ নিরূপণ করিবেন এবং অদ্বৈতশাস্ত্রের সহিত অন্যান্য শাস্ত্রের পার্থক্যই বা কীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে?

উত্তর এই, অন্যান্য সম্প্রদায় আত্মা বা অন্তঃকরণের ন্যায় সৎ পদার্থকেই ভ্রমজ্ঞানের উপাদান বলিলেও অদ্বৈতসম্প্রদায় প্রদর্শন করিয়াছেন যে ভ্রমজ্ঞান এবং ভ্রমের বিষয় উভয়ই মিথ্যা বলিয়া কোন সৎ কারণ হইতেই ভ্রমজ্ঞান বা ভ্রমীয় বিষয়ের উৎপত্তি সম্ভব নহে। বস্তুতঃ অদ্বৈতমতে ভ্রমীয় বিষয়ই বাধিত বা মিথ্যা। বাধিত বিষয়ক জ্ঞান হওয়ায় ভ্রমজ্ঞানকেও অদ্বৈতী মিথ্যা বা অনির্বচনীয় বলেন। কোন সৎ পদার্থ হইতে এইরূপ জ্ঞান ও তাহার বিষয়ের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া ইহাদের উপাদানকারণরূপে অদ্বৈতী অজ্ঞানরূপ একটি মিথ্যা পদার্থ অঙ্গীকার করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অনুসারে জগৎও মুক্তিকালে বাধিত হয় বলিয়া জগৎ এবং জগৎবিষয়কজ্ঞানও মিথ্যা। মিথ্যা উপাদান ব্যতিরেকে মিথ্যা জগতের উৎপত্তি সম্ভব নহে বলিয়া অদ্বৈতী অজ্ঞানকেই জগতের মূল উপাদানকারণ বলিয়া থাকেন। এই প্রকার মিথ্যা অজ্ঞানই অদ্বৈতবেদান্তের অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়। অজ্ঞানের দ্বারাই অন্যান্য শাস্ত্র হইতে অদ্বৈতবেদান্তের পার্থক্য নিরূপিত হয় বলিয়া উহাই তাহার পৃথকপ্রস্থান।

---

[৩] ছা. উপ. ৭।১।৩

[৪] মা. উপ. ২

[৫] ছা. উপ. ৬।৮।৭

[৬] বৃ. উপ. ১।৪।১০

[৭] ন্যা. সূ. ১।১।২

ইতর-ব্যাবৃত্তিই হইল লক্ষণের ফল। সাধারণত সৎ ধর্মের দ্বারাই ইতর-ব্যাবৃত্তি হইয়া থাকে এবং সেই সৎ ধর্মের আশ্রয়রূপে লক্ষ্যবস্তুও সৎ হইয়া থাকে। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত মতে, অজ্ঞান সৎ নয়। কারণ, অজ্ঞান সৎ হইলে তাহা ব্রহ্মের ন্যায় অবাধিত হইত। যেহেতু অদ্বৈতমতে অবাধিত্বই হইল সত্ত্ব। কিন্তু অজ্ঞানের বাধ প্রমাণসিদ্ধ। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। এই হেতু অজ্ঞানকে সৎ বলা যায় না। অজ্ঞান আবার শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অসৎ-ও নহে, কারণ অসৎ পদার্থ কদাপি অপরোক্ষ অনুভবের বিষয় হয় না এবং তাহাতে অর্থক্রিয়াকারীত্বও থাকে না। কিন্তু অজ্ঞান যেহেতু "অহমজ্ঞ" প্রভৃতিরূপে অপরোক্ষানুভবের বিষয় হইয়া থাকে ফলে অজ্ঞানকে অসৎ বলা যায় না। আবার সদ্ ও অসদ্ পরস্পর বিরূদ্ধ হওয়ায় অজ্ঞানকে সদসদ্-ও বলা যায় না। ফলে, সৎ-অসৎ প্রভৃতি কোনও রূপেই অজ্ঞানের লক্ষণ নিরুপণ করা সম্ভব নহে। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, অজ্ঞানের লক্ষণ প্রদানই অসম্ভব। এইরূপ আশঙ্কা নিবারণার্থে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "কিন্তু কেবলব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানাপনোদ্যম্"।[৮] অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যের জ্ঞান হইলে অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। ফলে 'জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব'ই হইল অজ্ঞানের লক্ষণ।

ইহাতে প্রশ্ন হইবে যে, অজ্ঞানের লক্ষণ নিরূপন সম্ভব হইলে, অজ্ঞান বিষয়ে প্রমাণ কেন প্রয়োগ করা যাইবে না? সংসারে এহেন কোনও পদার্থ নাই, যাহার লক্ষণ আছে কিন্তু প্রমাণ নাই।

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদীগণ বলেন যে, অজ্ঞান– এর লক্ষণই হইল অজ্ঞান বিষয়ে প্রমাণপ্রয়োগে বিঘটক। কারণ অজ্ঞান জ্ঞাননাশ্য, ফলে তাহা কদাপি প্রমাজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। এই হেতু অদ্বৈতমতে, অজ্ঞান হইল অপ্রমেয় পদার্থ।

অদ্বৈতমতে ব্রহ্মই হইল একমাত্র প্রমেয় পদার্থ এবং অজ্ঞান হইল অপ্রমেয়। যেহেতু অজ্ঞান "অহমজ্ঞঃ" প্রভৃতি অপরোক্ষ অনুভবের বিষয় এবং তাহা ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ দ্বারা গ্রাহ্য নহে, সেহেতু অজ্ঞান অপ্রমেয়। প্রশ্ন হইবে যে, অজ্ঞান ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ দ্বারা গ্রাহ্য নয় কেন? ইহার উত্তরে অদ্বৈতীগণ বলিয়া থাকেন যে, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের মাধ্যমে আমরা যখন কোনও বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি তখন ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের মাধ্যমে বিষয়াবরক অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া বিষয়টি প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক্ষণে যদি স্বীকার করা হয় যে, অজ্ঞানও ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ গ্রাহ্য, সেক্ষেত্রে অজ্ঞানেরও বিষয়াবরক অজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে এবং এইরূপে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। এই কারণে অজ্ঞানবিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ সম্ভব নহে। উপরন্তু, অজ্ঞানের কোনও প্রমাতাও নাই। কারণ অজ্ঞানের প্রমাতা থাকিলে প্রশ্ন হইবে যে, এই প্রমাতা কী মুক্ত জীব নাকি বদ্ধ জীব? অদ্বৈতীগণ বলেন যে, মুক্ত জীব অথবা বদ্ধ জীব কেহই অজ্ঞানের প্রমাতা হইতে পারিবে না। এই সকল কারণ নিমিত্ত বলিতে হয় যে, অজ্ঞান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে। ফলত, অজ্ঞানকে পৃথক প্রস্থানরূপেও স্বীকার করা যায় না। এই তাৎপর্যেই আচার্য সুরেশ্বরও বলিয়াছেন, "অবিদ্যা চ ন বস্ত্বিষ্টং মানাঘাতাসহিষ্ণুতঃ। অবিদ্যায়া অবিদ্যাত্বে ইদমেব তু লক্ষণম্। মানাঘাতাসহিষ্ণুত্বমসাধারণমিষ্যতে।"[৯]

এহেন আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, অজ্ঞান প্রমাণের দ্বারা অসিদ্ধ হইলেও তাহা সর্বথাভাবে অসিদ্ধ নহে; কারণ অদ্বৈতমতে অজ্ঞান সাক্ষী প্রতীতিসিদ্ধ। "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম"[১০] এইরূপ শ্রুতিতে শুদ্ধচৈতন্যকেই সাক্ষী বলা হইয়াছে। এবং এই শুদ্ধচৈতন্যরূপ সাক্ষী দ্বারাই অজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। কোনও কোনও অদ্বৈতাচার্যগণ আবার অজ্ঞানাবৃত্ত চৈতন্যকে অজ্ঞানের সাধক বলিয়াছেন। আবার কোনও কোনও

---

[৮] প্রকরণদ্বাদশী (মহেশ), পৃঃ ৪১০

[৯] সম্বন্ধবার্তিক, শ্লোক ১৮০,১৮১

[১০] বৃ. উপ. ৩।৪

অদ্বৈতাচার্যগণ বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে সাক্ষীরূপে স্বীকার করিয়াছেন। সাক্ষীর স্বরূপ বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি থাকিলেও সাক্ষিপ্রতীতি দ্বারা যে অজ্ঞান সিদ্ধ হয়– এবিষয়ে শঙ্কার কোনও অবকাশ নাই।

'সাক্ষী' পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল– 'সাক্ষাৎ ঈক্ষণাৎ সাক্ষী'। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অপরোক্ষ দ্রষ্টাকেই 'সাক্ষী' বলা হইয়াছে। দৈনন্দিন জীবনেও দুইজন ব্যক্তি যদি বিবাদগ্রস্থ থাকেন, সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি পাশে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিষয় উদাসীন এবং অপরোক্ষভাবে দর্শন করেন, তাহাকে সাক্ষী বলা হইয়া থাকে। ইহা হইতে একথা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, অদ্বৈতসিদ্ধান্তে প্রমাতৃচৈতন্য হইতে অতিরিক্ত সাক্ষী চৈতন্যকে স্বীকার করা হয়। অদ্বৈতমতে, এই সাক্ষী এক, নির্গুণ, নির্বিকার এবং উদাসীন দ্রষ্টা। শ্রুতিতেও সাক্ষিকে এক, নির্গুণ, উদাসীন, অপরোক্ষ দ্রষ্টারূপ শুদ্ধ চৈতন্য বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে– "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চঃ।"[১১] উক্ত শ্রুতিতে 'একো' পদের দ্বারা সাক্ষীর স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরাহিত্যকে বুঝানো হইয়াছে। 'দেবঃ' পদের দ্বারা তাঁহার দ্যোতনশীলতা বা স্বপ্রকাশত্ব সূচিত হইয়াছে। সকল ভূতপদার্থের মধ্যেই তিনি বিরাজমান হওয়ায় তাহাকে 'সর্বভূতেষু' বলা হইয়াছে। সকল প্রাণীর মধ্যে বিরাজমান থাকিয়া তিনি অহং-মমাভিমানের দ্বারা প্রকাশিত হন বলিয়া তাহাকে 'গূঢ়ঃ' বলা হইয়াছে। তিনি আকাশের ন্যায় বিভূ বলিয়া 'সর্বব্যাপী'। সকল প্রাণীর অন্তর্যামী হওয়ায় 'সর্বভূতান্তরাত্মা'। তিনি সকল প্রাণীর শুভাশুভ কর্মের দ্রষ্টা, ফলে তাহাকে 'কর্মাধ্যক্ষঃ' বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'চেতা' পদের দ্বারা তাঁহার অপরোক্ষত্ব এবং 'কেবলো' পদের দ্বারা তাঁহার কুটস্থত্ব বা নির্বিকারত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং, এই এক, নির্গুণ, নির্বিকার, অপরোক্ষ দ্রষ্টারূপ শুদ্ধচৈতন্যের সাক্ষিত্বই শ্রুতিসিদ্ধ। এই শুদ্ধচৈতন্যরূপ সাক্ষীর দ্বারাই অজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এই পক্ষের বিরূদ্ধে মাধ্ব আচার্য ব্যাসতীর্থ তাঁহার 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত করিয়া বলিয়াছেন যে, "নির্দোষচিৎপ্রকাশ্যত্বেনাজ্ঞানস্য পারমার্থিকত্বাপাতাৎ মোক্ষেঽপি তৎপ্রতীত্যাপত্তেশ্চ।"[১২] ন্যায়ামৃতকারের আপত্তি এই যে, অজ্ঞান শুদ্ধচৈতন্যরূপ সাক্ষী দ্বারা প্রকাশিত হইলে অজ্ঞান ব্রহ্মের ন্যায় পরমার্থ সৎ হইয়া যাইবে এবং মোক্ষকালেও অবিদ্যার প্রকাশ স্বীকার করিতে হইবে।

প্রথম আপত্তিটির তাৎপর্য হইল, অদ্বৈতমতে ভ্রম দোষজন্য হইয়া থাকে এবং ভ্রমের বিষয়কে তাঁহারা অপারমার্থিক বলিয়া থাকেন। সুতরাং, অদ্বৈতমত অভ্যুপগম করিয়া এহেন ব্যাপ্তি স্বীকার করা যায় যে, "যত্র যত্র অপারমার্থিকত্বং তত্র তত্র সদোষচৈতন্যপ্রকাশত্বং।" যেহেতু ব্যাপকাভাবে ব্যাপ্যাভাব হইয়া থাকে সেহেতু বলা যায় যে, "যত্র যত্র সদোষচৈতন্যপ্রকাশত্বাভাবঃ তত্র তত্র অপারমার্থিকত্বাভাবঃ।" এক্ষণে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অনুসারে যদি বলা হয় যে, অবিদ্যা শুদ্ধ চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাহাতে (অবিদ্যা) 'সদোষচৈতন্যপ্রকাশত্বাভাবঃ' বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে অজ্ঞানকে আর অপারমার্থিক বলা যইবে না, পারমার্থিক বলিতে হইবে। কিন্তু অজ্ঞানকে যদি পারমার্থিক বলা হয়, সেক্ষেত্রে অদ্বৈতসিদ্ধান্তহানী হইবে।

ন্যায়মৃতকারের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, শুদ্ধচৈতন্যকে যদি সাক্ষীরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে মোক্ষকালেও অবিদ্যার প্রতীতি স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু মোক্ষ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু অদ্বৈতীর পক্ষে মোক্ষে অবিদ্যার প্রতীতি স্বীকার করা সম্ভব নহে। কারণ, অবিদ্যার অস্তময়ই হইল মোক্ষ।[১৩] সুতরাং, শুদ্ধচৈতন্যকে সাক্ষীরূপে স্বীকার করা যায় না।

---

[১১] শ্বেত. উপ. ৬।১১

[১২] ন্যায়ামৃত (কুম্ভকোণ), পত্র ৩৩৫।২; (বারাণসী); পৃঃ ৫৬১

[১৩] "অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ সা চ বন্ধ উদাহৃত" (বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্তিক, আচার্য সুরেশ্বর)

শুদ্ধচৈতন্যের সাক্ষিত্বপক্ষে এইরূপ সমস্যা উত্থাপিত হওয়ায় কোনও কোনও অদ্বৈতাচার্য আবার অশুদ্ধচৈতন্য বা অজ্ঞানাবৃত চৈতন্যকেই সাক্ষীরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। অজ্ঞানাবৃত চৈতন্য বলিতে এক্ষেত্রে ঈশ্বরকেই সাক্ষীরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। যাঁহারা এই পক্ষ সমর্থন করেন, তাঁহারা ঈশ্বরচৈতন্যের সাক্ষিত্বপক্ষে পূর্বোক্ত "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ"[১৪] শ্রুতিবাক্যকেই প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেন।

ন্যায়ামৃতকার এই মতের বিরূদ্ধে বলেন যে, যেসকল যুক্তির দ্বারা শুদ্ধচৈতন্যরূপ সাক্ষিপক্ষত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, সেই একই যুক্তির দ্বারা এই অজ্ঞানাবৃত চৈতন্যরূপ সাক্ষিত্ব পক্ষও খণ্ডিত হইয়া যায়।[১৫]

কোনও কোনও অদ্বৈতাচার্য আবার বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে সাক্ষী রূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। অদ্বৈতমতে, বৃত্তি দুই প্রকার– অবিদ্যাবৃত্তি ও অন্তঃকরণবৃত্তি।এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইবে যে, অজ্ঞান কী অবিদ্যাবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্য প্রকাশ্য নাকি অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্য প্রকাশ্য? ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্থ বলেন যে, এই উভয় পক্ষকেই সাক্ষী রূপে স্বীকার করা যায় না। প্রথমে তিনি উভয়পক্ষের সাধারণ দোষ উপস্থাপন করিয়া তদনন্তর উহাদিগের বিশেষ দোষ উপস্থাপন করিয়াছেন।

ন্যায়ামৃতকার উভয়পক্ষের সাধারণ দোষ উপস্থাপন নিমিত্ত বলেন যে, "নান্ত্যঃ, অজ্ঞানস্য কদাচিদপ্রতীত্যাপাতাৎ"[১৬] অর্থাৎ, বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে যদি সাক্ষীরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে অজ্ঞানের কদাচিৎ অপ্রতীতির আপত্তি হইবে। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অন্তঃকরণ বা অবিদ্যার পরিণাম বিশেষই হইল বৃত্তি। পরিণাম মাত্রেই অনিত্য। এক্ষণে বৃত্তি যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকেও অনিত্য বলিতে হয়। সেক্ষেত্রে বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ সাক্ষীর কদাচিৎ অভাব স্বীকার করিতে হইবে। সাক্ষিরূপ বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যের কদাচিৎ অভাব স্বীকার করিলে অজ্ঞানেরও কাদাচিৎ অভাব স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা স্বীকার করা যায় না। কারণ অজ্ঞান অনাদি কাল হইতেই ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত হইয়া আছে। একমাত্র সর্বজীবের মুক্তি হইলেই অজ্ঞানের নাশ হয়। ফলে বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে সাক্ষিরূপে স্বীকার করিলে অজ্ঞানের প্রাতীকত্ব ভঙ্গ হইবে।[১৭] এই হেতু এই পক্ষ স্বীকার্য নহে।

দ্বিতীয় সাধারণ দোষ উপস্থাপনপূর্বক ন্যায়ামৃতকার বলেন যে, বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে যদি সাক্ষিরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে যে, এই বৃত্তির সপক্ষে প্রমাণ কী? তদুত্তরে অদ্বৈতীগণ বলেন যে, বৃত্তির প্রতীতিই বৃত্তির স্বরূপের প্রমাণ। সেক্ষেত্রে পুনরায় প্রশ্ন হইবে যে, বৃত্তি কী বৃত্ত্যাকারপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যবেদ্য নাকি বৃত্তিতে অপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যবেদ্য? ন্যায়ামৃতকার বলেন যে, এক্ষেত্রে প্রথম পক্ষটি গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে, বৃত্ত্যান্তরপ্রতিবিম্বিতচৈতন্য দ্বারাই বৃত্তির সিদ্ধি হয়। তবে বৃত্ত্যান্তর স্বীকার করিলে সেক্ষেত্রে অনবস্থা দোষ দেখা দেয়। এই হেতু প্রথম পক্ষটি গ্রহণীয় নহে। দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ বৃত্তিতে অপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে যদি বৃত্তির সাধকরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ চৈতন্যকেই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ বৃত্তিতে

---

[১৪] শ্বেত. উপ. ৬।১১

[১৫] এতেনাজ্ঞানস্য রাহুবৎ স্বাবৃতপ্রকাশনৈব স্ফূরণমিতি নিরস্তম্" ন্যায়ামৃত (কুম্ভকোণ), পত্র ৩৩৫।২; (বারাণসী); পৃঃ ৫৬১

[১৬] ন্যায়ামৃত (কুম্ভকোণ), পত্র ৩৩৫।২-৩৩৬।১; (বারাণসী); পৃঃ ৫৬১

[১৭] "কদাচিদিতি। বৃত্তিবিলম্বে সতীত্যর্থঃ। তথা চ বৃত্তেঃ কদাচিৎকত্বেন তৎপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যস্যাপি কাদাচিৎকত্বাৎ কদাচিদ্বৃত্তিবিলম্বে সতি অনাদিতয়া পূর্বং বিদ্যমানস্যাপ্রতীত্যাপত্ত্যা জ্ঞাতৈকসত্ত্বহানেরিত্যর্থঃ।" তদেব, পত্র ৩৩৬।১

অপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যই হইল শুদ্ধ চৈতন্য। শুদ্ধ চৈতন্যকে বৃত্তির প্রকাশক বলিলে মোক্ষে শুদ্ধ চৈতন্য থাকায় তৎকালে বৃত্তির প্রতীতির আপত্তি হইবে।[১৮] ফলে বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে সাক্ষিরূপে স্বীকার করা যায় না।

বিশেষ দোষ উপস্থাপনপূর্বক ন্যায়ামৃতকার বলেন যে, অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকেও সাক্ষিরূপে স্বীকার করা যায় না। কারণ, অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যই হইল অজ্ঞানের নাশক। এক্ষণে, যাহা যেই পদার্থের নাশক তাহা ঐ পদার্থে ভাসক হইতে পারে না। ফলত, অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে সাক্ষিরূপে স্বীকার করা যায় না।[১৯]

ন্যায়ামৃতকার বলেন যে, অবিদ্যাবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকেও সাক্ষিরূপে স্বীকার করা যায় না। কারণ, অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি উৎপন্নই হইতে পারে না। অবিদ্যাবৃত্তি সাধারণত দোষজন্যই হইয়া থাকে। যেমন – শুক্তিতে রজতাকার অবিদ্যাবৃত্তি মূলত প্রমার্তৃগত দোষ বা কোনও ইন্দ্রিয়গত দোষজন্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি এইরূপ কোনও দোষজন্য উৎপন্ন হয় না। ফলত বলিতে হয় যে, অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি সৃষ্টিই হইতে পারে না।[২০]

এইরূপে ন্যায়ামৃতকার বলেন যে, শুদ্ধচৈতন্য, অজ্ঞানাবৃতচৈতন্য, অন্তঃকরণবৃত্তি প্রতিবিম্বিতচৈতন্য এবং অবিদ্যাবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্য ইহাদের মধ্যে কেহই অবিদ্যার প্রকাশক না হওয়ায়, অজ্ঞান শশশৃঙ্গের ন্যায় সর্বথা অসিদ্ধ। সুতরাং, অজ্ঞান অদ্বৈতশাস্ত্রের পৃথক প্রস্থানও হইতে পারে না।

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী 'অথাজ্ঞানবাদে তৎপ্রতীত্যুপপত্তিঃ' নামক অদ্বৈতসিদ্ধির একটি প্রকরণেই ন্যায়ামৃতকারের সকল আপত্তির উত্তর প্রদান করিয়াছেন।অদ্বৈতসিদ্ধিকার এক্ষেত্রে অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকেই সাক্ষিরূপে স্বীকার করিয়াছেন এবং এই পক্ষে ন্যায়ামৃতকার প্রদত্ত সাধারণ দোষ ও বিশেষ দোষের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ন্যায়ামৃতকার বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যবেদ্যত্ব পক্ষের বিরূদ্ধে প্রথম সাধারণ দোষ উপস্থাপনপূর্বক বলিয়াছিলেন যে, বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে যদি সাক্ষিরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে অজ্ঞানের কদাচিৎ অপ্রতীতির আপত্তি হইবে। ইহার উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে, এহেন আপত্তি অদ্বৈতমতের ইষ্টাপত্তিই হইবে। কারণ, অদ্বৈতমতে সমাধি এবং প্রলয়কালে অবিদ্যাসত্ত্ব থাকিলেও সেস্থলে তাহার প্রতীতি হয় না।[২১]

মাধ্বসম্প্রদায় এক্ষেত্রে আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, পূর্বোক্ত অদ্বৈতমত যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে অজ্ঞানের জ্ঞাতৈকসত্ত্বের হানী হইবে।[২২] এবং অজ্ঞানের জ্ঞাতৈকসত্ত্বের হানী হইলে সেক্ষেত্রে অজ্ঞানের ব্যবহারিকত্ব এবং প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিতে হয়; যাহা বাস্তবিকপক্ষে অদ্বৈতমতানুসারে করা যায় না। এতদ্ব্যতীত অদ্বৈতমতানুসারে যদি বলা হয় যে, সমাধি এবং প্রলয়কালে অবিদ্যাকার

---

[১৮] "বৃত্তেরপি বৃত্ত্যন্তরপ্রতিবিম্বিতসাক্ষিবেদ্যত্বেঽনবস্থাপাতেন, তদপ্রতিবিম্বিত তদ্বেদ্যতে, মোক্ষেঽপি বৃত্তিপ্রতীত্যাপাতাচ্চ।" তদেব, পত্র ৩৩৬।

[১৯] "কিঞ্চ বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যেনাজ্ঞানভানমঙ্গীকুর্বাণং প্রতি প্রষ্টব্যং – 'বৃত্তি'শব্দেন অন্তঃকরণবৃত্তির্বিবক্ষিতা, অবিদ্যাবৃত্তির্বা।...ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাভাবেন প্রমাণাভাবাৎ" তদেব, পত্র ৩৩৬।১

[২০] তদেব

[২১] "ন চৈব কদাচিদবিদ্যায়া অপ্রতীত্যাপত্তিঃ; ইষ্টাপত্তেঃ, সমাধৌ তথাভ্যুপগমাৎ"। অদ্বৈতসিদ্ধি (দিল্লী), পৃ.৫৭৫

[২২] "অনাদিতয়া পূর্বং দ্যমানস্যাপ্যজ্ঞানস্যাপ্রতিত্যাপত্ত্যা জ্ঞাতৈকসত্ত্বহানেঃ।" ন্যায়ামৃতপ্রকাশ (কুম্ভকোণ), পত্র ৩৩৬।১

অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ অবিদ্যাবৃত্তির অভাব থাকে, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে অবিদ্যারও লয় স্বীকার করিতে হয়। কারণ অদ্বৈতমতে "যাবৎসাক্ষিসত্ত্বং তাবৎকালাবস্থায়িত্বম্" এইরূপ নিয়ম স্বীকৃত।

এহেন আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতীগণ বলেন যে, এইরূপ নিয়ম কেবল উৎপত্তিবিনাশশীল প্রাতিভাসিক স্থলেই প্রযোজ্য, অনাদি অজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে।[২৩]

ইহার বিরূদ্ধে ন্যায়ামৃতকার বলেন যে, অদ্বৈতীর এহেন অভিমত যদি স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ, যদি বলা হয়, সাক্ষীর অভাব কালে অবিদ্যার অভাব হয় না, তাহা হইলে অবিদ্যার অজ্ঞাতসত্ত্বা স্বীকার করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে অজ্ঞানের জ্ঞাতৈকসত্ত্বার হানী হইবে।

এতদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে, "ধারাবাহিকাবিদ্যাবৃত্তিপরম্পরায়া অতিসূক্ষ্মায়া অভ্যুপগমাচ্চ ইতি শিবম্।"[২৪] অর্থাৎ, এক্ষেত্রে অদ্বৈতসিদ্ধিকার তৈলধারাবৎ নিরবিচ্ছিন্ন অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করেন। এই নিরবিচ্ছিন্ন অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করিলে মোক্ষপূর্বে কোনও অবস্থাতেই অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের অভাব হয় না। এবং সমাধি ও প্রলয়কালে অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি না হওয়ার কারণ হইল, এই অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি অতি সুক্ষ্ম, অলে তাহার প্রতিসন্ধান আমাদিগের হয় না। এইরূপে অদ্বৈতসিদ্ধিকার ন্যায়ামৃতকারোক্ত প্রথম সাধারণদোষ নিরাকরণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সাধারণ দোষ উপস্থাপনের নিমিত্ত ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছিলেন যে, বৃত্তি সিদ্ধির জন্য বৃত্ত্যান্তর স্বীকার অনবার্য, ফলে সেক্ষেত্রে অনবস্থা দোষ সৃষ্টি হয়। এহেন আপত্তি নিরসনের নিমিত্ত অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে, অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি সিদ্ধির নিমিত্ত বৃত্ত্যান্তর প্রতিবিম্বিত চৈতন্য স্বীকার করিতে হয় না। কারণ, অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য দ্বারা অবিদ্যা এবং অবিদ্যাবৃত্তি উভয়েরই প্রকাশ হইয়া যায়। ফলত এক্ষেত্রে বৃত্ত্যান্তর স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।[২৫]

অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যবেদ্যত্ব পক্ষে ন্যায়ামৃতকার প্রথম যে বিশেষ দোষ উপস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা হইল, অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তির উৎপত্তিই সম্ভব নহে। যেহেতু, অবিদ্যাবৃত্তি মাত্রই দোষজন্য। কিন্তু অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তির কোনও দোষজন্য উৎপন্ন হয় না। ফলত, অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে অবিদ্যার সাক্ষিরূপে স্বীকার করা যায় না। তদুত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন যে, অবিদ্যা স্বয়ং একটি দোষপদার্থ, ফলে অবিদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি উৎপত্তিতে কোনও সমস্যা নাই।[২৬]

ন্যায়ামৃতকার অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যবেদ্যত্ব পক্ষে দ্বিতীয় বিশেষ দোষ উপস্থাপনপূর্বক যে বলিয়াছিলেন, অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে সাক্ষিরূপে স্বীকার করিলে সেক্ষেত্রে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। কারণ সাক্ষিরূপ অবিদ্যাপ্রতীতি সিদ্ধ হইলে অবিদ্যাসত্ত্ব সিদ্ধ হয় এবং অবিদ্যা সিদ্ধ হইলে তবেই প্রতিবিম্বনোপাধির সত্ত্ব সিদ্ধ হয়, আবার প্রতিবিম্বনোপাধির সত্ত্ব সিদ্ধ হইলে তবেই উক্ত উপাধিতে চৈতন্যপ্রতিবিম্ব সম্ভব হইবে এবং তন্নিমিত্ত অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ অবিদ্যাপ্রতীতি সিদ্ধ হয়। এইরূপে, অবিদ্যাপ্রতীতি সিদ্ধ হইলে অবিদ্যা সিদ্ধ হয় এবং অবিদ্যা সিদ্ধ হইলে অবিদ্যাপ্রতীতি সিদ্ধ হয়। ফলত, অবিদ্যাপ্রতীতিতে অন্যোন্যাশ্রয় ঘটে বলিয়া এই পক্ষও স্বীকার্য নহে।

---

[২৩] অদ্বৈতসিদ্ধি (দিল্লী), পৃ.৫৪৪

[২৪] তদেব, পৃ.৫৪৫

[২৫] "ন চ বৃত্তেরপি বৃত্ত্যন্তরপ্রতিবিম্বিতচিদ্ভাস্যতে অনবস্থা; স্বস্যা এব স্বভানোপাধিত্বাৎ" তদেব, পৃ.৫৭৬

[২৬] "ন চাবিদ্যাবৃত্তের্দোষজন্যত্বাদত্র কথমবিদ্যাবৃত্তিঃ, 'অবিদ্যায়া এব দোষত্বাৎ'।" তদেব, পৃ.৫৭৫

ইহার উত্তর প্রদানের নিমিত্ত অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতী বলেন যে, অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিতচৈতন্য সাক্ষিত্বপক্ষে সাক্ষিজ্ঞানে অবিদ্যা বা অবিদ্যাবৃত্তিজ্ঞান অপেক্ষিত হইলেও অবিদ্যা বা অবিদ্যাবৃত্তিবিষায়ক জ্ঞান অপেক্ষিত নহে। অর্থাৎ সাক্ষির জ্ঞান কদাপি সাক্ষিভাষ্য বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না। সুতরাং, উক্ত বিকল্পে জ্ঞপ্তিপক্ষে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের কোনও শঙ্কা নাই। অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যের সাক্ষিত্বপক্ষে উৎপত্তিগত অন্যোন্যাশ্রয় দোষও হইবে না। কারণ, অবিদ্যা ও অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যেরূপ সাক্ষী উভয়ই অনাদি হওয়ায় তাহাদের উৎপত্তির কোনও প্রশ্নই নাই।[২৭]

সুতরাং, অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যের সাক্ষিত্বপক্ষের বিরূদ্ধে ন্যায়ামৃতকার যেসকল আপত্তি উপস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সকল আপত্তি অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতী এইরূপে খণ্ডন করেন। ফলত পরিশেষে বলা যায় যে, অদ্বৈতমতে, অবিদ্যাবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ সাক্ষিচৈতন্য দ্বারাই অবিদ্যার সিদ্ধি হয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) শাস্ত্রী, পঞ্চানন (সম্পাদক)। ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রকৃত বেদান্তপরিভাষা, পঞ্চানন শাস্ত্রীকৃত পরিভাষাসংগ্রহ। কলকাতা, ১৮৮৩ শকাব্দ।

২) সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী এস. (সম্পাদক)। নৃসিংহাশ্রমকৃত অদ্বৈতদীপিকা, নারায়ণশ্রমকৃত অদ্বৈতদীপিকাবিবরণ (৩ য় খণ্ড)। সম্পুর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৮২-১৯৮৭।

৩) শাস্ত্রী, অনন্তকৃষ্ণ (সম্পাদক)। মধুসূদন সরস্বতীকৃত অদ্বৈতসিদ্ধি, ব্রহ্মানন্দ সসস্বতীকৃত লঘুচন্দ্রিকা, বলভদ্রকৃত সিদ্ধিব্যাখ্যা, বিঠলেশ উপাধ্যায়কৃত ব্যাখ্যা। পরিমল পাবলিকেশনস্, দিল্লী, ১৯৮২।

৪) শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার ও ঘোষ, রাজেন্দ্র সম্পাদিত। মধুসূদন সরস্বতীকৃত সিদ্ধান্তবিন্দু, ব্রহ্মানন্দ সসস্বতীকৃত ন্যায়রত্নাবলী, শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী প্রথম ভাগ। কলকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

৫) কৃষ্ণাচার্য, টি. আর. (সম্পাদক)। ব্যাসতীর্থকৃত ন্যায়ামৃত, শ্রীনিবাসাচার্যকৃত। ন্যায়ামৃত প্রকাশ, কুম্ভকোণ, ১৯০৭।

৬) স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাদক)। ব্যাসতীর্থ এবং মধুসূদন সরস্বতীকৃত ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধী, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দকৃত অদ্বৈতসিদ্ধিব্যাখ্যা (দুই খণ্ড)। ষড়দর্শন প্রকাশন প্রতিষ্ঠান, উদাসীন সংস্কৃত বিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৮৪, ১৯৮৬।

৭) শাস্ত্রী, এস. সূর্যনারায়ণ (সম্পাদক)। বিদ্যারণ্যমুনিকৃত বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ। আন্ধ্র বিশ্ব কলা পরিষদ, ওয়ালটেয়ার, ১৯৪১।

৮) মিশ্র, কাশীনাথ (সম্পাদক)। সুরেশ্বরাচার্যকৃত বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্তিক, আনন্দগিরিকৃত শাস্ত্রপ্রকাশিকা (৩ খণ্ড)। আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯৩৭।

৯) শাস্ত্রী, এস. সুব্রহ্মণ্য (সম্পাদক)। সুরেশ্বরাচার্যকৃত সম্বন্ধভাষ্যবার্তিক, আনন্দগিরিকৃত শাস্ত্রপ্রকাশিকা। মহেশ অনুসন্ধান সংস্থান, বারাণসী, ১৯৮০।

[২৭] "অবিদ্যাতৎকার্যন্যতরপ্রতিফলিতচৈতন্যস্যৈব সাক্ষিত্বাৎ। তথা চ দৃগ্রূপস্যাপি উপাধিনা দ্রষ্টৃত্বম্।...উৎপত্তিজ্ঞপ্তিপ্রতিবন্ধস্যাভাবাদবিদ্যাতদুপাধিকদ্রষ্টৃত্বয়োরুভয়োরপ্যনাদিত্বাৎ।" তদেব, পৃ.৭৫৪

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 585-591
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.248

সাংখ্যদর্শনে কল্যাণতত্ত্ব

দিব্যা চৌধুরী, *গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.01.2026; Accepted: 13.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Wellbeing refers to a state or condition where an individual can reside in his or her own life in a happy, content, satisfied, and joyful manner. In general terms, this state of happiness or contentment depends on a healthy and joyful environment from all physical, mental, emotional, social, economic, and environmental conditions within each individual's life. While well-being typically denotes mental peace and contentment, it is also important to understand that mental wellbeing or peace cannot be achieved independently from physical or external social conditions, as our mental and physical well-being plays a significant role in responding to all these matters. The Samkhya Philosophy affirms that suffering is perpetuated by the quality of passion and is perpetual in nature; therefore, it cannot be destroyed. However, the experience of suffering is indeed possible and will lead to a transformation into suffering. The attainment of this supreme knowledge will aid in achieving an eternal state of joy and peaceful wellbeing, where suffering will no longer be the cause of unhappiness or ill-being, and individuals will always be situated in the desired state of eternal joy and peaceful wellbeing.

Keywords: Suffering, Peace, Eternal joy, Supreme knowledge, Wellbeing

ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতায় দর্শনের গুরুত্ব সর্বদাই অপরিসীম। ভারতীয় দর্শনের দার্শনিক চিন্তাভাবনার একটি বিশিষ্ট দিক হল ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সত্তার সাথে সম্পর্কিত মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ জগতে কল্যাণ স্থাপনের মূলমন্ত্র। এই মূল্যবোধ প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত যা অদৃশ্যভাবে চালনা করে তার জীবনশৈলীর গতিপ্রকৃতি। কারণ জাগতিক দুঃখ হতে মুক্ত হতে গেলে ও প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে কল্যাণ সাধন করতে হলে অর্থাৎ ভালো থাকতে হলে প্রতিটি ব্যক্তিকে তার নিজের জীবনে জীবনশৈলীর সঠিক রূপে বিন্যাস করা প্রয়োজন। যেখানে সে নিজে ও তার সাথে সাথে সকলে দুঃখহীনভাবে সুস্থ ও আনন্দে বিরাজ করতে পারে। যা ধীরে ধীরে কল্যাণ সাধনের পথকে প্রশস্ত করে। কল্যাণ যা সাধারন অর্থে ভালো থাকা বলতে বোঝায় এমন একটি স্থিতি বা অবস্থা যেখানে মানুষ তার নিজের জীবনে নিজে সুখী, সন্তুষ্ট, তৃপ্ত ও আনন্দময় ভাবে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সাধারণ অর্থে এই সুখ বা সন্তোষজনক অবস্থাটি নির্ভর করে প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার নিজস্ব জীবনের শারীরিক, মানসিক, আবেগময়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এই সকল দিক থেকে একটি সুস্থ, সুরক্ষিত ও আনন্দময় পরিবেশে বিদ্যমান থাকার মধ্যে দিয়ে। প্রধানত মানসিকভাবে শান্তি ও সন্তোষপূর্ণভাবে থাকাকে কল্যাণময় বা সুখ অর্থে বুঝলেও মানসিক সুস্থতা বা শান্তি কখনোই শরীর ও

বাহ্য সামাজিক পরিবেশের অবস্থাকে বাদ দিয়ে গঠন করা সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সকল বিষয়ের প্রতিক্রিয়া আমাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার পক্ষে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। জগতে প্রতিটি জীবই সদা কল্যাণকামী। সেকারণে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে হোক না কেন প্রতিটি জীবই তার নিজের জীবনে কিভাবে কল্যাণ বা মঙ্গল সাধিত হবে সে বিষয়ে সদা উদ্যত থাকে, কিন্তু এই জগতে শুধুমাত্র নিজে ভালো থাকা বা নিজের জীবনে কল্যাণ সাধনের চিন্তাভাবনা কখনোই প্রকৃত অর্থে সার্বিক কল্যাণের ক্ষেত্রে ফলপ্রসু হয় না। কারণ জগতে প্রতিটি জীব তার পারিপার্শ্বিক সমস্ত জীবজগৎ থেকে শুরু করে সেই নভঃমন্ডল পর্যন্ত সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণার সাথে এক যোগসূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। ফলে জগতে কল্যাণ বা মঙ্গল স্থাপন তখনই সম্ভব হবে যখন তা সকল জীবের সমষ্টি কল্যাণের দিকে পরিচালিত হবে।

কল্যাণ তত্ত্ব বলতে কি বোঝায়?

কল্যাণ তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল কল্যাণের প্রকৃতি ও তার স্বরূপ কি সে বিষয়ে জানা কারণ কল্যাণের মাত্রাটি নির্ধারিত হয় জগতে প্রতিটি সত্তার সার্বিকভাবে ভালো থাকা বা সুস্থ থাকার মাত্রা ভেদের মধ্যে দিয়ে। তাই সঠিক অর্থে ভালো থাকা বলতে, সেই সুখস্থিতি কে নির্দেশ করে যা নিজে এবং তার সাথে সাথে সামগ্রিকভাবে জগতের প্রতিটি জীবের সার্বিক সুখ বা মঙ্গলকে বোঝায়। এখন প্রশ্ন ওঠে এই ভালো থাকা বিষয়টি ঠিক কি রকমের? এটি সুখের সঙ্গে জড়িত নাকি দুঃখ না থাকাকে বোঝায়? কারণ জগতে অবিমিশ্র সুখ বলে কিছু হয় না। জগতে সুখ ও দুঃখ সহচর ভাবে অবস্থান করে। তবে সাধারণ অর্থে সুখ বলতে আমরা যা বুঝি তা দুঃখেরই সাময়িক অনুপস্থিতি। কল্যান বা সুখস্থিতির ধারনাটি একটি জটিল ধারণা, যা শুধুমাত্র সাধারণভাবে দুঃখের সাময়িক অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে না। এটি একটি জীবের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, জাগতিক সকল বিষয়গুলির মধ্যেস্থিত সমস্ত প্রকার দুঃখ বা যন্ত্রণার পূর্ণ নিবৃত্তিকে বোঝায়। কারণ জগতে দুঃখ নিত্য এবং এজগতে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে দুঃখ অনুভব করেনি দুঃখ সর্বদাই আমাদের গ্রাস করে রেখেছে। তাই সঠিক অর্থে সুখ বা শান্তিপূর্ণ কল্যাণময় স্থিতি লাভ করতে হলে দুঃখ হতে চিরনিবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন কারণ এজগতে দুঃখই সকল প্রকার ভালো থাকা বা শান্তিতে থাকার পথে একমাত্র অন্তরায়। সেকারনে একমাত্র এই দুঃখ হতে নিবৃত্ত হতে পারলে আমরা এক শাশ্বত আনন্দময় শান্তিপূর্ণ স্থিতি লাভ করতে পারব। যা প্রত্যেকটি জীব ও তার সাথে সাথে সম্পূর্ণ জগতের কল্যাণে সহায়ক হয়ে উঠবে।

ভারতীয় দর্শন বেদ উপনিষদে কল্যাণের ভূমিকা:

এই শান্তিপূর্ণ স্থিতি লাভ করতে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় দর্শন সর্বদাই উন্মুখ। ভারতীয় দর্শন মোক্ষবাদী দর্শন। মোক্ষ বা মুক্তিই তার চরম বা পরম লক্ষ্য। তবে এই মুক্তি কি? এই মুক্তি দুঃখ হতে মুক্তি, বন্ধন হতে মুক্তি। এ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে প্রচুর বর্ণনা মেলে আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে প্রায় সকল দর্শন সম্প্রদায়ই তাদের স্বীয় মতানুসারে এই দুঃখমুক্তির তত্ত্ব বর্ণনা করে গেছে। যা তাদের নির্দেশিত পথে মুক্তিলাভ তথা কল্যাণ সাধনের পথপ্রদর্শক। মুক্তি কি? মুক্তি শব্দটি 'মুচ্' ধাতু হতে নিষ্পন্ন হয়েছে পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যয়ী ব্যাকরণে বলেছেন 'মুচ্' ধাতুর অর্থ মোক্ষণ।[১] বেদে আছে মুক্তি বলতে বোঝায় যা মৃত্যুরূপ বন্ধন হতে মুক্ত করে। কঠ্ উপনিষদে বলা হয়েছে মুক্তি হলো মৃত্যু হতে মুক্তি 'মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে'।[২] বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে 'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যে হস্য হৃদি শ্রিতাঃ'[৩] অর্থাৎ সকল প্রকার কামনা হতে মুক্ত হওয়াই

---

[১] 'মুচ্ লূ মোক্ষণে'। পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী, ৭/৩/৫২

[২] 'মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে'। কঠ্, উ, ১/৩/১৫

[৩] 'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যে হস্য হৃদি শ্রিতাঃ'। বৃহ, উ, ৪/৪/৭

মুক্তির স্বরূপ। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে বলা হয়েছে সকল প্রকার পাশ হতে মুক্তি 'মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ'[৪], গীতায়[৫] বলা হয়েছে, সঙ্গ হতে মুক্তি। পাপ হতে মুক্তি। ধর্মাধর্মাদি কর্মের কর্তৃত্ববুদ্ধিরূপ বন্ধন হতে মুক্তি, অশুভ হতে মুক্তি, দ্বন্দ্বমোহ হতে মুক্তি, জন্ম, মৃত্যু, জরামরণ হতে মুক্তি, সুখ ও দুঃখ হতে মুক্তি, হর্ষ, মর্ষ, ভয়, ও উদ্বেগ এই সকল বিষয় হতে মুক্তি। কাম, ক্রোধ, লোভ, হতে মুক্তি, প্রকৃতিজ গুনত্রয় সত্ত্ব, রজো, তমো, হতে বিমুক্তি। ও জন্ম বন্ধনের চক্রাকার আবর্তন হতে সদা মুক্তি, মুক্তি তত্ত্বের বিষয় নিয়ে প্রচুর আলোচনা বেদ, উপনিষদে ও ভারতীয় দর্শন সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবে যেকোনো রূপেই হোক না কেন দুঃখ হতে মুক্তিই যা বন্ধনের মূল কারণ সুতরাং এই দুঃখ হতে মুক্তিই প্রধানরূপে মুক্তির স্বরূপ। তবে সঠিক অর্থে এই মুক্তির স্বাদ আমরা তখনই লাভ করতে পারব যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারব ও অনুসন্ধানে ব্রতী হবো এই দুঃখের মূল কারণের। দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারলেই অর্থাৎ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটলে তবেই জাগতিক কল্যাণ সাধিত হবে।

সাংখ্য দর্শনে কল্যাণতত্ত্ব:

এই দুঃখ হতে চিরমুক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় আস্তিক ষড়দর্শন সম্প্রদায়ের সর্বপ্রাচীন দর্শন সম্প্রদায় সাংখ্য দর্শন সৃষ্টিই হয়েছে দুঃখমুক্তির উদ্দেশ্যে। কারণ অন্যান্য সকল দর্শনের লক্ষ্য চতুর্বর্গ পুরুষার্থের সাধনে মোক্ষপ্রাপ্তি হলেও তাদের উপায় ও সাধন পথের যে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জটিলতা সেটি একজন সাধারণ জীবের পক্ষে সহজে সাধন করা অতি দুষ্কর তাই এ বিষয়ে সাংখ্য দর্শন সর্বশ্রেষ্ঠ মোক্ষপ্রাপ্তির পথ নির্দেশ করে। যেহেতু বিনা প্রয়োজনে কোন জীব কোন কাজেই প্রবৃত্ত হয় না তাই প্রতিটি জীবই নিজ জীবনে দুঃখ যন্ত্রণায় সদা ক্লিষ্ট বলে সে তার এই দুঃখ যন্ত্রণা হতে চিরমুক্তির প্রয়োজনের স্বাভাবিক তাগিদেই এমন প্রতিকারেরই আশা করবে যা তাকে সেই দুঃখ হতে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে সাহায্য করবে। দুঃখ মুক্তি ও কল্যাণ সাধনের পরম প্রতিকারটি হল সাংখ্য শাস্ত্র। এবিষয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ 'সাংখ্যকারিকা'র ৭০ নং কারিকায় বর্ননা করেছেন।

> "এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
> আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধা কতৃম তন্ত্রম"।।[৬]

সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা আদিবিদ্বান মহর্ষি কপিল দুঃখ তাপে জর্জরিত জীবকুলের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে জীবের ঐকান্তিক কল্যাণ সাধনে উন্মুখ হয়ে এই পবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান যা সাংখ্যশাস্ত্র তাঁর শিষ্য আসুরিকে প্রদান করেছিলেন এরপর আসুরি তাঁর শিষ্য পঞ্চশীখকে এই জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। এরপর শিষ্য পরম্পরায় এই সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞান জগতে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হিসেবে বহুভাবে বহু শিষ্য মধ্যে প্রচারিত হয় ও সর্বোৎকৃষ্ট স্থান লাভ করে।

ভারতীয় দর্শনে সাংখ্য দর্শনকে সর্বপ্রাচীনতম দর্শন বলে গণ্য করা হয়। আদিবিদ্বান মহর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যে বেদ, উপনিষদ, ছান্দোগ্য, প্রশ্ন, কঠ্ ও বিশেষ করে শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে সাংখ্যের বর্ণনা মেলে। এছাড়াও মহাভারত, ভগবতগীতা, স্মৃতি ও পুরাণে সাংখ্য মতের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। সাংখ্য দর্শনে 'সাংখ্য' নামটিকে কেন্দ্র করে দার্শনিক মহলে প্রচুর মতভেদ আছে । অনেকে 'সাংখ্য' শব্দটি কে 'সংখ্যা' শব্দের থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। অনেকে সংখ্যা, পরিসংখ্যান

---

[৪] 'মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ'। শ্বেতা, উ, ১/৮, ২/২৫, ৪/১৬, ৫/১৩, ৬/১৩

[৫] শ্রীমদ্ভগবতগীতা।

[৬] "এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া" ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা, কারিকা নং- ৭০।

ও গণনার অর্থে গ্রহণ করেন যেহেতু সাংখ্য দর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের ধারণা মেলে। কিন্তু সাংখ্য দর্শনে 'সাংখ্য' শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্যক জ্ঞান অর্থেই গৃহীত হয়েছে 'সং' শব্দের অর্থ সম্যক ও 'খ্যা' শব্দের অর্থ জ্ঞান অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান। সাংখ্য দর্শনের প্রধান দুটি তত্ত্ব প্রকৃতি ও পুরুষের বিভেদ জ্ঞানই সম্যক জ্ঞান। অতি প্রাচীন দর্শন সম্প্রদায় হওয়ার কারণে ও কালের স্রোতে সাংখ্য দর্শনের বহু প্রামাণ্য ও প্রাচীন গ্রন্থগুলি লুপ্তপ্রায় ও অজানা তবে বর্তমান কালে যে সকল গ্রন্থগুলি সাংখ্য দর্শনের প্রামাণ্যগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয় সেগুলির মধ্যে ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলে গৃহীত হয়। 'সাংখ্যকারিকার' ৭০ টি কারিকার মধ্যে প্রথম কারিকাটি ঈশ্বরকৃষ্ণ শুরুই করেছেন "দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ" শব্দের দ্বারা।

প্রথম কারিকা–

> "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।
> দৃষ্টে সাঽপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ"।।[৭]

ত্রিবিধ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক) দুঃখের অভিঘাতের ফলে অর্থাৎ আঘাতের ফলে সেই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তির হেতু সাংখ্য শাস্ত্রীয় উপায় বিষয়ে জিজ্ঞাসা ব্যর্থ হয় না। এই প্রথম কারিকায় যে দুঃখ ত্রিবিধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এই ত্রিবিধ মানে তিনটি দুঃখ নয় অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে স্থিত অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য দুঃখ যা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই তিন প্রকারের বলে সাংখ্যকারিকায় বর্ণনা করা হয়েছে। যা জীবের সকল প্রকার ভালো থাকার বিষয়কে ত্বরান্বিত করে। সাংখ্যকারিকার ভাষ্য "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী" তে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, "দুঃখানাং ত্রয়ং দুঃখত্রয়ং"[৮] সকল দুঃখ সমূহ কে ত্রিবিধ দুঃখ রূপে বর্ণনা করা হয় এই ত্রিবিধ দুঃখ হলো আধ্যাত্মিক,আধিভৌতিক, আধিদৈবিক দুঃখ।

আধ্যাত্মিক দুঃখ: আধ্যাত্মিক শব্দের অন্তর্গত 'আত্মা' শব্দের দ্বারা এখানে শরীর ও মনকে বোঝানো হয়েছে। আন্তর থেকে যে দুঃখ আসে তার শারীর ও মানস ভেদে দুই প্রকার। বাত, পিত্ত ও কফের তারতম্যের ফলে শরীরে ব্যাধির সঞ্চার হয়। যার ফলে শারীর দুঃখ ঘটে। অপরদিকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, বিষাদ, প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগের ফলে মানসিক দুঃখ যা মানুষের জীবনে ভালো থাকার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

আধিভৌতিক দুঃখ: আধিভৌতিক শব্দের অন্তর্গত 'ভূত' শব্দের অর্থ স্থাবর ও জঙ্গম।স্থাবর অর্থে বৃক্ষপর্বতাদিকে এবং জঙ্গম অর্থে মানুষ, পশু ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে, বাহ্যিক কারণ দ্বারা উৎপন্ন দুঃখ হলো, আধিভৌতিক দুঃখ। মানুষ, পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ, কন্টক প্রস্তরাদি দ্বারা উৎপন্ন দুঃখ আধিভৌতিক দুঃখ।

আধিদৈবিক দুঃখ: আধিদৈবিক দুঃখের মধ্যে 'দৈব' শব্দের দ্বারা দেবযোনিকে বোঝানো হয়েছে। বিদ্যাধর, বিনায়ক, অপ্সরা, গন্ধর্ভ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও ভূত-প্রেত কে বলা হয় দেবযোনি। এই অপদেবতাদের দ্বারা সৃষ্ট অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, মহামারী এইসব দৈব দুর্বিপাকের ফলে যে বাহ্যিক কারণে যে দুঃখের জন্ম হয় তা আধিদৈবিক দুঃখ নামে পরিচিত।

এই ত্রিবিধ দুঃখ তাপে তাপিত জীব দুঃখের অভিঘাতের ফলে সর্বদাই ব্যথিত থাকে ফলে সে নিজে কখনো সুখে থাকতে পারে না যার ফলে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সুখস্থিতিকেও নষ্ট করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সে এই নিদারুণ দুঃখ হতে মুক্তির পথ অন্বেষণের চেষ্টা করে। দুঃখ কী? এবং দুঃখ নিবৃত্তি কী উপায়ে সম্ভব সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় দুঃখের স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্টত কিছু নির্দেশ না করলেও

---

[৭] "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা"– ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা, কারিকা নং– ১।

[৮] "দুঃখানাং ত্রয়ং দুঃখত্রয়ং"– বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী'তে বাচস্পতি মিশ্র দুঃখের স্বরূপ বিষয়ে বলেছেন, "দুঃখং রজঃ পরিনামভেদো"[৯] অর্থাৎ দুঃখ হলো রজোগুণের পরিণাম। দুঃখ রজোগুণের পরিণাম বিশেষ হওয়ায় দুঃখ নিত্য। নিত্য বস্তুর নাশ হওয়া সম্ভব নয়। দুঃখ নিত্য হওয়ার তার নাশ সম্ভব নয়। জগতে প্রত্যেকটি জীব দুঃখ অনুভব করে জগতে কোন ব্যক্তিই দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। সেকারনে সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বাচস্পতি বলেন, "তদেতৎ প্রত্যাত্মবেদনীয়ং দুঃখং রজঃপরিনামভেদো ন শক্যতে প্রত্যাখ্যাতুম্"[১০] তাহলে এই ত্রিবিধ দুঃখ তাপে তাপিত জীব দুঃখমুক্তির নিবৃত্তি হেতু জিজ্ঞাসা করে যে দুঃখের কি আদৌ নিবৃত্তি সম্ভব নয়? যদি সম্ভব হয় তা কিভাবে সম্ভব? কারণ দুঃখের নিবৃত্তি এমন হওয়া প্রয়োজন যা চিরকালীন, ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক যার আর পুনরাগমন হবে না। তাই বাহ্যিক উপায় দ্বারা এরূপ দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয় কারণ এগুলির সাময়িকভাবে দুঃখ-নিবারণের সহায়ক হলেও দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে সহায়ক নয়। সে বিষয়ে সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বলা হয়েছে, "যদ্যপি ন সন্নিরুধ্যতে দুঃখং, তথাপি তদভিভবঃ..."[১১] অর্থাৎ যদিও সৎ বস্তু দুঃখের নিরোধ করা যায় না কিন্তু দুঃখের অভিভব সম্ভব। যার দ্বারা দুঃখরূপে পরিণামপ্রাপ্ত রজোগুন পুনরায় তার সূক্ষ্ম অবস্থায় অভিভূত হয়। এই রজোগুণের অভিভূত হওয়ার ফলে দুঃখের নাশ না হলেও দুঃখের অভিভব সম্ভব। এই অভিভবের প্রক্রিয়া কি রূপে সম্ভব তার সম্যক উত্তর লাভ করতে হলে সাংখ্য দর্শন তত্ত্বের ব্যক্ত ,অব্যক্ত ও জ্ঞয়ের জ্ঞান যা বিবেকজ্ঞান নামে পরিচিত সেই জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। যা ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর 'সাংখ্যকারিকার' দ্বিতীয় কারিকায় বর্ণনা করেছেন, "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ"[১২]। 'ব্যক্ত' বলতে প্রকৃতির পরিণাম ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। 'অব্যক্ত' বলতে প্রকৃতি বা প্রধানের কথা বলা হয়েছে। এবং 'জ্ঞ' বলতে পুরুষ চৈতন্যের কথা বলা হয়েছে। তাই সাংখ্যকারিকার দ্বিতীয় কারিকায় বলা হয়েছে,

"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ।।"[১৩]

দ্বিতীয় কারিকায় বলা হয়েছে বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ ও লৌকিক বা দৃষ্ট উপায়ের মত যা দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধনে অসমর্থ। যার ফলে জগতে কল্যান স্থাপনও সম্ভব হবে না। এই বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপগুলি যেহেতু অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয়যুক্ত। সেকারনে এইগুলির বিপরীতে দুঃখ নিবৃত্তির সেই সাংখ্যশাস্ত্রীয় উপায় ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানই শ্রেয়। কারণ একমাত্র এই বিবেকজ্ঞান থেকে দুঃখের অবশ্যম্ভাবী চির নিবৃত্তি সম্ভব হয় এবং একমাত্র এই বিবেকজ্ঞানের দ্বারাই দুঃখ রূপে পরিণামপ্রাপ্ত রজোগুণ পুনরায় তার সূক্ষ্ম অবস্থায় রজোগুনে অভিভূত হয় যার ফলে দুঃখমুক্তি সম্ভব হবে।

সাংখ্য দর্শন নির্দেশিত পথ অবলম্বনে দুঃখ মুক্তি ঘটলে জগতে পরম কল্যাণ স্থাপন হয়। এই দুঃখ মুক্তির জন্য দরকার সাংখ্যা নির্দেশিত "বিবেকজ্ঞান"। সাংখ্য দর্শনে দু প্রকার মূল তত্ত্ব স্বীকৃত প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে জগৎ অভিব্যক্তির সৃষ্টি হয় তখন প্রকৃতির মধ্যস্থিত সত্ত্ব, রজো ও তমো গুনের সাম্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। এই বিঘ্নের ফলে প্রকৃতি হতে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হল- ১) মহৎ বা বুদ্ধি, ২) অহঙ্কার, ৩) মনস্, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে ৪) চক্ষু, ৫) কর্ণ, ৬) নাসিকা, ৭) জিহবা, ৮) ত্বক,

---

৯ "দুঃখং রজঃ পরিনামভেদো"- বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

১০ "তদেতৎ প্রত্যাত্মবেদনীয়ং"– বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

১১ "যদ্যপি ন সন্নিরুধ্যতে দুঃখং, তথাপি তদভিভবঃ"- বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

১২ "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ"- ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা। কারিকা নং-২।

১৩ "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ"– ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা, কারিকা নং- ২।

পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে ৯) বাক্, ১০) পাণি, ১১) পাদ, ১২) পায়ু, ১৩) উপস্থ। পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে ১৪) শব্দ, ১৫) স্পর্শ, ১৬) রূপ, ১৭) রস, ১৮) গন্ধ, পঞ্চমহাভূতের মধ্যে ১৯) আকাশ, ২০) মরুৎ, ২১) তেজ, ২২) অপ্, ২৩) ক্ষিতি। এই তত্ত্বগুলির মধ্যে কোনো কোনো তত্ত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি, আবার কিছু তত্ত্ব শুধু বিকৃতি বা বিকার। এবিষয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকার তৃতীয় কারিকায় বলেছেন,

> "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
> ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ।।"[১৪]

মূলপ্রকৃতি কোন তত্ত্বের বিকার বা কার্য নয়। মহৎ আদিতে যাদের এমন সাতটি তত্ত্ব (যথা- মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র কোন তত্ত্বের) কারণ এবং (অন্য কোন তত্ত্বের) কার্য এগুলি প্রকৃতি-বিকৃতি নামে পরিচিত। ষোলটি তত্ত্ব (যেমন- মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত,) এগুলি শুধুমাত্র কোন না কোন তত্ত্বের কেবলমাত্র কার্য এগুলি কেবল বিকৃতি নামে পরিচিত। পুরুষ (কোন তত্ত্বের) কারণও নয় এবং অন্য কোন তত্ত্বের কার্যও নয়। এই বিষয়গুলির জ্ঞানলাভ প্রয়োজন।

সাংখ্য মতে জ্ঞ অর্থাৎ চৈতন্য পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, বিকারবিহীন, পরিবর্তনবিহীন, উদাসীন সাক্ষীমাত্র। প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিতে পুরুষের বা আত্মার প্রতিবিম্বনের ফলে পুরুষ বা আত্মাতে জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বভাবের উদয় হয়। প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধির সান্নিধ্যে পুরুষ নিজেকে জ্ঞাতা,কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। এই সকলই বৃত্তিজ্ঞান। বিবেকজ্ঞানের অভাববশত চৈতন্যপুরুষ অচৈতন্য প্রকৃতির পরিনাম বুদ্ধির বিকার কে নিজের বিকার বলে মনে করে। যার ফলে অচৈতন্য প্রকৃতির পরিণাম চিত্তের বিকারকে চৈতন্য আত্মা নিজের বিকার বলে মনে করাই জাগতিক দুঃখের একমাত্র মূল কারণ। যার ফলে বন্ধন দশার সৃষ্টি হয়। একমাত্র বিবেক জ্ঞানের উদয় হলে অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগ ছিন্ন হলে প্রকৃতি স্থিত গুণগুলি সাম্যবস্থায় আসে এবং প্রকৃতি তার নিজ স্বরূপে বিরাজমান হয়। তখন আত্মা বা পুরুষ তাঁর স্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্যে অবস্থান করে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হলে দুঃখের নিরোধ বা অভিভব হয় অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় স্থুল রূপে অভিব্যক্ত দুঃখকে সূক্ষ্ম রূপ প্রাপ্ত করানো যায় এবং দুঃখ চিরতরে সূক্ষ্ম রূপে পর্যবসিত হলে অর্থাৎ দুঃখের কারণ নিত্য রজোগুন যা প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে জগৎ অভিব্যক্তির কালে স্থূল অবস্থায় থেকে প্রকৃতির পরিণাম জাগতিক সকল বস্তুতে দুঃখের সঞ্চার ঘটায়। প্রকৃতি পুরুষের বিভেদ জ্ঞান জন্মালে সেই স্থুল রজোগুণ সূক্ষ্ম রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় যার ফলে দুঃখত্রয়ের অবসান ঘটে। এবং এই দুঃখত্রয়ের আর পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। যার ফলে দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তি সম্ভব হয়।

উপসংহার:

সার্বিক কল্যাণ সাধনই সাংখ্য দর্শনের মূল লক্ষ্য। সাংখ্য দর্শনে মোক্ষের স্বরূপ দুটি জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি। সাংখ্য সম্মত বিবেকজ্ঞান লাভ হলে জীবের প্রারব্ধ কর্মের ভোগের কাল সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সে ভোগবাসনাশূন্য হয়ে সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন জীবন্মুক্ত অবস্থায় বিরাজ করে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির এই প্রারব্ধ কর্মের ভোগ বিবেকজ্ঞান লাভের ফলে অতি দ্রুত বিনষ্ট হলে দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তির দ্বারা জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বিদেহ মুক্তি লাভ করে চতুবর্গ পুরুষার্থের পরম পুরুষার্থ মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। উক্ত প্রক্রিয়ায় জীবের কৈবল্য প্রাপ্তি হয় ও দুঃখের চিরকালের অবসান ঘটে জগতে কল্যাণ স্থাপিত হয়। তাই এই সাংখ্য নির্দেশিত বিবেকজ্ঞান লাভ করলে চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ নিত্য কল্যাণময় অবস্থায় সর্বদা বিরাজমান থাকতে পারবে। তখন দুঃখ বলে

[১৪] "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ" - ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা, কারিকা নং- ৩।

কিছু থাকবে না এবং ব্যক্তিমাত্রই সেই কাঙ্খিত অনন্ত দুঃখাতীত শুদ্ধ চিত্তের স্থিতিতে অবস্থান করবে যা হবে প্রকৃতপক্ষে পরম কল্যাণের চূড়ান্ত অবস্থা। তাই জগতে পরম কল্যাণ স্থাপনের জন্য সাংখ্য নির্দেশিত পথ অবলম্বন করা প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ: পাণিনি।

২. কঠ্ উপনিষদ।

৩. বৃহদারণ্যক উপনিষদ।

৪. সাংখ্যকারিকা। ঈশ্বরকৃষ্ণ।

৫. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। বাচস্পতি মিশ্র।

৬. যুক্তি দীপিকা। লেখক অজ্ঞাতসার।

৭. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬১।

৮. গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র। ঈশ্বরকৃষ্ণকৃতা সাংখ্যকারিকা শ্রীমদবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতা, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, বৈশাখ- ১৪১৮।

৯. দিবাকরানন্দ, স্বামী (অনুদিত)। শ্রীমৎ ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকা। (সটীক বঙ্গানুবাদ), প্রকাশক, গনেশচন্দ্র দত্ত, ৩৪ সদানন্দ রোড, কলকাতা, ১৯৭৬।

১০. ভট্টাচার্য্য, শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ। সাংখ্যদর্শন। সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা।

১১. ভট্টাচার্য্য, বিধুভূষণ। সাংখ্যদর্শনের বিবরণ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০০৮।

১২. বেদান্তচুঞ্চু, পূর্ণচন্দ্র। সাংখ্যকারিকা। দ্বিতীয় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০০৭।

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অশোককুমার। সাংখ্যকারিকা (গৌড়পাদভাষ্য- তত্ত্বকৌমুদীসহিতা সানুবাদ)। সদেশ, কলকাতা।

১৪. ভট্টাচার্য, রজত। সাংখ্যকারিকা (সম্পূর্ণ): সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (প্রথম খন্ড)। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১১।

১৫. Hiriyanna, M. *Outlines of Indian Philosophy.* Delhi, Motilal Banarsidas Publishers, 2014.

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 592-598
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.249

উত্তর ত্রিপুরার বিবাহকেন্দ্রীক লোকাচার: বাঙালি হিন্দুসমাজ

রাজু নাথ, *ছাত্র, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়*

Received: 22.12.2025; Accepted: 13.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the Bengali Hindu society of North Tripura, marriage is surrounded by a diverse range of folk customs, which are mainly divided into three phases: pre-wedding, wedding-day, and post-wedding rituals.

Before the wedding, the date is finalized through the proposal of marriage, the formal meetings between the bride and groom, and the paka dekha ceremony. This is followed by mangalacharan (blessing), during which items such as conch bangles and vermilion are presented. The rituals of aiburo bhaat (pre-wedding feast), pankhili, sarair asar, and dhamail songs along with the adhibas ceremony are especially significant. During this phase, addi snan (ritual bath), tail ranna (ceremonial cooking in oil), and the rites for the fourteen ancestral generations (chouddo purusher kaaj or briddha shraddha) are performed.

On the wedding day, after the groom's procession (barjatri) arrives, the groom is ceremonially welcomed (barboron). According to scriptural traditions, amidst the chanting of mantras, rituals such as circling the sacred fire seven times (saat paak), exchange of garlands, and the auspicious first glance (shubhodrishti) are performed, followed by sampradan (the formal giving away of the bride). In the folk ritual of khoi bhata, vermilion is applied in the presence of fire as a witness. After the wedding, rituals such as bashi biye, konya jatra, bodhuboron, and the bou-bhaat ceremony at the groom's house take place. While welcoming the bride, the mother-in-law performs a folk ritual by showing her symbolic items like muchi and ichchha agachha (sacred grass). This is followed by kalratri, phul shojya (bridal night), and the traditional dice game (pasha khela). Finally, the wedding rituals conclude with fira jatra and ghat snan (ritual bath at the river or pond). These folk customs are an inseparable part of society and culture.

Keywords: Tripura, Folk customs, marriage, society, culture

'লোক' ও 'সংস্কৃতি' শব্দ দুটির দ্বারা জনসাধারণ, সমাজ ও জাতির জীবনযাত্রা বোঝায়। এই লোক ও সংস্কৃতি মিলে হয়েছে 'লোকসংস্কৃতি'। মানুষ যে সংস্কৃতিকে লালন করে আসছে তাই হল লোকসংস্কৃতি। তার জন্ম মূলত্ব মানুষের মুখে মুখে চিন্তায় ও কর্মে। এই লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে মোটামুটি বস্তুকেন্দ্রিক, অনুষ্ঠান কেন্দ্রীক, খেলাধুলা কেন্দ্রীক, বাক কেন্দ্রিক, অঙ্গভঙ্গি কেন্দ্রিক, লিখন কেন্দ্রীকভাবে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠান কেন্দ্রীক উপাদানের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হল লোকাচার। লোকাচার মানেই হচ্ছে সমাজের রীতি। এই লোকাচার সকল ধর্মীয় মানুষের মধ্যে বর্তমান। তবে এখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের উত্তর জেলার হিন্দুদের বিবাহ কেন্দ্রীক লোকাচার উপস্থাপন করা হল।

বিবাহকে কেন্দ্র করে যে সব লোকাচার তৈরি হয়েছে, সেগুলো একটি সমাজের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিয়ে মানে মানুষের জীবনে আনন্দ, আশা আর নতুন স্বপ্নের শুরু। বাঙালি হিন্দু সমাজে বিয়েতে শাস্ত্রের নিয়ম যেমন থাকে, তেমনই থাকে অনেক পুরনো রীতি-নীতি বা লোকপ্রথা। আর আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী—সবাই মিলে মিলিতভাবে বিয়ের সব আয়োজন সম্পন্ন করে। এখানে আলোচনার মূল বিষয় উত্তর ত্রিপুরার বাঙালি-হিন্দুদের বিবাহ-লোকাচার। যা বিয়ের পূর্বে, বিয়ের সময় ও বিয়ের পরের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উত্তর ত্রিপুরার বিবাহকেন্দ্রীক লোকাচার হল,

১) বিয়ের পূর্বের লোকাচার: বিয়ের প্রস্তাব, বর ও কনে দেখা, বিবাহের দিনক্ষন ঠিক, আইবুড়ো ভাত, পানের খিলি, গায়ে হলুদ, সরাইর আসর, অধিবাস, তৈল রান্না, সোয়াগ মাগা, চৌদ্দ পুরুষের কাজ, বর যাত্রা, দধীর মঙ্গল, বস্ত্র দান, বর সাজানো।

২) বিয়ের সময়ের লোকাচার: মন্ত্রপাঠ, সাতপাক, মালাবদল, সম্প্রদান।

৩) বিয়ের পরের লোকাচার: বাসিবিয়া, কন্যা যাত্রা, বধূবরণ, বউ ভাত, পাশা খেলা, কালরাত্রি, ফুল সজ্জা, নতুন বউয়ের প্রথম রান্না, ফিরা যাত্রা, ঘাটস্নান।

ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের বিয়ে দেওয়া সমাজের একটি প্রচলিত রীতি। তখন ঘটক ছেলের পরিবার ও মেয়ের পরিবারের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যান। পাত্র-পাত্রীর নির্বাচন থেকেই বিয়ের মূল প্রস্তুতি শুরু হয়। এই কাজে ঘটকের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দুই পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দেন এবং পাত্র-পাত্রীর মিল খুঁজে বের করেন। তবে শুধু ঘটকই নন—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরাও এ কাজে সাহায্য করে থাকে। এরপর কুষ্ঠি দেখা হয়, পাত্র-পাত্রীর সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হয় এবং তারপরই দেখা-সাক্ষাতের পালা আসে। ঠিক সময়ে দুই পরিবার বর-কনের দেখা করা ও নির্বাচন করার কাজটি সম্পন্ন করে। একে 'চূড়ান্ত দেখা' বা 'পাকা দেখা' বলা হয়। পাকা দেখার পর পঞ্জিকা দেখে বিয়ের উপযুক্ত একটি দিন বের করা হয়। সাধারণত প্রথমে পাত্রপক্ষ কনের বাড়িতে যায়—যদিও ব্যতিক্রমও হয়। ছেলে-মেয়ে পরস্পরকে পছন্দ করলে সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া শেষে কথাবার্তার মাধ্যমে বিয়ের দিন-তারিখ ও শুভলগ্ন ঠিক করা হয়। দু'খানি কাগজে দিন-তারিখ-লগ্ন লিখে দুই পক্ষের অভিভাবক সই করেন। এই কাগজ বিনিময়কেও চিরকুট বিনিময় বলা হয়। অনেক সময় পঞ্জিকাতেও তারিখ চিহ্নিত করে সেখানে ধান, দূর্বা ও সিঁদুর ছোঁয়া দেওয়া হয়। বিয়ে ঠিক হলে পাঁচজন এয়ো ছেলের বাড়িতে নয়বার এবং মেয়ের বাড়িতে সাতবার উলুধ্বনি দেয়। এরপর আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতজনেরা ছেলে-মেয়েকে আইবুড়ো ভাত খাওয়ায়।

পাকা দেখার পর মঙ্গলাচরণ করা হয়। সাধারণত এই তারিখ পাকা দেখার দিনই ঠিক হয়ে যায়। মঙ্গলাচরণের দিন পাত্রের বাড়ি থেকে কনের জন্য শাঁখা, সিঁদুর, গয়না, নতুন কাপড়, প্রসাধনী সামগ্রী, মাছ, পান এবং মিষ্টি পাঠানো হয়। মঙ্গলাচরণ উত্তর ত্রিপুরায় কেবল মেয়ের বাড়িতেই সম্পন্ন হয়। তথ্য (উপহার) নিয়ে যাওয়ার আগে ছেলেকে শ্বেতবস্ত্র পরিয়ে পাঠিতে বসানো হয় এবং তথ্যের মধ্যে পাত্র সিঁদুরের টিপ দেয়—বিশেষ করে যে শাঁখা কনেকে পরানো হবে, তাতে সিঁদুরের দাগ দেয়। সঙ্গে থাকে মিষ্টির পাতিল, সাতটি পুঁটি মাছ এবং একটি বড় কাতল মাছ। মেয়ের বাড়িতে তথ্য নিয়ে গেলে সবাই বরণ করে ঘরে তোলে। এরপর মেয়েকে আশীর্বাদ করা হয়। শুভক্ষণে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে আশীর্বাদ সম্পন্ন করেন। এই সময় মেয়ের মা ও আত্মীয়রা কাঁদতে কাঁদতে মেয়েকে ছেলের বাবার কোলে বসিয়ে সমর্পণ করে। মেয়েকে পাত্রর বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ সময় বাড়িতে আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়। এরপর আসে 'পানখিলি' নামের একটি লোকাচার। কনের মা-সহ পাঁচজন ব্রতিনী এই আচার করেন। প্রথমে একটি পুষ্পথালা সাজানো হয়। তাতে রাখা হয় ধান–দূর্বা, কাঠি, পান ও সুপারি। এয়োদের বসার জন্য পাটি বিছানো

হয় এবং একটি ঘট বসানো হয়, যার নিচে ধান থাকে ও উপরে আম্রপল্লব। মা পানখিলি তৈরি করলে আত্মীয় বা এয়োরা তা গ্রহণ করেন। ঘন ঘন উলুধ্বনি হয়, বাজনা বাজে, এয়োরা গান গায়। গান-বাজনা করতে করতে তারা পাশের কোনো দেবালয়ে বা দেবগাছের নিচে যায় এবং সেখানে পান ও মিষ্টি নিবেদন করে। ধূপ-মোমবাতি জ্বালিয়ে দেবতাকে বিয়ের নিমন্ত্রণ জানানো হয়। এরপর গান গাইতে গাইতে তারা বাড়ি ফিরে আসে এবং তাদের মিষ্টিমুখ করানো হয়। এরপর বরের বাড়িতে বরকে এবং কনের বাড়িতে কনেকে স্নান করানোর আচার হয়। এটি 'জল ভরা', 'জলসহা' বা 'জল ভরনী' নামে পরিচিত। পাঁচজন এয়ো একটি কলসে আম্রপল্লব দিয়ে সাজায় এবং কলসের গায়ে সিঁদুরের টিপ দেয়। একজন এয়ো খালি কলস হাতে এবং বরের মা বা কনের মা বরণডালা হাতে জল আনতে যান নিকটবর্তী জলাশয়ে। জল ভরতে যাওয়ার সময় বাজনা বাজে এবং গীত গাওয়া হয়। আত্মীয়-স্বজন ও পাড়ার মহিলারাও সঙ্গে যায়। এই জল দিয়েই বর বা কনেকে স্নান করানো হয়—এটিকে 'আদ্দি স্নান' বলা হয়।

'গায়ে হলুদ' দেবার আচারটি পালন করা হয় সাধারণত কনে বা পাত্রের সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করার সম্পর্ক রয়েছে এমন এয়োরা তাদের গায়ে তেল হলুদ মেখে দেয়। এই হলুদ সাধারণত বরের বাড়ি থেকে পাঠানো হয়। বরের গায়ের হলুদ মেখে বাকি হলুদ কনের গায়ে হলুদের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। গায়ে হলুদের গান গাওয়া হয়। বিবাহের ভোরে, অন্ধকার থাকতে থাকতে বিবাহের পাত্র-পাত্রীর 'অধিবাস' হয়। এই সময় পাত্র বা পাত্রীর বাড়িতে পাত্র-পাত্রীরা নতুন কাপড় পরিধান করে। একটি নতুন পাটি বিছানো হয়। তারপর পাত্রীর বাড়িতে পাত্রীকে নতুন কাপড় পরানো হয়। গলায় এক ছড়া তুলসীর মালা পরানো হয়। গয়নাও পরানো হয়। তারপর পাঁচজন এয়ো কনেকে দই চিড়া মিষ্টি খাওয়ায়। এসব কাপড়-চোপড় কনের বাপের বাড়ি থেকেই কনের জন্য কিনে আনা হয়। তারপর ঘরের কোণে হারিকেন জ্বালিয়ে অধিবাসের বাত্তি বেঁধে রাখেন। সবাই মিলে মধ্য ঘরে বসে সরাই দেবীর আসন দিয়ে গান শুরু করেন। সরাইল আসার সমাপ্ত করে সকল মহিলার সিঁদুর খেলেন। তারপর শুরু হয় বাড়ির উঠোনে ধামাইল নৃত্য, গানের সঙ্গে থাকে বাদ্যযন্ত্র। অধিবাসের রাতে ছেলে-মেয়েকে দুবার স্নান করানো হয়, প্রথম স্নানকে আদ্দি স্নান বলা হয়। তার পর ধামাইল গানের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে জল ভরে এনে স্নান করানো হয়। জলের গান করে সবাই মিলে জলের ঘাটে যান। ছেলের ও মেয়ের মা সুবর্ণের কাটারি, মঙ্গলঘট, পঞ্চপ্রদ্বীপসহ গান করে জলের ঘাটে যান। ঘাটের পাড়ে গিয়ে গঙ্গা দেবীর কাছে পূজার্চনা করে। তৈল সিন্দুর দিয়ে প্রদীপ গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়। দুটো প্রদীপ ভাসানো হয় একটি বরের নামে অন্যটি কন্নার নামে। প্রদীপ একসাথে থাকলে বলা হয় রাজ জোটক আর দূরে থাকলে বলা হয় সাপে নেউলে সম্পর্ক। তারপর সুবর্ণের কাটারি দিয়ে জলকে চৌ-ফলা করে কলসিতে জল ভরে সুতো দিয়ে ঘাট বন্ধন করে বাড়ির জন্য সবাই রওয়ানা দেন, আর গান করেন। গৃহে এসে স্নান করানোর পর সুন্ধা গাছকে পুড়িয়ে পিসে কপালে দেন তাকে অধিবাসের ফোটা বলা হয়। সমস্ত রাত রাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্তন করা হয়। রাত প্রভাত হলে রাধা কৃষ্ণের মিলন গেয়ে জাগরণ করে অধিবাস সমাপ্ত করেন। আবার নিশারাত্র সময়ে বাবা ঘাটের বন্ধন মোচন করে জল নিয়ে আসেন। সেই জল দিয়েই বিবাহের দিন চৌদ্দপুরুষের কাজ করা হয়। একে বলে চোরাপানি ভরার লোকাচার। বিয়ের দিন সূর্যোদয়ের আগে, অন্ধকার থাকতে থাকতে কনের বাবা ও মা ঢাকনাওয়ালা ঘট নিয়ে পূর্বে যে জলাশয়ে জল ভরে আসেন সেই জলাশয়ে যায়। কনের বাবার হাতে থাকে একটি কাঁচি। তিনি জলের বুকে কাঁচি (ধান কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়)। উল্টো মুখে ফিরে দাগ কাটতে থাকেন। কনের মা জল ভরতে থাকেন। ঘটের মধ্যে আগে থেকেই দেওয়া হয় ধান-দূর্বা-কড়ি। জলভরা শেষ হলে কলসির মুখে ঢাকনা দেওয়া হয়। তারপর তারা বাড়িতে চলে আসেন। দুপুরবেলা সেই জল দিয়েই ব্যাপারের কাজ হয়। নাপিত এসে বরের বাড়িতে বরকে

এবং কনের বাড়িতে কনেকে ক্ষৌর-কর্ম করানো হয়। বর বা কনে নতুন কাপড় পরে পিঁড়িতে বসে। নাপিত তাদের নখে চুলে ব্লেড ক্ষুর ছুঁয়ায়। নখ চুল কাটার পর স্নানের পালা শেষ হলে হাতে ধুতরা কাটাল দিয়ে যায়।

নান্দীমুখ বলে যে লোকাচারটি রয়েছে তাকে এই রাজ্যে কোথাও 'বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ' বলে। আবার কোথাও এটিকে বলা হয় 'আয়বৃদ্ধি' (আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ), চৌদ্দ পুরুষের কাজ বলে। হিন্দু-বাঙালিরা কন্যাকে পাত্রের হাতে তুলে দেবার আগে মৃত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণ করে। একসময় কৃষিজীবি বাঙালিদের ঘরে ঢেঁকি থাকত। ঢেঁকিতে ছাঁটা চাল আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের কাজে লাগত। পাঁচজন এয়ো এক সঙ্গে একটি কোদালে ধরে ঘরের কোনা থেকে মাটি তুলে আনে। সেই মাটি দিয়ে উনুনের তিনটি ইটা তৈরি করা হয়। এরমধ্যে ছোট হাঁড়ি বসিয়ে ঢেঁকি ছাঁটা চাল রান্না করা হয়। রান্নার মধ্যে মেথি তেলও মেশানো হয়। পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে এই শ্রাদ্ধ-তর্পণ বরের বাড়িতেও করা হয়। এরপর কলাগাছের ভাড়ালি দিয়ে একটি ছোট ভেলা বা 'করন্ডি' বানানো হয়। একটি কলাপাতার ডগা কেটে তাতে চিড়া, দই আর এঁটেল কলা মিশিয়ে দুটি মণ্ড তৈরি করা হয়। সঙ্গে রাখা হয় দুই খিলি পান, দু'টুকরো ছিকর মাটি এবং দু'টি জায়গায় গোলা–সিঁদুর। ব্রতিনীরা (যারা এই আচার করে) এবার কামিনী গাছের নিচে জড়ো হয়। গাছকে আগে স্নান করানো হয়, তারপর গাছের গায়ে সাতবার সুতো পেঁচিয়ে 'কাপড় পরানো'র মতো করা হয়। এরপর সেখানে কলার ভেলা ও অন্য জিনিসগুলো রাখা হয়। তারপর গাছের গায়ে একটি ডিম ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর বরের মা গাছকে জড়িয়ে ধরে। এই আচারকে 'সইআলা' বা 'ভইনআলা করা' বলা হয়। এভাবেই সই পাতানোর কাজ শেষ হয়। তারপর এয়োরা (যারা গান করে) গান গাইতে গাইতে বাড়িতে ফিরে আসে। ঘরে এসে জিনিসগুলো লক্ষ্মীঘরে রাখা হয়, আর ব্রতিনীদের সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়।

'সোহাগ-মাগা' লোকাচারটির সময় মায়ের আঁচল মাটিতে লুটাতে থাকে। একটি পুষ্প থালায় আলপনায় সাজানো হয়। এই পুষ্প থালাকে বলে বরণডালা। এতে থাকে ধান, দূর্বা, কাঁচা হলুদ, চন্দন, ঘি, মধু, দধি, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, শঙ্খ, ফুল, ফল, চামর ইত্যাদি। বর ও কনেকে যার যার বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠরা কপালে চন্দনের টিপ পরিয়ে দেয়। বরণডালাটি বরের বাড়িতে বরের কপালে এবং কনের বাড়িতে কনের কপালে ছোঁয়ানো হয়। এ সময় সারা দিনের জন্য তাকে চিড়া-দই-মিষ্টি খাওয়ানো হয়। কেউ কেউ ভাতও খায়। সারা দিন কনে আর খাবার সুযোগ পায় না। মা বাবা কনের সঙ্গে একই থালায় খায়। এই খাওয়ার কাজটি অঞ্চলভেদে আলাদাভাবে হয়।

পরবর্তী ধাপে 'উমের বাড়া' বলে একটি লোকাচার পালন করা হয়। উম শব্দটি হল ঊষ। এটি কুয়াশা শব্দের আঞ্চলিক রূপ, বাড়া শব্দটি ধান ভানার আঞ্চলিক রূপ। অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় কুয়াশা পড়ছে, এমন সময় ধান থেকে প্রস্তুত করা চাল হল এই 'উমের বাড়া'। কনের বাবা মা মিলিত ভাবে এই ধান ভানে। গাইল ছেকাঠে ধান ভানার কাজটি ওরা সামান্য সময় করে। এই সময় এক ফাঁকে কনের বাবা একটি কোদাল হাতে নেয়। তারপর বাম হাতে কনের মায়ের আচলে বাঁধা 'উপুৎ ল্যাংড়া' আগাছার বেশি অংশটি কোঁদাল দিয়ে কেটে দেয়। কেটে দেয়া আগাছার অংশটি ঘরের চালে রেখে দেওয়া হয়। আর আঁচলে বাঁধা আগাছার অংশটি 'সোহাগ প্রদীপ'-এ রেখে দেওয়া হয়। কনের বাবা-মা ধান ভানার কাজটি সামান্য সময় করার পর অন্যান্য এয়ারা বাকি কাজটি সম্পন্ন করে। ধান ভানা শেষ হলে এয়োরা চাল ঝাড়তে শুরু করে। কনের মা আঁচল বিছিয়ে বসে। খাচলে একটি মাটির থালা থাকে। তাতে চালের সঙ্গে মিশ্রিত কুঁড়াগুলি ঝেড়ে ফেলা হয়। সেই সঙ্গে 'ছেকাঠ'টি একটি দড়ি দিয়ে ছেকাঠটির গায়ে সাতটি গিঁট দেওয়া হয়। ধীরাগমনে বর

এলে বিয়ের পর বরকে এই গিঁটগুলো খুলতে দেয়া হয়। এছাড়াও তেল রান্না করা হয়। তেলের মধ্যে একটি ছেলের নামে ও অন্য একটি মেয়ের নামে পান পাতা ছেড়ে এই আচার করা হয়।

বরের বাড়ি থেকে শুরু হয় 'বরযাত্রা'। ঘরে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালানো হয় এবং ঘট রাখা থাকে। বরকে নতুন কাপড় পরিয়ে সাজানো হয়, কপালে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হয়। গলায় মালা থাকে আর হাতে ধুতরা কাঁটাইল। চারদিকে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি শোনা যায়, বাদ্যকররা বাজনা বাজাতে থাকে। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে বর মায়ের কোলে বসে। সে মায়ের কাছে তিনবার অনুমতি চেয়ে বলে—'মা, তোমার জন্য বউ আনতে যাচ্ছি, আশীর্বাদ দাও।' তখন মা তাকে দুধ খাওয়ান। শুভক্ষণে বরের বড় বোনের স্বামী বরের মাথায় ছাতা ধরে। তারপর প্রেমধ্বনি দিতে দিতে বরযাত্রী রওনা হয়।

'বরবরণ' লোকাচারটিতে বরকে কনের বাড়ির প্রবেশ দরজায় বরণ করা হয়। বরের সঙ্গে ঠাট্টা মস্করা চলে এমন লোকেরা প্রবেশ দরজায় বরের পথ আটকায়। পথের বাঁধা বলতে একটি টেবিল দীপ-রূপ-পান-সুপারি-মিষ্টি ইত্যাদি রাখা হয়। আবার কখনো কখনো একটি বাঁশ জাতীয় জিনিস দিয়ে বাঁধা তৈরি করা হয়। এখানে কিছু টাকা দাবি করা হয়। বরপক্ষ তা মিটিয়ে দিলে বাঁধা ওঠে যায়। উলুধ্বনি হয়, শঙ্খ বাজানো হয়, বাজনা বাজতে থাকে। বরকেও বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করে বসানো হয়। এরপর মিষ্টিমুখ করানোর পালা চলতে থাকে। বরকে দুধ ও জল পান করতে দেওয়া হয়। এবার বরকে উঠানে এনে বসানো হয়। সেই সঙ্গে বাড়িরে অন্যান্য প্রবীণ জামাইদেরও ডেকে এনে বসানো হয়। পাত্রপক্ষ এবং কন্যাপক্ষের অভিভাবকরা উপস্থিত থাকে। বিবাহের শাস্ত্রাচার করাবেন যে ব্রাহ্মণ, তিনিও সামনে থাকেন। কনের পিতা এবার প্রথমে অর্থ ও বস্ত্র দিয়ে পুরোনো জামাইদের বরণ করেন। তারপর নতুন বরকে অর্থ, গয়নাগাঁটি বস্ত্র অন্যান্য আনুসাঙ্গিক সহ বরণ করেন। এইভাবে পাত্রপক্ষের যাবতীয় পণ তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পণদানের পর্বটি শেষ হলে কনের পিতা ঘরে চলে যাবেন। তিনি বিবাহ চলাকালীন সময়ে পিতা-মাতা সামনে আসেন না। এবার বিবাহ বাসরে বিয়ের কাজ শুরু হয়। কনের সঙ্গে কনের বউদি স্তরের কোন মহিলা থাকেন বিবাহ মঞ্চে। বরকে আসনে বসানো হয়। প্রথমে প্রদীপ দিয়ে অর্চনা করা হয়। তারপর বিচিত্র নৃত্য সহকারে কনে হাতে ফুল নিয়ে বরকে প্রদক্ষিণ করে। মেয়ের বাড়ির গেটে আসা মাত্র বরপক্ষের বাজি ফুটানো হয়। তারপর শাশুড়ি মা বরণ করে নেন। তখন জামাইকে দেখে কন্যা ঘর থেকে যেকোনো একটি ফল খান। বরের শরীরে কোন কিছুই তার বাড়ির বস্ত্র রাখতে পারবে না। শুধু কন্যার বাড়ির বস্ত্র পরিদানে থাকতে হবে। তারপর ঘরের দরজার সামনে শাশুড়ি মা। বরের মুখ না দেখে সাত নাল সুতা ও দধি ও দুগ্ধ দিয়ে দধিমঙ্গল সম্পূর্ণ করে কুঞ্জে প্রবেশ করেন, কন্যাকে নিয়ে বৌদিরা কুঞ্জে প্রবেশ করেন। কন্যা বরকে প্রণাম করেন। পরপর পাক দিয়ে বিবাহ চলতে থাকলে পঞ্চম পাকে এসে প্রদীপ পরিবর্তন করে ও ষষ্ঠ পাকে ধুতরা কাটাইল পরিবর্তন করে, সপ্তম পাকে মালাবদল করে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এখানে সবকটা পাকেই মালা দেওয়া হয়। চতুর দিকে জয়ের ধ্বনি উলুর ধ্বনী শুরু হয়। একবার প্রদক্ষিণ শেষ করে কনে বরকে ফুল ছিটিয়ে দেয়। এইভাবে ক্রমান্বয়ে কনে সাতপাঁক সম্পন্ন করে। সাতপাঁক শেষ হলে কনের হাতে একটি ফুলের মালা ধরিয়ে দেওয়া হয়। সে তা বরের গলায় পরিয়ে দেয়। বরও অনুরূপ একটি মালা কনের গলায় পরায়। মালা বদলের পর দৃষ্টিবিনিময় হয়। একে বলা হয় 'শুভদৃষ্টি'। শুভদৃষ্টির পর মঞ্চ থেকে বরকে নামিয়ে এনে ঘরে বসানো হয়। তারপর সেখানে কিছু লৌকিক আচার সম্পন্ন করা হয়। এই সব প্রক্রিয়া শেষ হলে বর-কনেকে উঠোনে বসিয়ে শাস্ত্রীয় রীতিতে সম্প্রদান-এর কাজটি করা হয়। কনের পিতা তার কন্যাকে বরের হাতে সম্প্রদান করেন। সে সময় বর পূর্বমুখী ও কনেকে পশ্চিমমুখী করে বসানো হয়। মাঝে থাকে মঙ্গলঘট। ঘটের উপর বর তার হাত রাখে। বরের হাতের উপর কনের হাত স্থাপন করে মন্ত্রপাঠ করা

হয়। বর এক্ষেত্রে তার গোত্র, পিতাসহ তিন পুরুষকে মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে স্মরণ করেন। এই সম্প্রদান কাজের সময়ে, ঘটের উপর বর ও কনের হাত একত্রিত হয়। পাঁচটি ফল বাঁধা একটি গামছা কুশ ও ফুলের মালা সহ দুটি হাত একত্রে বেঁধে দেন ব্রাহ্মণ। সম্প্রদান কর্ম শেষ হলে এই গাঁটছড়া খুলে দেওয়া হয়। এখানে একটি যোগ্য করা হয় তার মধ্যে যে অগ্নি থাকে সেই অগ্নি কেই সাক্ষী রেখে সিঁদুর দান করা হয় এই অগ্নির মধ্যে কন্যার ছোট ভাই নতুন জামাই ও নতুন বউয়ের মাধ্যমে খই দেয়। একে খইভাটা বলা হয়।

কাশীপাতা চিরে মেয়ের বাবা স্বামীর কাছে স্ত্রীকে সমর্পণ করে দেন। পরদিন সকালবেলা সেই কুঞ্জের মধ্যেই সাত পাক দিয়ে বাসি বিবাহ সম্পন্ন করেন। বাসি বিয়া সম্পূর্ণ করে সন্ধ্যা আসলে মেয়ের মা এক কলসির মধ্যে মিষ্টি, চিড়া, মুড়ি দিয়ে মেয়েকে স্বামীর হাতে ধরিয়ে বিদায় দেন তখন সবাই দুঃখে কান্না করতে থাকে। তারপর আসে পাশা খেলা, পাশা খেলা মূলত ছেলের বাড়িতে দুবার এবং মেয়ের বাড়িতে একবার হয়ে থাকে। পাশা খেলার জন্য সুদৃশ্য একটি মাটির হাঁড়িতে নেওয়া হয় চাল, কড়ি, টাকা, সোনা, হলুদ ইত্যাদি। বর-বউকে নিয়ে বসে বধূর বান্ধবী এয়োস্ত্রীরা। পাত্রের বন্ধুরাও সেখানে থাকে। এবার কনে পাশার হাঁড়িটি ঢেলে দেয়। বর সেগুলো তুলে নেয়। আবার বর সেগুলো মাটিতে ঢেলে দিলে কনে, চাল-কড়ি (সাতটি) ইত্যাদি তুলে হাঁড়িতে রাখে। লক্ষ্য থাকে, হাঁড়িতে রাখার সময় যাতে কোন শব্দ না হয়। কেননা হাঁড়িতে শব্দ হলে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি হবার সম্ভাবনা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশা খেলায় কনের জয় হয়। কনে পাশাখেলায় জিতে গেলে বরের হাত চেপে ধরা হয়। বরের নিকট থেকে কনের জন্য উপহার দাবি করা হয়। বর উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে বরের হাত ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্যথায় মেয়ে বাম হাত দিয়ে কড়ি দেবে ও ছেলে তার ডান হাতটিতে নেবে, নিয়ে সেই কড়ি পাঠির ওপর ছাড়বে যতগুলো করি মুখ উঠবে সেগুলো গণনা করা হয়। সেই রূপ মেয়েকে দেবে মেয়েও খেলবে তার মধ্যে যার বেশি হবে সংখ্যা সেই বিজয়ী হবে।পাশা খেলার পর মিষ্টি ও পান বর-কনের সামনে রাখা হয়। বাড়িতে উপস্থিত সকল সদস্যদের পান ও মিষ্টি উপস্থিত লোকদের মধ্যে ভাগ করে দেন। পরদিন বর বিছানা ছেড়ে গেলে স্ত্রী বিছানা গুছিয়ে রাখে। একে বলে 'বিছানা তোলা'। এরজন্য বরকে বিছানার নীচে সোনার আংটি রেখে দিতে হয়।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটি লোকাচার পালন করা হয়। একে বলে বাসি বিবাহ। এই সময় ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকে। গত রাতে যেখানে পাশা খেলা হয়েছিল, সেখানেই এই বাসি বিবাহের কাজটি হয়ে থাকে। বর-বউ এর গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া হয়। সেই জায়গার মাঝখানে একটি পুকুর রয়েছে। বর কনে এক একটি পাক সম্পন্ন করে, আর ব্রাহ্মণ তার হাতের ঘট থেকে ঐ পুকুরে সামান্য জল ঢেলে দেয়। এইভাবে বাসি বিবাহ সম্পন্ন হয়। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর-বউ কাপড়-অলঙ্কারে সাজতে থাকে। বাপের বাড়ি ছেড়ে মেয়ে এবার একজন পুরুষের হাত ধরে সংসার পাততে রওনা দেবে। 'কন্যার পতিগৃহে যাত্রা' পর্বটি তাই একসময় কান্নাকাটিতে বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। বাপের বাড়ি থেকে নতুন সংসার বর-বউ গাড়িতে করে তাদের যাত্রা শুরু করে। বরের বাড়িতে গাড়ি এসে পৌঁছালে 'বধূবরণ করা হয়। বিয়ে উপলক্ষে ববের গাড়িতে সমবেত আত্ময় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশিরা বধূবরণ দেখতে জড়ো হয়। উলুধ্বনি হয়, শঙ্খ বাজানো হয়। গান গাওয়া হয়, বাদ্য বাজে। পাঁচজন ত্রয়োস্ত্রী বরণঢালা নিয়ে বর-বউকে দেখায়। শাশুড়ি বরণডালায় রাখা ঘি-এর প্রদীপ দিয়ে বউ-এর মুখ দেখেন। তাদের চলার রাস্তায় একটি কাপড় বিছিয়ে দেয়া হয়। কাপড়ের শেষ প্রান্তে একটি গাইল উপুত করে রাখা হয়। তার উপর বরের মা বসেন। তিনি বউ ও ছেলেকে কোলে নেন। তারা দুজন দুই হাটুতে বসে। বরের মাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কি গো, ছেলে ভারী না বউ ভারী'? তখন বরের মা বলেন, 'ছেলে আমার শোলার থেকেও হালকা'। আর বউ-ধনে-জনে-নাত্তি-পতি নিয়ে পাথর থেকেও ভারী'। এমন করে তিনবার বলার রীতি। ওই দিন পাকস্পর্শও করানো হয়। এছাড়াও

পিঠা করা হয়। তরকারি ভাত রান্না করে পূর্ণ করে রাখা হয় বউ এসেছে সেগুলিকে দেখে।এদিকে বরের বাড়িতে নতুন বউ এসে ঢুকবে। বাড়িতে আনন্দে হইচই। প্রবেশ করানোর সময় সাদা কাপড়ের মধ্যে আলতা পায়ে প্রবেশ করে। এছাড়া শ্বাশুরী মা বউকে গাইলে বসে কুলে তুলে নেন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করার পর। পাঠি একদিকে মা বাজ করবে অন্য দিকে ছেলে বউমা তার খুলে খুলে গৃহে যায়। তারপর মা মুছি দেখিয়ে ছেলেকে বলবেন-

মা: এটা কি?
ছেলে: মুচ্ছি।
মা: তোর শ্বশুর বাড়ি যা খেয়ে এসেছিস সব পুছি।
তারপর মা এটাকে পার তোলে ফেলে ভেঙে ঘরের পিছন দিকে ফেলে দেন।
ইচ্ছা (আগাছা) দেখিয়ে বলেন-
মা: এটা কি?
ছেলে: ইচ্ছা।
মা: তোর শ্বশুর বাড়ি যা খেয়ে এসেছিস সব মিছা।

তা বলে মা আগাছা ছিড়ে পিছন দিকে ফেলে দেয়। ওই দিন তাদের দুই জনকেই আলাদা করে দেওয়া হয় যাকে কালরাত্রি বলে। পরদিন ভোরবেলা এদের একত্রিত করা হয়। এই দিনকে কেউ কেউ চতুর্থ মঙ্গল বলে আবার কেউ কেউ বউভাতও বলে। ছেলের বাড়িতে সাত পাক শেষ হওয়ার পর জামাই বউ এর দায়িত্ব গ্রহণ করে বলে। ছেলের বাড়ির সাত পাকের নিয়ম হচ্ছে। উঠোনের মধ্যেখানে গর্ত করে তার মধ্যে দুধ জল দিয়ে কড়ি, তিল, হরিতকি দেওয়া হয়। ছেলেকে সামনে রেখে মেয়ে পিছনে তাকে তাদের রুমাল দিয়ে হাত বন্ধ করে ছিয়াতে পা না লাগিয়ে ফের হয়ে সাতটি বার প্রদক্ষিণ করতে হয়। এই দিন রাতকে বলা হয় ফুলশয্যার রাত। সাধারণত বিবাহের চতুর্থ দিনে 'বউ-ভাত', 'ভাত-কাপড়' অনুষ্ঠান হয়।' উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনি হতে থাকে। সে সময় একটি পাথরের থালায় নববধূর জন্য খাবার সাজানো হয়। তার উপর লাল-পাড়ওয়ালা একটি শাড়িও থাকে। এই সময় বর-বউ যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়ায়। বর একবার বধূর হাতে পাথরের থালাটি দেয়। পাথরের থালা দেবার পর সে তা নামিয়ে রাখে। বর আবার তা বধূর হাতে তুলে দেয়। এইভাবে প্রক্রিয়াটি তিনবার চলে। স্বজনেরা, পাড়া-প্রতিবেশীরা তাকে ধান দূর্বা দিয়ে আশীবাদ করে এবং উপহার তুলে দেয়। এভাবে বউ ভাত পর্বটির সমাপ্তি ঘটে। বউ ভাত পর্ব শেষ করে আবার বর তার বউকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে যায়। একে 'ফিরা যাত্রা' বলা হয়। বউ ভাত এর পরদিন অথবা দু-একদিন পর বর তার শ্বশুর বাড়িতে যায়। সেখানেও আবার আত্মীয়স্বজনেরা আসে। খাওয়া-দাওয়া হয়। বাড়িঘর জমজমাট হয়ে ওঠে।

পরদিন শুরু হয় নতুন বউয়ের রন্ধন। আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া। তারপর আড়াই দিন জন্য ফিরা যাত্রা (ধীরাগমন) যায়। কিন্তু ঘরের ছাল দেখতে পারবে না। ফিরে আসার পর মা দুজনকে একসঙ্গে গঙ্গায় নামিয়ে স্নান করান একে ঘাটস্নান বলা হয়। এই ভাবেই উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিবাহ কেন্দ্রীক লোকাচার করা হয়ে থাকে।

তথ্যনির্দেশ:

১. দাস, নির্মল। প্রসঙ্গ লোকসংস্কৃতি ও ত্রিপুরা। অক্ষর পাবলিকেশনস, ২০০৭।
২. চন্দ্রপাল, রাজিব। ত্রিপুরা লোক বিশ্বাস। পূর্বমেঘ পাবলিকেশন, ২০২৩।

সাক্ষাৎকার:

১. নাথ কুকিলা (বৃদ্ধ মহিলা)। উত্তর ত্রিপুরার বাসিন্দা।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 599-612
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.250

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সূত্রপাত: ভাসানীর "সাপ্তাহিক হক কথা"-র আলোকে

তাপস দাস, *সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কান্দি রাজ কলেজ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

বিমল সরকার, *গবেষক, স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.01.2026; Accepted: 13.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Generally, in discussions and writings related to periodicals, there is a strong emphasis on examining the importance of newspapers and journals in relation to the contemporary social or political–socioeconomic context. In most cases, however, such discussions and research tend to focus primarily on literary magazines. Taking previous discussions and studies into account, this paper is centered on a political newspaper of Bangladesh, Maulana Bhashani's *Saptahik Hak Katha*. With a view to analyzing the early phase of India–Bangladesh relations, the first thirty issues of this newspaper have been selected as the primary sources of the study, keeping in mind its historical significance.

However, the objective of this paper is not to verify the factual accuracy or authenticity of the articles published in *Hak Katha*. Since the very early days of Bangladesh's independence, this newspaper had been successful in creating an anti-India sentiment. The purpose of this study is to present to the readers the contexts and circumstances under which such oppositional attitudes were formed. The authors of this paper believe that in order to understand contemporary India–Bangladesh relations, it is essential to comprehend the trends and arguments reflected in the writings published in *Hak Katha*. This is because, at the very inception of India–Bangladesh relations, the newspaper raised certain issues and allegations that are largely absent from current research. Nevertheless, these unconventional allegations, the paper argues, played a significant role in generating resentment toward India among a section of the Bangladeshi population—a sentiment that continues to persist in the present day.

Keywords: Saptahik Hak Katha, India–Bangladesh Relations, Political Journalism in Bangladesh, Anti-India Discourse, Post-Independence Political Narratives

মওলানা ভাসানী এবং 'হক কথা' নিয়ে দুই-চার কথা:

হক কথা' নিয়ে আলাপের আগে এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মৌলানা ভাসানী (মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী) নিয়ে সামান্য আলোচনার প্রয়োজন আছে। তার রাজনৈতিক চিন্তার জটিলতার কারণে কেউ তাকে আখ্যায়িত করেছে 'লাল মওলানা' হিসেবে, কারো চোখে তিনি মজলুমের নেতা, আবার কারো কাছে তিনি বাংলাদেশে ভারত বিরোধী রাজনীতি আবহাওয়া সৃষ্টির কারিগর। বস্তুত, মৌলানা ভাসানী ছিলেন অবিভক্ত ভারত, পরবর্তী

পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের এক বিরোধী স্রোতের নাম। বাঙালির রাজনৈতিক চিন্তায় তার সব থেকে বড় কৃতিত্ব সম্ভবত, শ্রেণী এবং ধর্মীয় রাজনীতির একীকরণ।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ১৮৮০ সালে সিরাজগঞ্জ ধানগড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর পিতার নাম শরাফত আলী। তার পিতা অনেক উদার ও আদর্শ মনের একজন ভদ্রলোক ছিলেন। ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকদের ওয়ালাকুমুসসালাম বলে সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার ঐতিহাসিক ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন। তিনি ইসালামিক শিক্ষার জন্য ১৯০৭ সালে দেওবন্দ যান। সেখানে তিনি দুই বছর অধ্যয়ন করে আসামে ফিরে আসেন। ১৯১৭ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ময়মনসিংহ সফরে গেলে তার ভাষণ শুনে ভাসানী অনুপ্রাণিত হন।

১৯১৯ সালে কংগ্রেসে যোগদান করে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দশ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন মওলানা ভাসানী। এরপর ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য পার্টি গঠন করলে ভাসানী সেই দল সংগঠিত করার ব্যাপারেও ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৬সালে আসামে প্রথম কৃষক প্রজা আন্দোলনের সুত্রপাতও ঘটান মওলানা ভাসানী। তার পরে তিনি ১৯২৯ সালে আসামের ধুবড়ী জেলার ব্রহ্মপুত্র ভাসান চরে প্রথম কৃষক সম্মেলন আয়োজন করেন। তখন থেকে তার নাম রাখা হয় ভাসানীর মাওলানা। তারপর থেকে তার নামের শেষে ভাসানী শব্দ যুক্ত হয়।

'সাপ্তাহিক হক কথা' প্রকাশের মধ্যে দিয়ে একজন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতার পাশাপাশি সাংবাদিক ভাসানীর খোঁজ মেলে। কবি শামসুর রহমানের ভাষায় '.....যেন নেতা /নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার।' তবে মওলানা ভাসানীর 'হক কথা' প্রকাশের আগে ১৯২০ সালে জুন মাসে 'অনুশীলন সমিতি'-র প্রভাবশালী নেতা পুলিন বিহারী দাসের প্রতিষ্ঠিত 'ভারত সেবক সংঘ' -এর মুখপত্র হিসেবে 'হক কথা ' নামক একটি স্বল্পস্থায়ী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন নলিনী কিশোর গুহ।

১৯৭৬ সালের ১২ই জানুয়ারী চতুর্থ বর্ষ ৩১তম সংখ্যার সাপ্তাহিক হক কথার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়: মওলানা আবদুল হামিদ ভাসানীর 'হক কথা প্রচার' বুলেটিন প্রথম প্রকাশিত হয় আসাম থেকে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সে প্রচার বন্ধ করে দেয়। এরপর, পাকিস্তান গঠনের পরপরই ঢাকা থেকে 'হক কথা প্রচার' বুলেটিন প্রকাশ করলে পাকিস্তান সরকারও সেটি বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে ১৯৬৭-৬৮ সালে বগুড়া জেলার মহীপুর থেকে আবার প্রকাশ শুরু হলে আয়ুব সরকার তা নিষিদ্ধ করে দেয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অল্পকিছু দিন পর, টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষ থেকে ১৯৭২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী সরকারের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন নিয়ে হক কথা প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়। এরপর শুরু থেকে ৩০ টি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর মুজিব সরকার হক কথা নিষিদ্ধ করে। প্রকাশক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী হন গৃহবন্দী, সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে ১৬ মাসের জেল জীবন কাটাতে হয়।

১৯৭৬ সালে আবারো পত্রিকাটি বের হয় কিন্তু সে বছর মওলানা ভাসানীর প্রয়াণ এর গতি স্তিমিত করে দেয়। তাই ১৯৭৭ সালে মাত্র একটি সংখ্যা বের হয়। অতপর ১৯৭৮ সালে আবারো আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭৮-এই চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনাত্তোর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত হক কথার সর্বমোট ৯৯টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।বারবার বাঁধা প্রাপ্ত হওয়া এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির প্রকাশিত হওয়ার সময়কাল অনেক কম হলেও সারা দেশে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছিল মওলানা ভাসানীর হক কথা। সন্তোষের ছোট্ট একটা ঘরে ছিল শান্তি প্রেস। এই শান্তি প্রেস থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড যন্ত্রপাতির সাহায্যে বের

হওয়া হক কথা সমগ্র বাংলাদেশের ইতিহাস বদলে দিয়েছিল, খুলে দিয়েছিল বন্ধু মুখী শত্রুর মুখোশ। মওলানা ভাসানীর প্রকাশিত সকল পত্রিকার মধ্যে হক কথাই সর্বপ্রেক্ষা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

হক কথা এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক:

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আন্দাজ করা যায় যে, বাংলাদেশের এক অংশ তরুণ জনগণ ভারত বিরোধী মনোভাপন্ন হয়ে উঠেছে। এর প্রত্যুত্তরে আবার ভারতেরও এক অংশ তরুন বাংলাদেশের জন্মের সঙ্গে ভারতের অবদান স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এইভাবেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে, গ্রামে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের এক নতুন বয়ান সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ লিখলাম এই কারণে যে বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কলকাতা বইমেলায় গতবছর বাংলাদেশ বইয়ের গ্যালারি স্থগিত হয়ে গেলেও (সম্ভবত এই বছরেও বাংলাদেশের গ্যালারি থাকছে না), দিল্লিতে কিন্তু প্রথম ঢাকাই শাড়ির প্রদর্শনী হয়েছে এই বছর। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে বাংলাদেশের তরুণদের এই ক্ষোভ কি নতুন কিছু? এই লেখাটি মনে করে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যানে আমরা বর্তমানে অনুধাবন করতে পারছি ঠিকই, কিন্তু এর সূচনা হয়েছিল ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের জন্মলগ্ন থেকেই। আর এই শুরুটাই বুঝতে হক কথায় প্রকাশিত লেখাগুলিকে তুলে ধরা দরকার। তাহলে এই বর্তমান প্রজন্মের অতীত জ্ঞান সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

লেখাটিতে এই ভূমিকাটি এবং উপসংহারকে বাদ দিয়ে, 'হক কথা'-র প্রকাশিত লেখা গুলিকে মূল চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে 'চোরা চালান' সংক্রান্ত প্রকাশিত লেখা গুলি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়ভাবে 'মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ' গুলিকে এক জায়গায় করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে, 'ভারতের সেনা বাহিনী' সম্পর্কিত লেখা গুলিকে সাজানো হয়েছে। চতুর্থ ভাগে 'ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ' গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে।

চোরা চালান:

হক কথায় প্রকাশিত একটি লেখাতে অভিযোগ করা হয়, চোরাকারবারীদের বদৌলতে কাপড়ের বাজারে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের অধিকাংশ বাজার দখল করে নিয়েছে। তাতে লেখা হয়, আগে টাঙ্গাইল, পাবনা প্রভৃতি স্থানের শাড়ী কাপড়-পড়তে পেরে ভারতীয়রা গৌরব বোধ করতেন, অথচ এখন সেই ভারতেরই প্রচুর শাড়ী-কাপড় চোরাপথে এসে বাংলাদেশে ভরে ফেলেছে। এই পত্রিকার পক্ষ থেকে দাবী জানানো হয়, "চোরাপথে ভারত থেকে সুতা, রং ও কাপড় আসা অবিলম্বে বন্ধ করুন। পাকিস্তানী আমলের দামে অবিলম্বে সুতা ও রঙ সরবরাহের ব্যবস্থা করুন; খোলা বাজারে চোরাপথে আসা কাপড় বিক্রি বন্ধ করুন। উপরোক্ত দাবীগুরো পূরণ করলেই কাপড়ের দাম কমতে পারবে। নাহলে চিরদিনের নিয়মানুযায়ী দাম শুধু বাড়তেই থাকবে, কোনদিনও কমবে না।"

অন্য একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়, মেঘালয়, আগরতলা, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম দিনাজপুর সীমান্ত দিয়ে ট্রাকে করে রিলিফের মাল বাংলাদেশে পৌঁছে দেয়ার নামে চোরাচালান অব্যাহত রয়েছে। বিগত মার্চ (১৯৭২) বিশেষ করে এর শেষার্ধ থেকে প্রতিটি রিলিফবাহী ট্রাক চোরাচালানের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কলকাতা বন্দরে খালাসকৃত বাংলাদেশের মালপত্র পুনর্বাসনের নিমিত্ত প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য পৌঁছানোর দায়িত্ব ভারত সরকারের যোগাযোগ দফতর পালন করতে থাকলেও প্রেরিত ট্রাকের সাথে অসাধু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ সম্পর্ক স্থাপন করে অবাধে চোরাচালান চালিয়ে যাচ্ছে। তাই উপরোক্ত সীমান্ত এলাকায় আজকাল দেখা যায় রিলিফের ট্রাক ধান, চাউল, পাট, কলাই, হাঁস, মুরগী, ডিম, খাসী, রং, পিতল, কাঁসা ইত্যাদি বোঝাই হয়ে ফিরে

যাচ্ছে। যেহেতু এই লেনদেনের সাথে স্থানীয় প্রভাবশালী আওয়ামী নেতাদেরও সম্পর্ক বিদ্যমান তাই কোন প্রহরী কিংবা মহল এতে বাধাদান করার সাহস পাচ্ছে না।

একটি প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয় ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তিতে আমাদের মাছ রপ্তানীর অবকাশ রয়েছে সত্য কিন্তু বিগত তিন মাসে কত লক্ষ টাকার মাছ চোরাপথে ভারতে চলে গেছে এর হিসেব কেউ দিতে পারবেন না। মাছের চোরাচালান শুধু ট্রাকেই নয় লঞ্চ এবং নৌকার সাহায্যেও হচ্ছে। মোমেনশাহী জেলার কুলিয়ারচর থেকে সরাসরি লঞ্চযোগে লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত পার করা হচ্ছে। ফলে মাছবহুল এলাকায়ই আজ মাছের মূল্য ত্রিগুণ হয়ে পড়েছে।

তাছাড়া 'হক কথা'-র প্রকাশিত খবর থেকে চট্টগ্রামের গুদামজাত প্রায় ১২০ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচামাল স্বাধীনতা পরবর্তী মাত্র এক মাসের মধ্যে ভারত ও বার্মায় পাচার হওয়ার কথা জানানো হয়। এবং দাবী করা হয়, কাঁচামালের অভাবে বাংলাদেশের বহু শিল্প-কারখানা বন্ধ রয়েছে অথবা উৎপাদনের হার মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অন্য একটি প্রতিবেদনে সিনেমার ক্ষেত্রে চোরাই ব্যবসার কথা জানানো হয়, সেখানে লেখা হয় "বোধকরি চট্টগ্রামের সিনেমা হলগুলো এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক আগুয়ান। স্বাধীনতার পর থেকে চট্টগ্রামের একটি সিনেমা হলে পুরনো ভারতীয় ছবি প্রদর্শিত হচ্ছিল। গত মাসে শহরের তিনটি হলেই একের পর এক ভারতীয় ছবি দেখানো হয়েছে। সদাশয় সরকারের চোখে কবে যে এ লীলা ধরা পড়বে তা ভবিতব্যই জানে।"

একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশপ্রেমিক কয়েকজন স্বর্ণশিল্পীর অভিযোগ, ট্যাক্সিটির সাহায্যে ধনাঢ্য এক গোষ্ঠী স্বর্ণের চোরাচালান করছে। বাংলাদেশকে ফউত করে দিচ্ছে। হক কথা দাবী করে, ট্যাক্সিটি ভারতীয়, যার নম্বর ১০৫৭। অন্য একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়, ভারতীয় এই ব্যবসায়ীচক্র এদেশ থেকে গত ছ'মাসে পুরনো মজুদ ও নতুন আমাদানী করা ৩০ লাখ টন খাদ্য ভারতে পাচার করেছে। এছাড়া নতুন মওসুমে জমিতে যে ধান ফলছে, তাও ভারতীয় ব্যবসায়ীচক্র ভারতে পাচার করেছে।

তাছাড়া এই রকম অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যেখানে বলা হয়,মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের ব্যবসায়ী আর আওয়ামীলীগাররা পাট ভারতে পাচার করেছে। স্বাধীনতার পর এই ব্যবসায়ী চক্রটি সুসংগঠিতভাবে পাট পাচার শুরু করেছে। এরা নতুন পাট মওসুমে কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকা দামের পার্ট ভারতে সরাবে বলে পরিকল্পনা হয়েছে। এমনকি গত ছয় মাসে (১৯৭২) কমপক্ষে ৫০ কোটি টাকা দামের মজুদ ও নতুন চামড়া ভারতে পাচার হয়েছে। একইভাবে এ দেশের কাসা, পিতল, রূপা, ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুর জিনিসপত্র উধাও হয়ে গেছে সীমান্তের ওপারে।

'হক কথা' বাংলাদেশের যে সব গাড়ী-বাস, মোটর, ট্যাক্সি, হোন্ডা হারিয়ে গেছে, কেউ তার খোঁজ দিতে পারছে না-সেগুলো এখন কোলকাতার রাস্তায় চলাচল করছে। এমনকি, বাংলাদেশে ফেলে যাওয়া সাবেক পি আই এর আধাভাঙ্গা ক্ষুদ্র স্টল বিমানটি মেরামত করে ভারতে পাচার করা হয়েছে। বাংলাদেশের জাহাজ নিয়ে গেছে ভারত সরকার। বাংলাদেশের যানবাহন গেছে ভারতে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ নৌপথের বহু পল্টুন ও গাধাবোট বাংলাদেশের অস্ত্র বোঝাই করে ভারতে সেই যে পাচার হয়েছে আর ফিরে আসেনি।

মাড়ওয়ারীর মারপ্যাঁচে:

একটি প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, সিলেটের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে ভারতীয় মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীরা সুকৌশলে বাংলাদেশের কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আত্মসাত করছে। বিবরণে প্রকাশ, ব্রিটেন থেকে প্রতিমাসে হাজার হাজার বাঙ্গালী তাদের পরিবারের জন্যে

লক্ষ লক্ষ টাকা পাঠাচ্ছে। কিন্তু তা সরাসরি বাংলাদেশে না পৌঁছাতে বৈদেশিক মুদ্রার লাভটুকু আমাদের সরকার পাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক এক চক্র সৃষ্টি করে ভারতের মাড়ওয়ারীরাই তা ভোগ করছে।

হক কথার দুটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের জান মোহাম্মদ এন্ড কোং, আবদুর রাজ্জাক আসাদগঞ্জের পাঞ্জাবী এন্ড কোং ও ইয়াসীন এসোসিয়েটেডের ন্যায় বহু অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের মালিকরা রাজনৈতিক দেবতাদের হাতে মোটা অঙ্কের টাকা গুজে দিয়ে ননকলাবোরেটর (দালাল নয়) সার্টিফিকেট যোগাড় করে সম্পত্তি, এমনকি দোকানপাটের পজিশন উচ্চমূল্যে বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ভারতে পাড়ি জমাচ্ছে; এক শ্রেণীর আওয়ামী টাউট এই আয়োজনে শরীক হয়ে দেশের সম্পদ পাচারের বিনিময়ে কিছু পয়সা কামাই করছে। তাছাড়া, সীমান্তবর্তী জেলার যেসব অসৎ ব্যবসায়ী চোরাচালানের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াত করেন তাদেরকে বড় বাজারের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। মালপত্র বহনে এই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী চক্র পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী আশুতোষ ঘোসের ট্রাক ব্যবহার করেন। ইতিপূর্বে চোরাচালানে নিয়োজিত এই ট্রাক বেনাপোল সীমান্তে আটক করা হয়।

হক কথার একজন পাঠকের প্রকাশিত চিঠি থেকে জানা যায়, মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে মাড়োয়ারী সম্প্রদায় অভাবগ্রস্ত মানুষের সোনাদানা ও জমিজমা বন্ধক নেয়। ঋণের চড়া সুদের দরুণ গ্রহীতারা কোনদিনই আর ঋণ মুক্ত হতে পারে না। মাড়োয়ারি ও তাদের দালালরা ধান, চাউল, কেরোসিন, তেল, সরিষা, কলা,কাসাপিতলের বাসন এবং আরও বহু ধরনের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী প্রায় 'বাজার সুদ্ধ' কিনে ট্রাক ভর্তি করে হররোজ সীমান্তের ওপারে পাচার করছে। তিনি আরো দাবী করেন, আইয়ুবের আমলে চরসের চোরাকারবার ও দুর্নীতির অপরাধে এখানকার ঝাঝালো ধরনের এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর পাট রফতানীর লাইসেন্স বাতিল হয়ে গিয়েছিল। এর পর তিনি কেবল তার ছোট প্রেস বেলিং- এর কলের জন্য সামান্য পরিমাণ পাট কিনতেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবার সময় তার গুদামে যে পাট ছিল তা সকল অস্থাবর সম্পত্তির সাথে ট্রাকে তুলে তিনি ভারতে চলে যান। জয়পুরহাটের সকল বাসিন্দা তা দেখেছেন।

ব্যবসা-বানিজ্য:

ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আহমদ শাহ রেজা বলেন, যুদ্ধোত্তর প্রথম দিনটি থেকে ৫০ লাখ টন চাল, আড়াই হাজার কোটি টাকার অস্ত্র, ৩০ লাখ বেল পাট, দেড় লাখ বেল সূতা, ৫০ হাজার পাউন্ড রং, ১ কোটি ১২ লাখ বর্গফুট কাঠ, ১২ হাজার টন ইলিশসহ লক্ষ লক্ষ টাকার তাজা মাছ, প্রায় ৫০০টি যানবাহন প্রভৃতি চোরাপথে ভারতে পাচার হয়ে যাবার পর ভারত এবং বাংলাদেশের মাঝে এক বছর মেয়াদী একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিটি বিশ্লেষণ করে এক বাক্যে বলা যেতে পারে যে, এটি অসম বাণিজ্য চুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এদেশে ভারতীয় মাড়োয়াড়ী পুঁজিপতিদের দালালরা সর্বদাই সজাগ তৎপর রয়েছে। তাই সাড়ে সাত কোটির চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণ পাট চোরাপথে পাচার হয়ে যাবে। ফলে ভারত বিশ্বের একচেটিয়া এলাকায় অবাধ বাণিজ্যের সুবিধেটি পরোক্ষভাবে সীমান্ত উচ্ছেদেরই নামান্তর মাত্র। আর এর ফলে চোরাকারবারিরাই ব্যাপক সুবিধে পাবে।

সীমান্ত বাণিজ্য প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আলাউদ্দিন নামক পাঠকের প্রকাশিত লেখা থেকে, অভিযোগ পাওয়া যায় যে, স্বাধীনতা লাভের ছয় মাস পরও সরকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পুরোপুরিভাবে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করেননি। উদাহরণস্বরপ সিলেট জেলার জৈন্তাপুর, কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ উত্তর সীমান্তের কথা উল্লেখ করা যায়। অরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে প্রত্যহ বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র পাচার হচ্ছে। সরকার আমাদের চাহিদা মেটানোর জন্য যে সমস্ত খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র ভারত ও অন্য দেশসমূহ

থেকে আমদানি করেন, তাও রাতের আঁধারে অথবা প্রকাশ্য দিবালোকে অবাধ-বাণিজ্যের নামে ভারতে চলে যায়।

তাছাড়া প্রকাশিত দুটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ভারত থেকে আমদানী করা পচা তামাক বিভিন্ন ধরনের দূরারোগ্যের উৎস বলে জানা গেছে। ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহর থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে কালো বর্ণের এই অপরিশোধিত তামাক দিয়ে তৈরী সিগারেট পান করে বহু লোক বিষক্রিয়ায় ভুগছেন। বাংলাদেশে ভারতীয় সিগারেটের স্থায়ী বাজার প্রতিষ্ঠা করতে না পেরে ভারত ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করে। ভারত জানতো বাংলাদেশের সিগারেটের মজুদ অচিরেই ফুরিয়ে যাবে। কিছুদিনের জন্য খুলনা, ফরিদপুর, কুমিল্লার পল্লী অঞ্চলকে বাজার হিসাবে বেছে নিয়ে ভারত সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। এছাড়া জানা যায়, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে বসে এখন ৬০/৬৫ টাকা (ভারতীয়) মণ দরে পাট কিনছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এদেশীয় সেবকরা দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে পাট কিনে সীমান্ত অঞ্চলে মাড়োয়ারীদের আড়তে পৌঁছে দিচ্ছে। বাংলাদেশ প্রতি বৎসর প্রায় ৩০০ কোটি টাকার পাট ও পাটজাত সামগ্রী বিদেশে পাঠাতো। এবার ১০০ কোটি টাকার বেশী পাট, পাটজাত সামগ্রী রপ্তানীর সুযোগ ঘটবে না- নতুন পাট থেকে।

ভারতীয় সৈন্য প্রসঙ্গে:

'রাজশাহীর গ্রামে ভারতীয় সৈন্য' এই শিরোনামে প্রকাশিত লেখা থেকে জানা যায়,এপ্রিলের প্রথম থেকেই বাংলাদেশ সরকার রাজশাহী জেলার অভ্যন্তরে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন; নকশাল ও দুষ্কৃতিকারী দমনের নামে পুলিশ ও বাংলাদেশ রাইফেলস বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছেন। গত মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে তাদের সাথে এসে যোগ দিয়েছে ভারতীয় সৈন্যদল। তাদের পরনে সামরিক পোষাক নেই। তবে তারাই অপারেশনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ সাহায্যকারী এই সৈন্যদের শারীরিক গড়ন অবাঙ্গালীসুলভ এবং তারা উর্দুতে (হিন্দী?) কথা বলে। তাদের যুগপৎ আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে আত্রাই, রাণীনগর, মন্দা, বাগমারা, মধুগুরনই, নবাবের তাম্বু, সামসপাড়া, বড় কালকাপুর প্রভৃতি এলাকায়। এসব জায়গার যুবক ছেলে বলতে কেউ বাড়ীতে থাকতে পারছে না। তাদের নকশাল বলে ধরে নেয়াহয়।

'পার্বত্য চট্টগ্রামে গণহত্যা চলছে' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে অভিযোগ করা হয় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ইতিমধ্যে ভারতীয় বিমানবাহিনী দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরীহ পাহাড়ী মানুষদের উপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ ও বিমান হামলা চালানো হয়েছে। অন্য একটি প্রতিবেদনে গত ৪ঠা মে রাত ৯ টায় বেনাপোলের সাদিপুর বর্ডারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২৯৬৫৬৭৬ নং সেপাই গদাধর মণ্ডলকে বাংলাদেশ রাইফেল গ্রেফতার করার খবর উঠে আসে। প্রতিবেদনে বলা হয়, তার কাছে একটি বেআইনী চীনা রিভলভার ছিল। উপরন্তু বাংলাদেশে আসার তার সাথে কোন কাগজপত্র ছিল না।

'প্রেতাত্মা নয়, ভারতীয় সৈন্য সশরীরে রয়েছে' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে দাবী করা হয়,বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কম্যান্ড পয়েন্টই শুধু নয়, এমনকি সামরিক হেলিকপ্টার ও বিমানগুলোও ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের গোলযোগ বলে কথিত দমন অভিযানকে কেন্দ্র করে এখনও চট্টগ্রামে, অনুরূপভাবে রাজশাহী সীমান্তে বাংলাদেশ ভূমিতে অসংখ্য ভারতীয় সৈন্য রয়ে গেছে। পাগড়ী-দাঁড়ি বিশিষ্ট শিখ সেনারা চট্টগ্রামে রেল, বাস, বিমানে আহলাদ ও আবদার খাটাতে যেয়ে নিজেরাই 'তোমহারি দোস্ত ফৌজ' বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে। এছাড়া দু'দেশের মৈত্রী সহযোগিতা চুক্তির ভিত্তিতে পরবর্তী সময় স্বাক্ষরিত প্রোটকল চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মূল কমান্ডের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে প্রকাশ্যেই ভারতীয় সামরিক উপদেষ্টারা রয়েছে।

অন্য একটি প্রতিবেদনে দাবী করা হয়, যশোর ক্যান্টনমেন্ট আবার ভরে গেছে ভারতীয় সৈন্যে। ময়মনসিংহ শহরে তাবুফেলে ভারতীয় সৈন্যরা অবস্থান করছে। চট্টগ্রামে আরও নতুন সৈন্য আমদানী করা হয়েছে। বিশেষ করে ঢাকায় বাংলাদেশবাহিনীর ভেক ধরে বহু ভারতীয় সৈন্য বিভিন্ন স্থানে আস্তানা করেছে।ধারণা করা হচ্ছে, যশোরে ২৫ হাজার, চট্টগ্রামে ১০ হাজার, ঢাকায় ৫ হাজার, ময়মনসিংহে ২ হাজার ভারতীয় সৈন্য এসে পড়েছে। অন্যান্য জেলার খবর এখনও পাওয়া যায়নি। তবে সিলেট ও কুমিল্লা সীমান্ত পথে ভারতীয় সামরিক যানবাহনের আনাগোনা বেশীমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে।

ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ:

'আমি সেদিন ভারতে বন্দী' শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভাসানীর এবং ভারতের অবদান সম্পর্কে ভাসানীর যে বয়ান পাওয়া যায়, সেটি হল মওলানা সাহেব বললেন, 'আমি বলি না, আমি এদেশের স্বাধীনতা এনেছি। আমি সেদিন ভারতে বন্দী। মুজিব সেদিন পিণ্ডিতে বন্দী। কিন্তু মোজাফফর, মণিসিং মুক্ত অবস্থায় ভারতে বিচরণ করে বেড়ালেও একদিনের জন্যেও মাতৃভূমিতে আসে নাই। আমি কেন আসতে পারলাম না আমার চেয়ে ইন্দিরা সরকারই ভাল জানেন। তাই সবাইকে সবুর করতে বলি- সময় আসলে ভাসানীর দরকার হবে না। এদেশের মানুষ রায় দেবে স্বাধীনতা সংগ্রামে কার দান কত। জনৈক সাংবাদিক মওলানাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এতদিন বলেন নি কেন ভারতে বন্দী ছিলেন?।' জবাবে মওলানা বললেন 'আমি জানি একটি বৃহৎ জনতা এতে ক্ষুব্ধ হবে এবং বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীতে গোড়াতেই ফাটল ধরে যাবে। তা ঠেকাতেই চুপ ছিলাম। বুঝি না, কেন মস্কোওয়ালারা কেঁচো খুড়তে সাপ বের করছে।'

"কেন ভারত সরকার আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী এগিয়ে এলেন?" এই শিরোনামে লেখা হয়,শুধু ভারতের নয় সারা বিশ্বের নির্যাতিত জনগণ আমাদের বন্ধু। বিশেষ করে রক্তাক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিগত নয় মাসে ভারতের জনগণ আমাদের প্রতি তাদের বন্ধুত্বের আকৃত্রিতা প্রদর্শন করতে পেরেছেন। চরম বিপদের দিনে তারা আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, খাবার দিয়েছেন, দিয়েছেন যুদ্ধের প্রেরণা এবং ভবিষ্যতের অনাবিল ভক্তসা। তাদের সাহায্যে কোন দুরভিসন্ধি ছিল না, উদ্দেশ্যের পেছনেও ছিল না কোন স্বাধন্ধতা। কিন্তু ভারত সরকার জনগণ নয়। তবু সরকার আমাদের সাহায্য করেছেন-এক কোটি শরণার্থী এবং পলাতক সরকারকে আশ্রয় দিয়েছেন, মুজিবনগর এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছেন, অস্ত্রের সাহায্য করেছেন এবং সর্বশেষে সারা বিশ্বকে হতচকিতে করে দিয়ে নিজের সেনাবাহিনীকে তৈরী যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামিয়ে হানাদার পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করানোর মধ্য দিয়ে এনে দিয়েছেন আমাদের স্বাধীনতা। আজ তাই আমরা 'স্বাধীন'।

কিন্তু ভারত সরকারের সাহায্যে পরিচালিত এই যুদ্ধে বামপন্থীদেরকে সুকৌশলে কোণঠাসা করা হয়েছে। স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, মুক্তিবাহিনীতে এমন কাউকেই নিতে দেয়া হয়নি যারা পরবর্তীকালে ভারতসরকারের যাচ্ছেতাই কার্যকলাপের বিরোধিতা করবেন। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার মধ্য দিয়ে ভারত সরকার তার খাদ্য সংকট থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন, প্রতি বছরের অসংখ্য উদ্বাস্তু সমস্যারও সমাধান করতে চেয়েছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং বিদ্রোহী পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ী থেকে শুরু হয়ে যে কৃষিবিপ্লব পরবর্তীকালে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল তার হাত থেকেও মুক্তির প্রয়োজন ছিল।

'কার স্বার্থে ভারত এসেছে?' প্রতিবেদনে প্রশ্ন তোলা হয়, কিন্তু ভারত যা করেছে তাকি বাঙালীদের, নাকি নিজের স্বার্থের গরজে? সত্য কথা বলতে গেলে, ভারত বাংলাদেশ আন্দোলনে অদ্যাবধি যে পরিমাণ লাভবান হয়েছে তাতে ভারতের উচিত বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। কারণ, যথা- (১) ভারতেআশ্রয়প্রাপ্ত বাংলাদেশের

শরণার্থীদের সাহায্য সামগ্রী আত্মসাৎ করে ভারত পশ্চিমবাংলার দীর্ঘ দিনের খাদ্য ঘাটতি পূরণ করেছে এবং তার আর্থিক অচলাবস্থার মোকাবেলা করেছে। শরণার্থীদের দোহাই দিয়ে সে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা লুটছে। যে কোন সচেতন শরণার্থীই এর সত্যতা সমর্থন করেন। (২) স্বাধীন বাংলার জন্ম মাধ্যমে ভারত তার জন্য শত্রু পাকিস্তানকে পঙ্গু করতে সমর্থ হয়েছে। (৩) ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের অত্যাচারের স্টিমরোলারে নিষ্পেষিত পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। গত২৫ বছরে নয়াদিল্লীর শাসকচক্র পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে পারে নাই। এমতাবস্থা চলতে থাকলে, অচিরেই পশ্চিমবাংলা স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করত। কিন্তু ভারত, বাংলাদেশ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ায় সে সম্ভাবনা সাময়িকভাবে হলেও দূর হয়েছে এবং গত নির্বাচনে 'গণতন্ত্রী' (?) কংগ্রেস পশ্চিমবাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেখানে আরও কিছুদিন দমননীতি অব্যাহত রাখার সনদ লাভ করেছে। (৪) পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর ভারত, বাংলাদেশের মানুষের অর্থ খরিদ করা, কয়েক হাজার কোটি টাকার অত্যাধুনিক পাকিস্তানী সমর অস্ত্র ও প্রায় ৪০ হাজার সামরিক গাড়ী বাংলাদেশ থেকে ভারতে নিয়ে গেছে। ভারতীয় সৈনারা এ দেশের অনেক মিল-কারখানার মূল্যবান যন্ত্রপাতি লুট করেছে। (৫) শিল্পে অনুন্নত ও কাঁচা মালে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে ভারত অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, ভারত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে লাভবান হয়েছে অনেক বেশী পরিমাণ। এর পরও যদি কেউ বলে, "ভারতের নিকট বাংলাদেশকে কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত" তবে

একটি প্রতিবেদনে আরো বলা হয় যে, ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এর সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করে চলছে, তাতে আজ আর কোন সন্দেহ নেই।মুজিব সরকারের প্রতি ইন্দিরা-চক্রের নির্দেশ বলবৎ হয়েছে, বাংলাদেশের জন্যে পৃথক কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাখা যাবে না। পদাতিক বাহিনীতে আর একজনকেও যদি রিক্রুট করতে হয় তবে আর কারো না হউক ভারত চায় না বাংলাদেশ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ফিরে আসুক -গত মাসে বিমানবাহিনী বিদ্রোহ করেছিল- বন্দর পরিষ্কারের নামে বঙ্গোপসাগরে রুশ নৌ তদারকি চেপে বসেছে।

বাংলাদেশের বিমানবাহিনী শূন্যতা থেকে কয়েক মাসে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। মুজিব সরকারের কোথাও সম্মতিতে কোথাও অসম্মতিতে ভারতীয় গোয়েন্দাচক্র সকল গতি ও প্রগতিকে নস্যাৎ করতে উঠেপড়ে লেগে আছে। আমাদের বিমানবাহিনীটিকে অঙ্কুরেই তারা পঙ্গু করে দিতে সমর্থ হয়েছে। তৎসঙ্গে আবার ভারতীয় গোয়েন্দারই উস্কানীতে সাড়ে তিনশতেরও বেশী এয়ারম্যান গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পদাতিক বাহিনী দিয়ে তৎক্ষণাৎ বিমান দফতর এলাকাটিকে ঘেরাও করে ফেলা হয়। ৪৮ ঘন্টা এই অবরোধ চলার পর ৩০ জনকে গ্রেফতার ও ৫ জনকে কোর্ট মার্শালে বিচার করা হয়। এই ঘটনাটি বাংলাদেশে পদাতিক ও বিমানবাহিনীর মধ্যে দারুণ তিক্ততার সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের তাই কাম্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশের যে কয়টি জাহাজ ছিল তাও ভারত নিজের দখলে নিয়ে গেছে। প্রথমে তারা এগুলো কিছুদিনের জন্যে ব্যবহার করতে অনুমতি প্রার্থনা করে। হাতে পাবার পর তারা আর ফেরত দিচ্ছে না। এগুলোর একটির নাম ছিল বাকের। ভারত এই জাহাজটির রং পাল্টিয়ে নাম রেখেছে হুগলি। হুগলিতে করেই তারা সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার পাক অস্ত্র বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যায়।

আরো দুটি প্রতিবেদনে অভিযোগ আনা হয় যে, আজ বাংলাদেশ এমনিতেই তিনটি জাহাজের মালিক থাকার কথা। কিন্তু ভারত চক্রান্ত করে তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে। স্বাধীনতার পর চট্টগ্রাম থেকে তারা তিনটি জাহাজ নিয়ে গেছে। 'বাকের'-এর নামক জাহাজটি দিয়ে দখল করা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাবার নাম করে শ্রেফ জাহাজই দখল করে বসেছে। বাকেরের রং পাল্টিয়ে ভারত এর নাম রেখেছে 'হুগলি'। তাছাড়া আমাদের

'মধুমতি' ও 'পাসনী' ভারত নিয়ে গেছে। নিজ দেশে পরবাসী হবার মতই আমরা জাহাজের মালিক হয়েও উচ্চ মূল্যে পুরনো একটি কিনেছি।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ভারতীয় শিপিং সংস্থার অভিভাবকত্বে যুক্তরাজ্য-ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ কনফারেন্স লাইনের সদস্যপদ পেয়েছে। এতে সুযোগের চাইতে দুঃখ কুটেছে ঢের বেশী। কনফারেন্স লাইনের সদস্য হলে সুবিধা হলো, বাংলাদেশের জাহাজ যেমন পাট নিয়ে কুয়ালালামপুর গেল, সেখান থেকে ফিরবার সময় জাহাজটিকে ভাড়াটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, এবং কনফারেন্স লাইনের যোগাড় করা জাহাজী মাল তুলে এদিকে চলে আসতে পারবে। ফলে জাহাজ চালনার খরচ উঠে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রায় লাভ থাকে প্রচুর। ভারত গত কয়েকমাসে বাংলাদেশের জাহাজী মালের কোটা বহন করার জন্য বিদেশী বন্দরে গিয়ে নিজেদের জাহাজে বাংলাদেশের পতাকা সেঁটেছে। এ পথে বাড়তি লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ভারত ট্যাকে গুজেছে।

'ডিপি ধর আউট: এবার হাকসার' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, বাংলাদেশ এখন ইন্দিরার মঞ্চ ইন্দিরা গান্ধীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী পি এন হাকসার 'অসুস্থ' ডি পি ধরের দায়িত্ব নিয়ে ১৬ই জুলাই বাংলাদেশে তশরীফ এনেছেন। সিমলা চুক্তির ব্রিফ নিয়ে হাকসারের বাংলাদেশে আগমনের ফলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, দিল্লী-মস্কো আঁতাতের একনিষ্ঠ সেবক ডি পি ধর আর ইন্দিরা গান্ধীর আস্থাভাজন নয়। মস্কোর চয়েসের লোক ডি পি ধর রাশিয়ার কিঞ্চিৎ স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা সব সময় করতেন ভারতের ষোলআনা স্বার্থ উদ্ধারের পরেও। ডিপি ধর সীন থেকে আউট হয়ে যাওয়ায় ভারতের মস্কোপন্থীরা প্রমাদ গুণছে। তারা স্পষ্ট বুঝতে পারছে, অনেক আশা নিয়ে রচিত তাদের সুখের ঘর 'সকলি গরল ভেলের' মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের মস্কোওয়ালারা অবশ্য একটু ভিন্ন গোছের।মস্কোর চাইতে তারা বেশী করে ভারতের আজ্ঞাবহ এবং অনিবার্যভাবে ভারতমুখী নেতৃবৃন্দের 'বিশ্বাসগুণের' ফলশ্রুতি। তবু পি এন হাকসারের বাংলাদেশ সফরের পরপরই এখানকার মস্কোওয়ালাদের উপর 'জবর কষণ' শুরু হয়ে যাবে, ভারতেরও হবে ঠিক তাই।

একটি প্রতিবেদনে হক কথা ভারত বাংলাদেশের মধ্যে ৭ টি গোপন চুক্তির কথা উল্লেখ করা হয় এবং সেগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় সরকারের অভ্যন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গুতোগুতি শুরু হওয়ায় গোপন চুক্তির কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যতদূর জানা গেছে- এসব চুক্তিতে ভারত কতকগুলি ব্যাপারে - বাংলাদেশকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালনার কর্তৃত্ব লিখিয়ে নিয়েছে।

(১) বাংলাদেশে ভারত তার ইচ্ছামত, তারপছন্দসই লোক দিয়ে, পছন্দসই নেতৃত্ব পাঠিয়ে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করবে, যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধা-সামরিক বলে পরিচিত হবে, কিন্তু এদেরকে গুরত্বের দিক থেকে ও সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের মূল সামরিক বাহিনী থেকে বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ রাখা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, এই বাহিনীটি হচ্ছে রক্ষীবাহিনী। ভারতীয় সৈন্যের পোষাক, ভারতীয় সেনামণ্ডলীর নেতৃত্ব ও ভারতের অভিরুচি অনুযায়ী বিশেষ শ্রেণীর লোককে শতকরা ৮০ জন এবং 'বিশেষ বাদ'এর সমর্থক ২০ জন করে নিয়ে এই বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। অস্ত্র, গাড়ী, পোষাক, সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে এই বাহিনীটি মূল বাহিনীকে ছাড়িয়ে গেছে। এ বাহিনীটি ব্যবহার করা হবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। ভারত বিরোধী কোন সরকার ঢাকায় ক্ষমতায় বসলেও এ বাহিনী দিয়ে তাকে উৎখাত করা হবে।

(২) বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে যে সামরিক সাহায্য নিয়েছে তা পরিশোধ করতে হবে বিভিন্ন ভাবে: (ক) ভারত ছাড়া অন্য কোন দেশের কাছ থেকে বাংলাদেশ অস্ত্র কিনতে পারবেনা। মাঝে মাঝে ঘোষণা করা হবে ভারত থেকে এত কোটি টাকার অস্ত্র কেনা হলো। এর দাম ভারতই ঠিক করে দেবে। সরবরাহ দেওয়া হবে

অর্ধেক অস্ত্র। সরবরাহকৃত অস্ত্রও ভারত ইচ্ছামত নিজ দেশেনিয়ে যেতে পারবে। অর্থাৎ একই অস্ত্র বারবার দেখিয়ে ১৯৭১-এর পাওনা এবং ভারতের সম্পূর্ণ যুদ্ধ খরচ আদায় করা হবে। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনের অস্ত্র ছাড়া কোন ভারী অস্ত্র, সাজোয়া গাড়ী বা ট্যাঙ্ক বাংলাদেশকে দেয়া হবে না।

(৩) বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ভারতের অনুমতি ছাড়া কোন পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা যাবে না। কোন পণ্য কত দরে বাইরে রপ্তানী করতে হবে ভারত সেই দর বেধে দেবে। এসব পণ্য ভারত নিজে কিনতে চাইলে বাংলাদেশ আর কারো সাথে সে পণ্য বিক্রির কথা আলোচনা করতে পারবে না। বাংলাদেশের আমদানী তালিকা ভারতের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

(৪) বাংলাদেশের বাৎসরিক ও পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি ভারতকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

(৫) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অন্তবর্তী রাখতে হবে। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতির ক্ষেত্রে ভারতের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

(৬) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার চুক্তিগুলি বাংলাদেশ একতরফাভাবে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে ভারত এ চুক্তিগুলির কার্যকারিতা অস্বীকার না করলে বৎসর-বৎসরান্তে এ চুক্তিমালা বলবৎ থাকবে।

(৭) ডিসেম্বর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তিটিতে বলা হয়েছিল যে, ভারতীয় সৈন্যরা যে কোন সংখ্যায়, যে কোন সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে এবং বাধাদানকারী যে কোন মহলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে। ভারতীয় বাহিনীর এ ধরনের অভিযানের প্রতি বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃতি দিচ্ছে। ভারত চুক্তিটি নাকচ না করলে বৎসরান্তে এ চুক্তি কার্যকরী থাকবে।মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে ভারত মোটামুটি এ ধরণের চুক্তিগুলি সম্পাদন করে নিয়েছিল।

'মুদ্রা কারবার' নামক একটি প্রতিবেদনে এক অংশে বলা হয়, "ভারতীয় সরকারী ব্যবসায়ী চক্রটিকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে ভারত সুকৌশলে বাংলাদেশের মুদ্রাকে অর্ধেকেরও কম দামে নামিয়ে দিয়েছে। মুদ্রামানের এই হ্রাসের দরুণ ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে যা-ই নিচ্ছে তাতেই লাভ হচ্ছে প্রচুর। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাত পড়েনি এমন একটি গ্রামও নেই বাংলাদেশে। আর যেখানেই তারা হাত দিয়েছে সেখানেই মোটা গাছটি থেকে শুরু করে, তাঁতীদের তৈরী কাপড়, চাষীর পাট, জমির ধান, মওসুমি ফল,বিলের মাছ সবকিছু এক নাগাড়ে কিনে ফেলেছে। তারপর ধীরে ধীরে পাচার করেছে ভারতে।"

আমরা সকলেই জানি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অন্যতম বিষয় ছিল, ফারাক্কা বাঁধ। এই বিষয়ে বাংলাদেশে সবথেকে যিনি সবর থেকেছেন তিনি হলেন মওলানা ভাসানী। হক কথার এক প্রতিবেদনে লেখা হয়, ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশে বেশ কথিত একটি বিষয়। কিন্তু ইহার হের-ফের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহল অবহিত থাকিলেও জনগণ কোন প্রকার সুস্পষ্ট ধারণা রাখে না। কারণ, এই বাঁধটি সম্পর্কে এতদিন ভারতীয় সরকার যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, কেহ বিশ্বাস করে নাই। আবার পাকিস্তান আমলে ওয়াপদার বরাত দিয়া বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় যাহা প্রচার হইয়াছে তাহাতেও নিরঙ্কুশ কোন জনমত গড়িয়া উঠে নাই। ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কে কত বৈঠক হইয়াছে কত ফিচার রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যে পাকিস্তানী আমলে বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞ মহলের বক্তব্যকেও অনেকে বানোয়াট মনে করিয়াছেন। তখন তাহারা পরিসংখ্যান, ভৌগোলিক অবস্থান, নদী-নালার অবস্থা ইত্যাদির সাহায্যে একটি সত্যই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন-ফারাক্কা। বাংলাদেশবাসীর জন্য মরণ বাঁধ বৈ কিছু নয়। ইহার দরুণ লক্ষ লক্ষ একর জমি আবাদের অযোগ্য হইয়া পড়িবে। আবার বর্ষাকালে হাজার হাজার গ্রাম প্লাবিত হইয়া যাইবে। বিশেষ করিয়া রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলার জন্য ফারাক্কা বাঁধ ভয়াবহ হুমকি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভালভাবে পড়াশুনা করিয়া এমন কি সরেজমিনে তদন্ত

করিয়াও ওয়াপদার প্রচারণাকে মোটেই সন্দেহ নাই। বরং পাঠক-লেখক মহল বিশেষজ্ঞদের সহিত একমত হইয়াছেন যে, ফারাক্কা বাংলাদেশের সুখ-সমৃদ্ধির প্রশ্নে একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ।

এছাড়া একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, খোদ ভারতীয় সরকারী মহল বাংলাদেশকে শোষণের আরেকটি উর্বর ক্ষেত্র হিসাবে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প ও পাঠ্যপুস্তকের বাজার দখলের জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। অন্য একটি প্রতিবেদনে বিরোধিতা করে লেখা হয়, যে দেশ ধর্ম নিরপেক্ষতা আর গণতন্ত্রের সোচ্চার দাবীদার, যে মহল উদারতা ও প্রগতিশীল সংস্কৃতির 'আগুয়ান', 'সমঝদার'-সেই দেশ ভারতে সেই মহল কংগ্রেস 'রবীন্দ্র সদন কমিটির' বদৌলতে বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মোৎসব সরকারীভাবে পালিত হবার পথ রুদ্ধ করেছেন।

শেষ কথা:

লেখার শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছিল যে, হক কথায় প্রকাশিত খবর গুলির সত্য মিথ্যা যাচাই করা এই লেখার উদ্যেশ্য নয়। এই লেখার মধ্যে দিয়ে শুধু মাত্র হক কথার অভিযোগ কিংবা বিষয় বস্তুগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা সকলেই জানি ভাসানীর মত রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন কিছু অভিযোগ করছে বা প্রকাশ করছে , স্বাভাবিক ভাবেই সেটি জনমানসে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে যারা ভাবিত, তাদের এই বিষয় গুলি সম্পর্কে অবগত থাকার প্রয়োজন আছে বলে এই পত্র মনে করে। তাছাড়া, মওলানা ভাসানী যেহেতু চীন পন্থী বাম রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন সেক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়গুলি বিচার করতে সুবিধে হয়। শুধু তাই নয়, অতীতের বিরোধগুলির সম্পর্কে অবগত হলে বর্তমানের সঙ্গে তার পরিবর্তন এবং মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব ।

তথ্যসূত্র:

১. শীতলক্ষ্যা তীরের ঢাকাই জামদানি যখন যমুনার কূলে দিল্লি মাতিয়ে তুলেছে. (2025, September 21). *BBC*. https://www.bbc.com/bengali/articles/c8rvv55el34o

২. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, আগস্ট ১৮). In *পচা তামাকের সিগারেট মানুষ অসুখে পড়েছে* (Vol. ২৫ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৩. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, আগস্ট ১৮). In *কলকাতা মিশন এখন ঠুটো জগন্নাথ আশ্রম* (Vol. ২৫ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৪. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, আগস্ট ১৮). In *কার স্বার্থে ভারত এসেছে ?* (Vol. ২৫ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৫. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, আগস্ট ২০). In *জাল নোট* (Vol. ২৬ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৬. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, আগস্ট ২০). In *প্রেতাত্মা নয়, ভারতীয় সৈন্য সশরীরে রয়েছে* (Vol. ২৬ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৭. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, আগস্ট ৪). In *ব্যবসায়ী পাচারে নয়া ব্যবসা* (Vol. ২৩ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৮. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, এপ্রিল ২). In *রিলিফের নামে চোরা চালান* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue ষষ্ঠ সংখ্যা).

৯. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, এপ্রিল ২). In *মাছের চোরা চালান* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue ষষ্ঠ সংখ্যা).

১০. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, এপ্রিল ২). In *১২০ কোটি টাকার কাঁচামাল উধাও* (ষষ্ঠ সংখ্যা ed., Vol. প্রথম বর্ষ).

১১. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, এপ্রিল ২). In *চোরাই সিনেমা* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue ষষ্ঠ সংখ্যা).

১২. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, এপ্রিল ২৩). In *ডব্লিউ জিটি ১০৫৭* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue নবম সংখ্যা).

১৩. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, এপ্রিল ২৩). In *মাড়োয়ারী মারপ্যাঁচ* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue নবম সংখ্যা).

১৪. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, এপ্রিল ৩০). In *ফারাক্কা বাঁধের হেরফের* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue দশম সংখ্যা).

১৫. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুন ১১). In *মাড়োয়াড়িদের বাড়াবাড়ি চরমে উঠেছে* (Vol. সপ্তদশ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

১৬. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুন ১১). In *বাংলাদেশে শিপিং গড়ে ওঠার বিরুদ্ধে ভারতীয় চক্রান্ত* (Vol. সপ্তদশ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

১৭. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুলাই ১৪). In *ভারতীয় সেনা সরকারই দায়ী* (Vol. ২০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

১৮. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুলাই ১৪). In *বুলেট এসে গেছে* (Vol. ২০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

১৯. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুন ২). In *বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা পঙ্গু রাখতে রুশ ভারতীয় চক্রান্ত* (Vol. চতুর্দশ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

২০. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুলাই ২১). In *বাংলাদেশ এখন ইন্দিরার মঞ্চ* (Vol. ২১ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

২১. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুলাই ২৮). In *কলকাতা থেকে সব করে দেওয়া যাবে* (Vol. ২২ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

২২. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুন ৩০). In *বিডিআর ও রক্ষীবাহিনীর সাথে ভারতীয় সেনারাও মিলেছে* (Vol. অষ্টাদশ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

২৩. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুন ৩০). In *সীমান্ত বাণিজ্য সম্পর্কে* (Vol. অষ্টাদশ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

২৪. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুলাই ৭). In *সবই তেলেসমাতি* (Vol. উনিশ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

২৫. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, জুন ৯). In *চীনা সহ ভারতীয় সৈন্য গ্রেপ্তার* (Vol. পঞ্চদশ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

২৬. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, মার্চ ২৪). In *সরকারী ভাবে ভারতে আর নজরুল জন্মোৎসব হবে না* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue পঞ্চম সংখ্যা).

২৭. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, মার্চ ২৪). In *কৃত্রিম সুতা সংকট এবং ভারতে রং পাচার* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue পঞ্চম সংখ্যা).

২৮. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, মে ১২). In *ফারাক্কা বাঁধের হেরফের* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue একাদশ সংখ্যা).

২৯. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, মে ১২). In *ভারত বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue একাদশ সংখ্যা).

৩০. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, মে ১৯). In *রাজশাহী গ্রামে ভারতীয় সৈন্য* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue দ্বাদশ সংখ্যা).

৩১. *সাপ্তাহিক হক কথা* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue দ্বাদশ সংখ্যা) [পত্রিকা]. (১৯৭২, মে ১৯). রাজশাহী গ্রামে ভারতীয় সৈন্য.

৩২. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, মে ১৯). In *ইহা কি সত্য ?* (Vol. প্রথম বর্ষ, Issue দ্বাদশ সংখ্যা).

৩৩. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, মে ১৯). In *ইহা কি সত্য ?* (Vol. দ্বাদশ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৩৪. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ১). In *ভারতীয় সৈন্য ছেয়ে যাচ্ছে* (Vol. ২৭ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৩৫. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ১৫). In *ভারতীয় বিমান থলের বিড়াল* (Vol. ২৯ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৩৬. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ২২). In *সেই গোপন ৭ চুক্তি* (Vol. ৩০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৩৭. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ২২). In *ভারত রাশিয়ার কবর রচনা করো* (Vol. ৩০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৩৮. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ২২). In *ধান -চাউল* (Vol. ৩০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৩৯. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ২২). In *পাট* (Vol. ৩০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৪০. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ২২). In *যানবাহন* (Vol. ৩০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৪১. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ২২). In *চামড়া* (Vol. ৩০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৪২. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ২২). In *মুদ্রা কারবার* (Vol. ৩০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৪৩. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ২২). In *ভারতীয়রা ১০০ টাকা দরে পাট কিনে নিয়ে যাচ্ছে* (Vol. ৩০ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৪৪. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ৮). In *ভারতের প্রভুত্বের পদাঘাত* (Vol. ২৮ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৪৫. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ৮). In *ভারতের প্রভুত্বের পদাঘাত* (Vol. ২৮ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৪৬. সাপ্তাহিক হক কথা [পত্রিকা]. (১৯৭২, সেপ্টেম্বর ৮). In *ওপার বাংলা দিল্লি ছাড়ো: এপারের বাঙালি* (Vol. ২৮ সংখ্যা, Issue প্রথম বর্ষ).

৪৭. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর কিছু কথা অথবা জীবনি. (২০২৪, নভেম্বর ১৭). *দৈনিক হক কথা.*
https://dailyhaquekotha.com/2024/11/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A6-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8/

৪৮. সালেক, আ. (Ed.). (২০০৬). *মওলানা ভাসানীর সাপ্তাহিক হক কথা সমগ্র* (তৃতীয় প্রকাশ ed.). ঘাস ফুল নদী.

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 613-623
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.251

চিকিৎসা নৈতিকতার সংকট প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

কাজী মাহফুজা হক, *সহকারী অধ্যাপক, নীতিবোধ ও সমতা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

Received: 18.12.2025; Accepted: 21.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Medical ethics in Bangladesh has become a complex, multi-layered challenge where universal ethical ideals repeatedly collide with local socioeconomic constraints, cultural values, and institutional limitations. This article provides a structured conceptual analysis grounded in Kantian deontological duty, Mills utilitarian reasoning in public health and resource allocation, and the World Medical Associations Declaration of Geneva as a modern professional ethical pledge. It frames the ethical crisis across three linked levels: (1) policy-level gaps between ethical rules and implementation, (2) value-level tensions between individual autonomy and family-cantered decision-making shaped by cultural-religious norms, and (3) practical constraints driven by scarce resources, high patient load, weak infrastructure, and urban-rural inequities. Based on this diagnosis, the article proposes an integrated reform pathway combining institutional/legal strengthening, ethics-focused medical education and continuous training, culturally adapted consent and communication practices, improved data governance and privacy protection, and fairer mechanisms for allocating limited healthcare resources.

Keywords: Medical Ethics in Bangladesh, Deontological and Utilitarian Ethics, Healthcare Policy and Governance, Patient Autonomy and Cultural Values, Resource Allocation in Public Health

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানবকল্যাণের নতুন সম্ভাবনার দ্বন্দ উন্মোচন করেছে, কিন্তু সেইসঙ্গে তৈরি করেছে জটিল নৈতিক সংকটের এক অদৃশ্য প্রান্তর (Kant, 1785)। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই সংকট আরও গভীর ও বহুমাত্রিক, যেখানে সার্বজনীন চিকিৎসা নীতিশাস্ত্রের আদর্শিক কাঠামো প্রায়ই মুখোমুখি হয় স্থানীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার (Kant, 1785)। বিশ্ব চিকিৎসা নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করেছেন দার্শনিকরা– ইমানুয়েল কান্টের 'সূত্রনিষ্ঠ কর্তব্যজ্ঞান' (Categorical Imperative) যা চিকিৎসককে রোগীকে কখনো কেবল 'সাধন' না মনে করে, বরং 'স্বরূপ' হিসাবে সম্মান করতে নির্দেশ করে[২]। অন্যদিকে জন স্টুয়ার্ট মিলের উপযোগীতাবাদ (Utilitarianism) 'সর্বোচ্চ সংখ্যকের সর্বোচ্চ মঙ্গল' নীতিতে জনস্বাস্থ্য নীতির ভারসাম্য খোঁজে (Mill, 1859)। আর জেনেভা ঘোষণা (১৯৪৮) চিকিৎসকের জন্য যে শপথবাক্য নির্ধারণ করে, তা মানবিক মর্যাদা ও পেশাদার সততার সার্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে (Mill, 1861)। কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে এই আদর্শিক কাঠামো যখন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়, তখন দেখা দেয় নীতিগত ফাটল স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা-অসুবিধার বৈষম্য, সম্পদের অপ্রতুলতা, বাণিজ্যিকীকরণের চাপ, সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার দ্বন্দ, এবং নীতিমালা প্রণয়ন ও

বাস্তবায়নের মধ্যে বিরাট ফারাক (World Medical Association, 2017)। একদিকে রয়েছে চিকিৎসকদের নৈতিক শপথ, অন্যদিকে স্বল্প সময়ে অসংখ্য রোগী, অনুন্নত অবকাঠামো এবং নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার অভাব (World Health Organization, 2007)। এই ভূমিকা বাংলাদেশে চিকিৎসা নৈতিকতার সেই ত্রিমাত্রিক সংকটকে চিহ্নিত করতে চায়– তত্ত্বীয় নীতি (কান্ট, মিল, জেনেভার আদর্শ), সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ (ধর্ম, পারিবারিক কর্তব্য, সামাজিক প্রত্যাশা) এবং বাস্তবতার কঠিন ভূমি (অর্থনীতি, রাজনীতি, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা) (Mill, 1861)। এই ত্রিসন্ধি বিন্দুতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কীভাবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, নৈতিক ও মানবিক মডেলের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তা এই আলোচনার কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান (World Health Organization, 2007)।

২. চিকিৎসা নৈতিকতার দার্শনিক ভিত্তি:

২.১ ইমানুয়েল কান্টের নৈতিক দর্শন:

ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) তাঁর পরিণতি-মুক্ত নীতিবিদ্যা (Deontological Ethics) মাধ্যমে নৈতিকতার একটি যুক্তিসংগত, সর্বজনীন ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। কান্টের নৈতিকতা উদ্দেশ্য বা ফলাফলের উপর নয়; বরং কর্তব্যের (Duty) উপর ভিত্তিশীল (Kant, 1785)।

২.১.২ কান্টের তিনটি মৌলিক নীতির রূপায়ণ:

(১) সর্বজনীন আইনের সূত্র (Formula of Universal Law):

> "শুধু সেই সর্বোচ্চ নীতিমালা অনুযায়ী কাজ কর, যা দিয়ে তুমি একই সময়ে ইচ্ছা করতে পার যে, তা একটি সর্বজনীন আইনে পরিণত হোক।" (Groundwork of the Metaphysics of Morals, 1785)

চিকিৎসা নৈতিকতায় প্রয়োগ: "রোগীর গোপন তথ্য ফাঁস করব না" নীতি তখনই নৈতিক, যখন সকল চিকিৎসক সকল অবস্থায় এটি মেনে চলতে ইচ্ছুক হন।

মানবসত্তার সূত্র: "এমনভাবে কাজ কর যাতে তুমি মানুষত্বকে, তোমার নিজের ব্যক্তিত্বে বা অন্য কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে, কখনো কেবলমাত্র উপায় হিসাবে নয়, বরং সর্বদা একই সঙ্গে লক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার কর।" (Groundwork of the Metaphysics of Morals) ।

চিকিৎসা নৈতিকতায় প্রয়োগ: রোগীকে কখনো শুধু গবেষণার বিষয়, আয়ের উৎস বা পেশাদারি অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। রোগীর স্বায়ত্তশাসন (Autonomy), মর্যাদা এবং সম্মতি (Informed Consent) এর ধারণা এখান থেকে শক্ত ভিত্তি পায় (Beauchamp & Childress, 2019) ।

স্বায়ত্তশাসনের সূত্র: "প্রত্যেক যুক্তিসম্পন্ন সত্তার ইচ্ছাই সর্বজনীন আইন প্রতিষ্ঠার উৎস।" (Critique of Practical Reason, ১৭৮৮) (Kant, 1788)।

চিকিৎসা নৈতিকতায় প্রয়োগ: নীতিমালা বহিরাগতভাবে চাপিয়ে দেওয়া নয়; বরং চিকিৎসক ও রোগী উভয়ের যুক্তিসংগত স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে গৃহীত হওয়া উচিত (Beauchamp & Childress, 2019)।

২.১.৩ কান্টীয় নীতিবিদ্যার মূল ভিত্তি:

ভাল ইচ্ছা: কান্টের মতে, ভাল ইচ্ছাই একমাত্র চরমভাবে ভাল জিনিস। চিকিৎসকের কাজের নৈতিকতা নির্ভর করে তার উদ্দেশ্য ও কর্তব্যজ্ঞান এর উপর, চিকিৎসার ফলাফলের উপর নয় (Kant, 1785)।

হাইপোথেটিক্যাল বনাম ক্যাটাগরিক্যাল ইম্পারেটিভ:

হাইপোথেটিক্যাল ইম্পারেটিভ: "যদি তুমি সুস্থ থাকতে চাও, তাহলে ওষুধ খাও" (শর্তযুক্ত) ।

ক্যাটাগরিক্যাল ইম্পারেটিভ: "তোমার কর্তব্য পালন কর" (নিঃশর্ত, সর্বজনীন) ।

চিকিৎসা নীতি মূলত শেষোক্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত (Kant, 1785)।

২.১.৪ চিকিৎসা নৈতিকতায় সরাসরি প্রয়োগ:

রোগীর স্বায়ত্তশাসন: ইনফর্মড কনসেন্ট-এর ধারণাকে শক্ত ভিত্তি দেয় (Kant, 1785)।

সত্য বলা: মিথ্যা বলা রোগীর যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা খর্ব করে; তাই সত্য জানানো নৈতিক কর্তব্য (Kant, 1785)।

গোপনীয়তা রক্ষা: রোগীর মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসনের প্রতি সম্মান প্রকাশ কওে (Kant, 1785)।

ন্যায়বিচার: প্রত্যেক মানুষ সমান মর্যাদার অধিকারী; তাই বৈষম্যহীন চিকিৎসা সেবা অপরিহার্য ।

২.১.৫ কান্টীয় নীতিবিদ্যার সীমাবদ্ধতা:

নমনীয়তার অভাব: ট্রায়েজ বা সংস্থান বণ্টনের মতো জটিল পরিস্থিতিতে কঠোর নিয়ম মানা কঠিন (Beauchamp & Childress, 2019) ।

আবেগ ও করুণার স্থান কম: চিকিৎসায় সহানুভূতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও কান্টের যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গিতে তা তুলনামূলক কম গুরুত্ব পায় (Beauchamp & Childress, 2019) ।

২.১.৬ জেনেভা ঘোষণার সাথে কান্টীয় সঙ্গতি

জেনেভা ঘোষণা (২০১৭ সংশোধিত) এর বহু ধারা কান্টীয় নীতির প্রতিধ্বনি করে, যেমন রোগীর মর্যাদা, স্বায়ত্তশাসন ও গোপনীয়তা রক্ষা (World Medical Association, 2017) ।

২.১.৭ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাৎপর্য

বাংলাদেশে চিকিৎসা সম্পর্কের প্রায়ই পিতৃতান্ত্রিক চরিত্র থাকার কারণে কান্টের দর্শন রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সম্মতির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় শক্ত দার্শনিক ভিত্তি দেয়। তবে কান্টের সর্বজনীন নীতিকে স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ও ব্যবহারিক বাধার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করাই বাস্তব চ্যালেঞ্জ (Beauchamp & Childress, 2019) ।

২.২ চিকিৎসা নৈতিকতায় জন স্টুয়ার্ট মিলের উপযোগীতাবাদ

জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) জেরেমি বেনথামের উপযোগীতাবাদকে প্রসারিত ও পরিমার্জিত করেন। তাঁর প্রধান রচনা Utilitarianism (১৮৬১)-এ নৈতিকতার ফলাফলভিত্তিক কাঠামো উপস্থাপিত হয় (Mill, 1861) ।

২.২.২ মিলের মৌলিক নীতি

সর্বোচ্চ সুখের নীতি: "ক্রিয়াগুলি সঠিকতার অনুপাতে তারা সুখ উৎপাদনের প্রবণতা রাখে, ভুলের অনুপাতে তারা দুঃখ উৎপাদনের প্রবণতা রাখে।" (Mill, 1861)

পরিমার্জিত উপযোগীতাবাদ: "একজন অসন্তুষ্ট সক্রেটিসের চেয়ে একজন সন্তুষ্ট শূকর হওয়া ভাল..." (Mill, 1861)

২.২.৩ চিকিৎসা নৈতিকতায় মিলের নীতির প্রয়োগ

(১) সংস্থান বণ্টন (Resource Allocation):

লাভ-ক্ষতির বিশ্লেষণ (Cost-Benefit Analysis),জীবনমান-সমন্বিত জীবনবর্ষ (QALYs) এবং ট্রায়েজ প্রোটোকল (সীমিত সংস্থানের সর্বোত্তম ব্যবহার) (World Health Organization, 2007) ।

উদাহরণ: মহামারীতে ভেন্টিলেটর বরাদ্দে সর্বাধিক জীবন রক্ষার যুক্তি।

(২) গবেষণা নীতিতে প্রয়োগ: "নিয়ম ও বাধ্যবাধকতার শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ।" ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে সীমিত ঝুঁকি বনাম বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর লাভ। টিকা উন্নয়নে প্রাথমিক ঝুঁকি বনাম মহামারী নিয়ন্ত্রণের সুবিধা (World Health Organization, 2007) ।

(৩) ক্ষতিকর নীতি: "স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আত্মরক্ষা।"(Mill, 1859)

চিকিৎসায় প্রয়োগ: বাধ্যতামূলক টিকাদান, কোয়ারেন্টাইন, মানসিকভাবে অক্ষম রোগীর চিকিৎসা সিদ্ধান্ত ইত্যাদি।

(৪) স্বাস্থ্য নীতির প্রণয়ন: ধূমপান নিয়ন্ত্রণ, চিনিযুক্ত পানীয় কর ইত্যাদিতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণস্বাস্থ্যের ভারসাম্য।

২.২.৪ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা:

- জনসংখ্যা অনুপাতে সীমিত সংস্থানে সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করার প্রশ্ন ।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বনাম বিশেষায়িত সেবায় বিনিয়োগের নৈতিক-অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত ।
- টিকাদান কর্মসূচির মতো উদ্যোগে "সামান্য ঝুঁকি, ব্যাপক জনকল্যাণ" যুক্তি। (World Health Organization, 2007)

২.২.৫ সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতা:

অধিকারের উপেক্ষা: সামগ্রিক সুখের নামে ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার ঝুঁকি।

সংখ্যালঘুর ক্ষতি: বিরল রোগ বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী উপেক্ষিত হতে পারে ।

সুখ/কল্যাণ পরিমাপের জটিলতা: জীবন দৈর্ঘ্য, জীবনমান, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদির মধ্যে কোনটি প্রধান হবে তা অস্পষ্ট।

২.২.৬ কান্টীয় দর্শনের সাথে পার্থক্য

কান্ট: কর্তব্য ও নীতি-কেন্দ্রিক। মিল: ফলাফল ও সামাজিক কল্যাণ-কেন্দ্রিক।

কান্ট: নিঃশর্ত নীতি। মিল: পরিস্থিতিনির্ভর (শর্তযুক্ত) সিদ্ধান্ত।

কান্ট: ব্যক্তি মর্যাদা ও অধিকারকে অগ্রাধিকার। মিল: সামষ্টিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার।

কান্ট: উদ্দেশ্য/নীতির গুরুত্ব বেশি। মিল: ফলাফলের গুরুত্ব বেশি।

২.৩ জেনেভা ঘোষণা: মূলনীতি ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট:

২.৩.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

জেনেভা ঘোষণা (Geneva Declaration) বিশ্ব চিকিৎসা সমিতি (WMA) কর্তৃক ১৯৪৮ সালে গৃহীত হয়; ২০১৭ সালে সর্বশেষ সংশোধিত। এটি হিপোক্রেটিক শপথের আধুনিক রূপ। (World Medical Association, 2017)

২.৩.২ মূল নীতিসমূহ (২০১৭ সংশোধিত):

(১) মানবজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা।

(২) রোগীর স্বায়ত্তশাসন ও মর্যাদা ।

(৩) গোপনীয়তা রক্ষা (মৃত্যুর পরেও)।

(৪) পেশাদার মান ও সততা।

(৫) বৈষম্যহীন সেবা।

২.৩.৩ বাংলাদেশের বাস্তবতা ও উদাহরণ:

ইনফর্মড কনসেন্ট: আইন/নীতিতে থাকলেও বাস্তব প্রয়োগে ভিন্নতা।

গোপনীয়তা: ওয়ার্ড-ভিত্তিক সেবা, রেকর্ড নিরাপত্তা, সামাজিক মাধ্যমে তথ্য শেয়ারের ঝুঁকি।

পেশাদার সততা: রেফারেল কমিশন, অতিরিক্ত পরীক্ষা, ফার্মাসিউটিক্যাল প্রভাবের অভিযোগ।

বৈষম্য: শহর-গ্রাম, প্রান্তিক গোষ্ঠী, ভাষাগত/সাংস্কৃতিক বাধা।

২.৩.৪ বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ:

সংস্থান সীমাবদ্ধতা: ডাক্তার-রোগী অনুপাত, ওভার ক্রাউডিং।

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা: নৈতিক কমিটি ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি।

সাংস্কৃতিক প্রভাব: পরিবারকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত, ধর্মীয় বিশ্বাসের সংঘাত।

২.৩.৫ ইতিবাচক উদ্যোগ:

BMDC কোড অফ মেডিকেল এথিক্স ২০২০ (Bangladesh Medical and Dental Council, 2020) । জাতীয় বায়োথিক্স কমিটি (২০১০) (World Health Organization, 2007) । কিছু প্রতিষ্ঠানে ক্লিনিক্যাল এথিক্স কমিটি/ইথিকস ক্লিনিক চালুর উদ্যোগ।

৩. বাংলাদেশের চিকিৎসা নৈতিকতার সংকট: ত্রিস্তর বিশ্লেষণ

৩.১ নীতিগত স্তর: আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও স্থানীয় বাস্তবতার বিচ্ছিন্নতা:

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে নৈতিকতার নীতিগত ভিত্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক কাঠামো (জেনেভা ঘোষণা, বায়োএথিক্সের চার নীতি: Autonomy, Beneficence, Non-maleficence, Justice ইত্যাদি) এবং জাতীয় পর্যায়ে BMDC কোড, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ইত্যাদি বিদ্যমান (World Medical Association, 2017) । কাগজে-কলমে এসব নীতিমালা রোগীর মর্যাদা, সম্মতি, গোপনীয়তা, বৈষম্যহীন সেবা ও পেশাদার সততার নিশ্চয়তা দেয় (Ministry of Health and Family Welfare, 2011) । কিন্তু বাস্তব পর্যায়ে "নীতি আছে, প্রয়োগ নেই" ধরনের ফাঁক বারবার দেখা যায় । ইনফর্মড কনসেন্ট অনেক ক্ষেত্রে কেবল একটি ফর্মালিটি হয়ে দাঁড়ায়; রোগীকে ঝুঁকি, বিকল্প চিকিৎসা, খরচ, সম্ভাব্য ফলাফল ইত্যাদি বোঝানোর সুযোগ বা সময় থাকে না (Directorate General of Health Services, 2023) । একইভাবে গোপনীয়তা রক্ষার নীতি থাকলেও ওয়ার্ড-ভিত্তিক সেবা, রেকর্ড ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, এবং কখনও কখনও অননুমোদিতভাবে তথ্য শেয়ারের ঘটনা নীতিগত প্রতিশ্রুতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে (Beauchamp & Childress, 2019) । নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের এই ফারাকের কয়েকটি কাঠামোগত কারণ আছে:

জবাবদিহির দুর্বলতা: অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, তদন্ত, এবং শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া ধীর বা অকার্যকর হলে নৈতিক মানদণ্ড বাস্তবে কার্যকর হয় না ।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি: নৈতিকতা কমিটি, ক্লিনিক্যাল এথিক্স কনসাল্টেশন, SOP এবং প্রশিক্ষিত জনবল অনেক প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত বা দুর্বল ।

নীতির ভাষা বনাম মাঠ বাস্তবতা: আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনেক সময় স্থানীয় হাসপাতালের রোগীর চাপ, জনবল সংকট, এবং অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতার সাথে সরাসরি খাপ খায় না; ফলে নীতি "আদর্শ" থাকে, কিন্তু "কার্যকর নির্দেশনা" হয়ে উঠতে পারে না ।

তাই নীতিগত স্তরের সংকট মূলত দুটি বিষয়কে প্রকাশ করে:

(ক) নৈতিক মানদণ্ডকে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে রূপ দেওয়ার ঘাটতি, এবং

(খ) নৈতিক মানদণ্ড বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণ ও জবাবদিহির অভাব (Bangladesh Medical and Dental Council, 2020) ।

৩.২ মূল্যবোধ স্তর: স্বায়ত্তশাসন বনাম পরিবারকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত; ধর্ম-সংস্কৃতি-প্রথার প্রভাব

আন্তর্জাতিক চিকিৎসা নৈতিকতায় রোগীর স্বায়ত্তশাসন (Autonomy) কেন্দ্রীয় ধারণা; অর্থাৎ রোগী নিজের শরীর, চিকিৎসা, ঝুঁকি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাখে (Beauchamp & Childress, 2019) । কিন্তু বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো অনেক ক্ষেত্রে পরিবারকেন্দ্রিক ও সমষ্টিনির্ভর । ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে রোগীর "ব্যক্তিগত ইচ্ছা" এবং পরিবারের "সামষ্টিক কর্তব্য" একসাথে কাজ করে, এবং অনেক সময় সংঘাত তৈরি করে (World Health Organization, 2007) ।

এই মূল্যবোধগত দ্বন্দ্ব বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়:

পরিবারের কর্তৃত্ব: রোগীকে পুরো তথ্য না জানিয়ে পরিবার সিদ্ধান্ত নেয়, বিশেষ করে গুরুতর রোগ, ক্যান্সার বা মৃত্যুঝুঁকির ক্ষেত্রে ।

লিঙ্গভিত্তিক সিদ্ধান্ত: নারী রোগীর ক্ষেত্রে স্বামী/শ্বশুরবাড়ি/অভিভাবকের সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পেতে পারে, যা সম্মতি (consent) ধারণাকে দুর্বল করে ।

সম্মান-লজ্জা সংস্কৃতি: কিছু রোগ (মানসিক স্বাস্থ্য, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য) নিয়ে সামাজিক সংকোচ থাকায় রোগী খোলাখুলি কথা বলতে পারেন না; চিকিৎসকও পর্যাপ্ত ইতিহাস নিতে পারেন না । ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক প্রথাও নৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে । কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসা গ্রহণে বিলম্ব, বিকল্প চিকিৎসার প্রতি ঝোঁক, রক্তদান/রক্তগ্রহণ নিয়ে ভয়-ভ্রান্তি, অথবা "ভাগ্য/ঈশ্বর ইচ্ছা" ব্যাখ্যা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ধারাবাহিকতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে ।

মূল্যবোধ স্তরের সংকটের কেন্দ্রে আছে একটি বাস্তব প্রশ্ন: বাংলাদেশে নৈতিকতার "মডেল" কি সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হবে, নাকি পরিবার ও কমিউনিটিকে অন্তর্ভুক্ত করে "সমন্বিত সম্মতি" (shared decision-making) ধরনের কাঠামো গড়ে তুলতে হবে? এই প্রশ্নের উত্তর না খুঁজলে নীতি বাস্তবসম্মতভাবে কার্যকর হবে না।

৩.৩ বাস্তবিক স্তর: সীমিত সম্পদ, রোগীর চাপ, অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও বৈষম্য:

বাস্তবিক স্তরের সংকট সবচেয়ে দৃশ্যমান। জনসংখ্যার তুলনায় চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ান, শয্যা, ওষুধ, ডায়াগনস্টিক সুবিধা এবং জরুরি সেবার ঘাটতি নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সরাসরি প্রভাবিত করে। যখন একজন চিকিৎসককে খুব অল্প সময়ে অনেক রোগী দেখতে হয়, তখন "সম্মতি", "ব্যাখ্যা", "গোপনীয়তা" বা "সমতার ভিত্তিতে সেবা" আদর্শ মানা কঠিন হয়ে পড়ে।

বাস্তবিক সংকট সাধারণত চারটি রূপে দেখা যায়:

সময় সংকট ও যোগাযোগ ভাঙন: ব্যস্ততা ও দীর্ঘ লাইন রোগী-চিকিৎসক যোগাযোগ দুর্বল করে; ভুল বোঝাবুঝি, অসন্তোষ ও আস্থার সংকট বাড়ে।

অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা সমস্যা: ওয়ার্ডে অতিরিক্ত রোগী, পর্যাপ্ত পর্দা/প্রাইভেসি না থাকা, রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট দুর্বলতা গোপনীয়তা ও মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

শহর-গ্রাম বৈষম্য: শহরে বিশেষায়িত সেবা, ডায়াগনস্টিক ও চিকিৎসক সহজলভ্য হলেও গ্রামে তা সীমিত; ফলে ন্যায়বিচার (লঁংঃরপব) নীতির বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

অর্থনৈতিক বাধা: চিকিৎসা ব্যয় বহনের সক্ষমতা না থাকলে রোগী বাধ্য হয়ে চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে পারে বা নিম্নমানের সেবায় সীমাবদ্ধ থাকে; ফলে নৈতিকভাবে "সমান সুযোগ" নিশ্চিত করা কঠিন হয় (Ministry of Health and Family Welfare, 2011) । বাস্তবিক স্তরের সংকট শুধু অভাবের গল্প নয়; এটি নৈতিকতার জন্য এক ধরনের "চাপের কাঠামো" তৈরি করে। সীমিত সম্পদে কোন রোগী আগে সেবা পাবে, কোন চিকিৎসা জরুরি, কোন ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল চিকিৎসা ন্যায্য, এবং কখন রোগীর পরিবারকে আর্থিক ধাক্কা থেকে রক্ষা করা উচিত, এগুলো প্রতিদিনের নৈতিক দ্বিধা তৈরি কওে (Ministry of Health and Family Welfare, 2011) । তাই বাস্তবিক স্তরের সংকট মূলত বলে: নৈতিকতা কেবল "নীতিবাক্য" নয়; এটি টিকে থাকে তখনই, যখন সেবার কাঠামো, জনবল, সময়, অবকাঠামো, এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষা ন্যূনতমভাবে সহায়ক থাকে (Bangladesh Medical and Dental Council, 2020)।

৩.৪ ত্রিস্তর সংকটের পারস্পরিক সম্পর্ক:

নীতিগত ঘাটতি (প্রয়োগ দুর্বল) মূল্যবোধগত দ্বন্দ্বকে আরও জটিল করে, আর বাস্তবিক সংকট নীতিকে "অকার্যকর আদর্শে" পরিণত কওে [৫] । ফলে বাংলাদেশের চিকিৎসা নৈতিকতার সংকটকে এক স্তরে সমাধান করা সম্ভব নয়; নীতি, মূল্যবোধ এবং বাস্তবতার তিন স্তরকে একসাথে ধরে সমন্বিত সমাধান কাঠামো তৈরি করাই কার্যকর পথ (World Medical Association, 2017) ।

৪. বাংলাদেশের চিকিৎসা নৈতিকতার সংকট: সমাধানের পথ

বাংলাদেশে চিকিৎসা নৈতিকতার সংকটকে কেবল "চিকিৎসকদের আচরণগত সমস্যা" হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি মূলত একটি কাঠামোগত সংকট, যেখানে আইন-কানুন, প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা একে অন্যকে প্রভাবিত করে। তাই সমাধানও হতে হবে বহুমুখী এবং স্তরভিত্তিক। নিচে একটি প্রবন্ধধর্মী কাঠামোতে সমাধানের পথগুলো তুলে ধরা হলো।

৪.১ প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সংস্কার:

৪.১.১ শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক কাঠামো: নৈতিকতা বাস্তবায়নের প্রথম শর্ত হলো কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহি। বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল (BMDC) নীতিগতভাবে এ কাজের কেন্দ্রে থাকলেও এর সক্ষমতা, স্বচ্ছতা এবং প্রয়োগক্ষমতা আরও শক্তিশালী করা জরুরি (Bangladesh Medical and Dental Council, 2020) ।

প্রথমত, BMDC-কে এমনভাবে শক্তিশালী করতে হবে যাতে তারা নিয়মিত অডিট, অভিযোগ তদন্ত, দ্রুত সিদ্ধান্ত, এবং কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে । দ্বিতীয়ত, নৈতিকতা বিষয়ক সিদ্ধান্ত ও গাইডলাইন তৈরির জন্য একটি জাতীয় বায়োথিক্স কর্তৃপক্ষ বা সমন্বয় কাঠামো প্রয়োজন, যেখানে চিকিৎসক, নীতি-নির্ধারক, আইনবিদ, সমাজবিজ্ঞানী এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা একসাথে কাজ করবেন। তৃতীয়ত, প্রতিটি বড় হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে হাসপাতালভিত্তিক নৈতিকতা কমিটি বাধ্যতামূলক করা দরকার, যাতে জটিল কেসে (ট্রায়েজ, লাইফ সাপোর্ট, জটিল সম্মতি, শিশু/মানসিক রোগী) দ্রুত নৈতিক পরামর্শ পাওয়া যায় এবং সিদ্ধান্ত একক ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল না থাকে।

৪.১.২ আইনি কাঠামো আধুনিকীকরণঃ

নীতিমালা থাকলে হবে না, তার জন্য আইনগত ভিত্তিও শক্ত হতে হবে। চিকিৎসা নৈতিকতা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কোন কাজ অপরাধ, কোনটি পেশাদার অসদাচরণ, কোনটি প্রশাসনিক ত্রুটি, এবং কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের শাস্তি প্রযোজ্য, এসব বিষয়ে পরিষ্কার আইন বা বিধিমালা দরকার। একই সঙ্গে রোগীর অধিকার আইন একটি কেন্দ্রীয় পদক্ষেপ হতে পারে। এই আইনে কয়েকটি মৌলিক অধিকার সুস্পষ্টভাবে থাকতে হবে:

- রোগ নির্ণয়, ঝুঁকি, বিকল্প চিকিৎসা ও খরচ সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকার ।
- প্রয়োজন হলে দ্বিতীয় মতামত নেওয়ার অধিকার ।
- সম্মতিপত্রের মানসম্মত ফরমেট এবং কীভাবে সম্মতি নেওয়া হবে তার ন্যূনতম নির্দেশনা ।
- অভিযোগ দাখিলের সহজ, স্বচ্ছ ও দ্রুত প্রক্রিয়া (হাসপাতাল এবং জাতীয় পর্যায় উভয় স্তরে)

আইন যখন রোগীর অধিকারকে দৃশ্যমান করে, তখন নৈতিকতা "ভালো কাজ" থেকে "কর্তব্য" হয়ে ওঠে।

৪.২ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পুনর্গঠনঃ

৪.২.১ পাঠ্যক্রম উন্নয়নঃ

নৈতিকতা শেখা শুধু বই পড়ে হয় না; এটি পরিস্থিতি, কেস, এবং বাস্তব সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। তাই MBBS পর্যায়ে ক্লিনিক্যাল এথিক্স বাধ্যতামূলক কোর্স হওয়া জরুরি, যেখানে কনসেন্ট, গোপনীয়তা, ট্রায়েজ, শিশু-রোগী, মানসিক স্বাস্থ্য, গবেষণা নৈতিকতা, এবং চিকিৎসক-রোগী যোগাযোগকে বাস্তব উদাহরণে শেখানো হবে। ইন্টার্নশিপ পর্যায়ে নৈতিকতা রোটেশন বা নৈতিকতা-ভিত্তিক সুপারভিশন যুক্ত করা গেলে নতুন চিকিৎসকরা প্রাথমিক থেকেই নৈতিক সিদ্ধান্তে অভ্যস্ত হবে। পাশাপাশি, বাংলাদেশ-ভিত্তিক কেস স্টাডি না থাকলে শিক্ষার্থীরা নৈতিকতার আদর্শ শিখবে, কিন্তু স্থানীয় বাস্তবতায় প্রয়োগ করতে পারবে না। তাই পাঠ্যক্রমে দেশীয় কেস স্টাডি থাকা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

৪.২.২ ধারাবাহিক পেশাদার উন্নয়নঃ

নৈতিকতা চর্চা জীবনের শুরুতে শেখে শেষ হয় না। তাই লাইসেন্স বা রিনিউয়ালের সাথে বাধ্যতামূলক নৈতিকতা প্রশিক্ষণ যুক্ত করা যেতে পারে। হাসপাতালগুলোতে নিয়মিত এথিক্স গ্র্যান্ড রাউন্ড চালু করা দরকার, যেখানে বাস্তব কেস আলোচনা হবে এবং দলগতভাবে সিদ্ধান্তের মান উন্নত হবে। অনেকের জন্য উপস্থিত প্রশিক্ষণ সম্ভব নয়, তাই অনলাইন সার্টিফিকেশন/মডিউল (বাংলা ভাষায়) চালু করলে প্রশিক্ষণের বিস্তার এবং মান দুটোই বাড়বে।

৪.৩ সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অভিযোজনঃ

৪.৩.১ স্থানীয়কৃত নৈতিকতা নির্দেশিকাঃ

বাংলাদেশের সমাজে রোগী একা নয়; তার সাথে পরিবার, সামাজিক কর্তব্য, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং "সম্মান-লজ্জা" সংস্কৃতি জড়িত। তাই নৈতিকতার আদর্শকে সরাসরি কপি-পেস্ট করলে অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবে কাজ করবে না। প্রয়োজন স্থানীয়কৃত নৈতিকতা নির্দেশিকা, যেখানে রোগীর অধিকার অক্ষুণ্ন রেখে পরিবারকে কীভাবে যুক্ত করা যায়, তার একটি বাস্তব সম্মত মডেল থাকবে। এখানে "ব্যক্তি ও পারিবারিক সম্মতির সমন্বিত মডেল" (shared decision-making) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গুরুতর সিদ্ধান্তে পরিবার যুক্ত হতে পারে, কিন্তু রোগীর অধিকার ও সম্মতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ন্যূনতম নিয়ম পরিষ্কার থাকবে। ধর্মীয় নেতা ও কমিউনিটি স্টেকহোল্ডারদের যুক্ত করা দরকার, কারণ বহু সিদ্ধান্তে

ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রভাব ফেলে (রক্তদান, অঙ্গদান, জীবন-মৃত্যু সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ইত্যাদি)। একই সঙ্গে বাংলা ও স্থানীয় ভাষায় (চাকমা, গারো ইত্যাদি) নৈতিকতা ও রোগীর অধিকার সংক্রান্ত উপকরণ তৈরি না করলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী মূলধারা থেকে বাইরে থেকেই যাবে (Beauchamp & Childress, 2019) ।

৪.৩.২ সম্প্রদায়ভিত্তিক পদ্ধতি:

নৈতিকতা কেবল হাসপাতালের ভেতরের বিষয় নয়। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নৈতিকতা চর্চা জোরদার করা, কমিউনিটিতে সচেতনতা সভা, এবং স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে আলোচনা চালু করা দরকার। নারী স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য নৈতিকতা প্রশিক্ষণ বিশেষ জরুরি, কারণ তারা পরিবার ও কমিউনিটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন এবং নারী রোগীদের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা, সম্মতি এবং নিরাপত্তার প্রশ্ন বেশি সংবেদনশীল।

৪.৪ প্রযুক্তি ও তথ্য ব্যবস্থাপনা:

৪.৪.১ ডিজিটাল সমাধান:

চিকিৎসা সেবা এখন দ্রুত ডিজিটাল হচ্ছে। তাই জাতীয় ই-হেলথ নৈতিকতা গাইড লাইন দরকার, যেখানে টেলিমেডিসিন, ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন, ডেটা শেয়ারিং এবং অনলাইন পরামর্শের নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারিত থাকবে। রোগীর অধিকার ও অভিযোগ ব্যবস্থার জন্য একটি পোর্টাল/অ্যাপ থাকলে মানুষ সহজে তথ্য পাবে, ন্যায্য অভিযোগ করতে পারবে, এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর স্বচ্ছতার চাপ তৈরি হবে। পাশাপাশি সম্মতিপত্রের জন্য ডিজিটাল স্ট্যান্ডার্ড টেমপ্লেট থাকলে হাসপাতালভেদে বিশৃঙ্খলা কমবে।

৪.৪.২ তথ্য সুরক্ষা

ডিজিটাল ব্যবস্থার সাথে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি ডেটা লিক। তাই কাগজ ব্যবস্থায় গোপনীয়তা ও অ্যাক্সেস কন্ট্রোল বাধ্যতামূলক করা দরকার। কে কোন তথ্য দেখবে, কখন দেখবে, কোন পরিস্থিতিতে শেয়ার করা যাবে, এসব বিষয়ে ডেটা শেয়ারিং প্রোটোকল থাকতে হবে। একই সঙ্গে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যখাতে সাইবার নিরাপত্তার ন্যূনতম নির্দেশিকা না থাকলে গোপনীয়তা রক্ষার নৈতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবে টিকবে না।

৪.৫ অর্থনৈতিক ও সংস্থান বণ্টন ন্যায্যতা:

৪.৫.১ স্বাস্থ্য অর্থনীতি পুনর্গঠন:

নৈতিকতা অনেক সময় টিকে থাকে আর্থিক সুরক্ষার ওপর। রোগী যদি চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে না পারে, তাহলে "সমান সুযোগ" কেবল কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাই সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা সম্প্রসারণ, সরকারি বাজেট বৃদ্ধি, এবং সরকারি সেবার মান উন্নয়ন নৈতিকতার ভিত্তিকে শক্ত করবে। প্রাইভেট সেক্টরে স্বচ্ছতা ও নিয়ন্ত্রণ জরুরি, কারণ সেখানে অতিরিক্ত পরীক্ষা, অপ্রয়োজনীয় ভর্তি, এবং কমিশন-নির্ভর ব্যবস্থার অভিযোগ নৈতিক আস্থাকে ভেঙে দেয়। ন্যূনতম মূল্য-স্বচ্ছতা, বিলিং স্ট্যান্ডার্ড, এবং রোগী তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

৪.৫.২ সংস্থান বণ্টনের নীতিমালা:

সীমিত সম্পদে কার আগে চিকিৎসা হবে, কোন সেবা "অগ্রাধিকার" পাবে, এবং জরুরি অবস্থায় কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এসব বিষয়ে জাতীয় ট্রায়েজ/প্রায়োরিটি গাইডলাইন দরকার। বিরল রোগীদের জন্য সহায়তা তহবিল থাকলে উপযোগীতাবাদী "সর্বাধিক কল্যাণ" নীতির পাশাপাশি ন্যায়বিচারও নিশ্চিত করা সহজ হবে। আর স্বাস্থ্যকর্মী বণ্টনে গ্রাম-শহর ভারসাম্য না আনলে বৈষম্য কমবে না, এবং নৈতিকতার "সমতা" নীতি বাস্তবায়িত হবে না।

৫. বাস্তবায়ন কৌশল:

প্রথম পর্যায় (১-২ বছর): দ্রুত ভিত্তি শক্ত করা

- মেডিকেল কলেজগুলোতে বায়োথিক্স ইউনিট/বিভাগ শক্তিশালী করা (ফোকাল পারসন, নিয়মিত কেস ডিসকাশন, স্ট্যান্ডার্ড মডিউল)।
- জাতীয় নৈতিকতা হেল্পলাইন/গাইডলাইন চালু করা (কনসেন্ট, গোপনীয়তা, ট্রায়েজ, শিশু/মানসিক রোগী সংক্রান্ত দ্রুত সহায়তা)।

- BMDC কোডের বাধ্যতামূলক ওয়ার্কশপ চালু করা (লাইসেন্স/রিনিউয়াল-সংযুক্ত, হাসপাতালভিত্তিক বাস্তব কেস অনুশীলন)।

দ্বিতীয় পর্যায় (৩-৫ বছর): কাঠামোগত বিস্তার ও আইন কার্যকর

- জেলা পর্যায়ে নৈতিকতা কমিটি গঠন ও কার্যকর করা (রেফারেল কেস রিভিউ, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, কনসাল্টেশন সাপোর্ট)।
- রোগী অধিকার আইন/প্রক্রিয়া কার্যকর করা (অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা, কনসেন্ট স্ট্যান্ডার্ড, তথ্য জানার অধিকার)।
- হাসপাতাল র‍্যাঙ্কিংয়ে নৈতিকতা সূচক যুক্ত করা (কনসেন্ট অডিট, গোপনীয়তা কমপ্লায়েন্স, রোগী সন্তুষ্টি, অভিযোগ রেজোলিউশন)।

তৃতীয় পর্যায় (৫-১০ বছর): দীর্ঘমেয়াদি সংস্কৃতি-রূপান্তর

- স্কুল পর্যায়ে নৈতিকতা শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ (স্বাস্থ্য অধিকার, দায়িত্ব, প্রাইভেসি সচেতনতা)।
- গণমাধ্যম ও কমিউনিটিতে স্বাস্থ্য নৈতিকতা প্রচার (রোগীর অধিকার, ভুয়া চিকিৎসা/ভ্রান্তি প্রতিরোধ, সচেতন সম্মতি)।
- দীর্ঘমেয়াদি সংস্কৃতি-রূপান্তর কর্মসূচি (কমিউনিটি স্টেকহোল্ডার ও ধর্মীয় নেতাদের অংশগ্রহণ, শেয়ার্ড ডিসিশন-মেকিং চর্চা)।

৬. পরিমাপযোগ্য সাফল্যের নির্দেশক:

চিকিৎসা নৈতিকতার উন্নয়ন শুধু নীতিমালা লেখা বা এক-দু'বার প্রশিক্ষণ আয়োজনের মধ্যে সীমিত থাকলে টেকসই ফল আসে না। বাস্তবে পরিবর্তন হচ্ছে কি না ধরতে হলে কিছু স্পষ্ট ও পরিমাপযোগ্য নির্দেশক দরকার। এই নির্দেশকগুলো তিন স্তরে দেখা যায়: প্রাতিষ্ঠানিক, শিক্ষাগত এবং সামাজিক।

৬.১ প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশক:

প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য মানে হলো হাসপাতাল ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান নৈতিকতা বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত কাঠামো তৈরি করেছে এবং তা কার্যকরভাবে চালাচ্ছে। প্রথম নির্দেশক: অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে কার্যকর নৈতিকতা কমিটি আছে কি না। এখানে "কার্যকর" বলতে কমিটির নাম থাকাই যথেষ্ট নয়; নিয়মিত সভা, কেস রিভিউ, সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করা, এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত নৈতিক পরামর্শ দেওয়ার সক্ষমতা বোঝায়। কমিটি বছরে একবারও না বসলে বা কোনো কেস হ্যান্ডেল না করলে তা বাস্তব পরিবর্তনের নির্দেশক হবে না।

দ্বিতীয় নির্দেশক হলো ইনফর্মড কনসেন্ট ও গোপনীয়তা নীতির মানসম্মত প্রয়োগ কতটা বেড়েছে। এটি মাপা যাবে কয়েকটি দিক দিয়ে:

- রোগীকে ঝুঁকি, বিকল্প চিকিৎসা, সম্ভাব্য ফলাফল ও খরচ জানানো হচ্ছে কি না।
- সম্মতিপত্র রোগীবান্ধব কি না (বাংলা/সহজ ভাষা)।
- রেকর্ডে সম্মতির ডকুমেন্টেশন নিয়মিত হচ্ছে কি না।
- রোগীর তথ্য অ্যাক্সেস কন্ট্রোল ও রেকর্ড নিরাপত্তা মানা হচ্ছে কি না।

এসব নির্দেশক বাস্তবে মাপার জন্য অডিট, নমুনা কেস রিভিউ এবং হাসপাতালভিত্তিক রিপোর্টিং ব্যবস্থা থাকা জরুরি।

৬.২ শিক্ষাগত নির্দেশক:

নৈতিকতা টেকসই করতে হলে নতুন প্রজন্মের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা তৈরি করতে হবে। তাই শিক্ষাগত সাফল্যের প্রথম নির্দেশক হলো মেডিকেল শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা সার্টিফিকেশন/মূল্যায়ন। এখানে শুধু থিওরি পরীক্ষা নয়; কেস-ভিত্তিক মূল্যায়ন বেশি অর্থবহ। যেমন:

- রোগীর সম্মতি নেওয়ার সঠিক পদ্ধতি।
- খারাপ খবর জানানোর নৈতিক ও মানবিক পদ্ধতি।
- শিশু/মানসিক রোগী/জরুরি কেসে সিদ্ধান্তের কাঠামো।
- গোপনীয়তা বনাম জনস্বার্থের দ্বন্দ্বে সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় শিক্ষাগত নির্দেশক হলো প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মীর প্রশিক্ষণ। তবে সংখ্যার পাশাপাশি মানও জরুরি। তাই দেখা উচিত:

- কারা প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন (ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান, প্রশাসনিক স্টাফ)।
- প্রশিক্ষণ শেষে আচরণগত পরিবর্তন বা সেবার মান উন্নয়নের প্রমাণ আছে কি না।
- রিফ্রেশার কোর্স বা ধারাবাহিক শেখার সুযোগ আছে কি না।

৬.৩ সামাজিক নির্দেশক:

নৈতিকতা নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো রোগী ও সমাজ কি স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর আস্থা পাচ্ছে? সামাজিক নির্দেশকগুলো এই আস্থা ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তন ধরতে সাহায্য করে। প্রথম নির্দেশক রোগী সন্তুষ্টি সূচক উন্নয়ন। এখানে "ভালো ব্যবহার" ছাড়াও অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- চিকিৎসার তথ্য পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে কি না।
- সম্মতির প্রক্রিয়া সম্মানজনক ছিল কি না।
- গোপনীয়তা বজায় ছিল কি না।
- অযথা হয়রানি, দেরি বা অতিরিক্ত খরচের অভিজ্ঞতা কমেছে কি না।

দ্বিতীয় নির্দেশক চিকিৎসক-রোগী আস্থা বৃদ্ধি। এটি বোঝা যায় নিয়মিত ফলোআপ, চিকিৎসা পরিকল্পনা মেনে চলা, এবং হাসপাতাল/চিকিৎসক সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা বৃদ্ধির মাধ্যমে। আস্থা বাড়লে সহিংসতা, দ্বন্দ্ব, ভুল বোঝাবুঝি ও মামলার ঝুঁকিও কমতে পারে।

তৃতীয় নির্দেশক নৈতিক লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ হ্রাস। তবে এখানে সতর্ক থাকা দরকার: অভিযোগ কমা সবসময় উন্নয়ন বোঝায় না, কখনও অভিযোগ করার সুযোগ/সহজতা না থাকলেও অভিযোগ কমে। তাই একসাথে দেখতে হবে:

- অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা কতটা সহজ হয়েছে।
- অভিযোগ নিষ্পত্তির গতি ও স্বচ্ছতা বেড়েছে কি না।

এই দুটো উন্নত হওয়ার পরও অভিযোগ কমতে থাকলে সেটিকে নৈতিক উন্নয়নের শক্ত প্রমাণ হিসেবে ধরা যায়।

উপসংহার:

বাংলাদেশের চিকিৎসা নৈতিকতার সংকট মূলত তিনটি অভিমুখে বিস্তৃত একটি জটিল সমস্যাপুঞ্জ: প্রথমত, নীতিগত স্তরে আমরা দেখি সার্বজনীন চিকিৎসা নীতিশাস্ত্রের (কান্টের কর্তব্যবাদ, মিলের উপযোগবাদ, জেনেভা ঘোষণার মানবিক আদর্শ) সাথে স্থানীয় আইনি-প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিচ্ছিন্নতা। বাংলাদেশে চিকিৎসা নীতির বিদ্যমান আইনি কাঠামো (BMDC কোড, মেডিকেল অ্যাক্ট) আন্তর্জাতিক মানের প্রতিফলন হলেও, এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে বিশাল ফারাক রয়েছে। দ্বিতীয়ত, মূল্যবোধের স্তরে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব যেখানে পাশ্চাত্য চিকিৎসা নীতির ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসনের ধারণা মুখোমুখি হয় বাংলাদেশের সমাজের সামষ্টিক, পরিবার কেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার। ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও পারিবারিক কাঠামো চিকিৎসা সিদ্ধান্তে এমন প্রভাব রাখে, যা অনেকক্ষেত্রে পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক।

তৃতীয়ত, বাস্তবতার কঠিন ভূমিতে স্বাস্থ্যসেবার সীমিত সম্পদ, জনসংখ্যার চাপ, শহর-গ্রাম বৈষম্য, এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা নৈতিক নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করে। একজন আদর্শবাদী চিকিৎসক যখন ৫ মিনিটে একজন রোগী দেখতে বাধ্য হন, তখন ইনফর্মড কনসেন্ট বা গোপনীয়তা রক্ষার আদর্শিক বাধ্যবাধকতা বাস্তবতার কাছে পরাভূত হয়। বাংলাদেশের জন্য চিকিৎসা নৈতিকতার প্রকৃত পরীক্ষা হবে জটিলতা মোকাবেলার ক্ষমতায়, নয় সরল সমাধানের প্রাপ্তিতে। প্রয়োজন নৈতিকতার "বাংলাদেশী মডেল" তৈরির সাহস, যা ক্যান্ট, মিল ও জেনেভার আদর্শকে বাংলার মাটি ও মানুষের সাথে খাপ খাইয়ে নেবে। চিকিৎসা নৈতিকতার এই সংকট তাই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সংকটেরই অংশ, যে সংকটের মাঝেই নিহিত আছে আমাদের নিজস্ব পথ খুঁজে নেওয়ার সম্ভাবনা। সাফল্য নির্ভর করবে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রজ্ঞা, নৈতিক সাহস ও সৃজনশীল অভিযোজনের উপর।

References:

১. Kant, I. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Riga, Latvia: Johann Friedrich Hartknoch, 1785.
২. I. Kant, *Critique of Practical Reason*. Riga, Latvia: Johann Friedrich Hartknoch, 1788.
৩. Mill, J. S. *On Liberty*. London, U.K.: John W. Parker and Son, 1859.
৪. Mill, J. S. *Utilitarianism*. London, U.K.: Parker, Son, and Bourn, 1861.
৫. World Medical Association, "WMA Declaration of Geneva," adopted 1948, last revised 2017. Geneva, Switzerland: World Medical Association.
৬. Bangladesh Medical and Dental Council (BMDC), *Code of Medical Ethics*. Dhaka, Bangladesh: BMDC, 2020.
৭. Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), Government of the People's Republic of Bangladesh, *National Health Policy 2011*. Dhaka, Bangladesh: MoHFW, 2011.
৮. Directorate General of Health Services (DGHS), Ministry of Health and Family Welfare, *Bangladesh Health Bulletin 2023*. Dhaka, Bangladesh: DGHS, 2023.
৯. T. L. Beauchamp and J. F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, 8th ed. New York, NY, USA: Oxford University Press, 2019.
১০. World Health Organization, *Everybody's Business: Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes – WHO's Framework for Action*. Geneva, Switzerland: WHO, 2007.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 624-636
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.252

নারী মনস্তত্ত্বের আলোকে ‘মেয়েলি সংলাপ’

ড. পৌলোমী রায়, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বজবজ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The book ‘Meyeli Sanglap’ by Sutapa Bhattacharya, written in the style of chat-diary and storytelling(2005), is an original experience of women’s empowerment and the expression of women’s own voices. In this book, beyond the pattern of conventional language, the author have deliberated women’s issues- the world of discussion, dialogue - conversation, poetry - songs and contemporary events. This book is not just human, but also a guide of humanistic thought and shows the way for women liberation. In the fictional gathering of friends named ‘Sakhi-Sanglap’(Friendship conversation), very subtly, an inspired message to society is presented through women’s discussions. The writer has created a fictional gathering called ‘Bandhusabha’ with the new inauguration of ‘Sakhi-sanglap’. In this gathering, the writer has placed various fictional female characters in the forefront, and the analysis of those writings is done in other’s voice. In this framework, human life and humanistic life are discussed. Here some important topics that have emerged are women’s bondage, marriage, family, independence, abortion, culture, politics, social politics, sexual freedom, religion, education-skills, laws- regulations related with women empowerment and various aspects of artistic expression. To show the voice of women, the writer sets the examples from various fields of literature and real facts. As a responsible citizen, she claims justice to save the legacy & heritage of independent women and their voice of love. The final refuge of this discussion is Rabindranath Tagore. In this tradition ‘Meyeli Sanglap’ is not just about women’s word or dialogue, it rises from being bound to a humanistic conversation.

Keywords: women empowerment, women freedom, cultural politics, Legacy, Humanistic attitude

আড্ডা-ডায়েরি ও কথোপকথনের ঢঙে লেখা সুতপা ভট্টাচার্যের ‘মেয়েলি সংলাপ’ (২০০৫) নারীমনস্তত্ত্ব ও নারীর নিজস্ব ভুবন উন্মোচনের এক অভিনব অভিজ্ঞান। প্রচলিত আঙ্গিকের বাইরে নারী সমস্যা সম্বলিত আলোচনার জগৎ, সংলাপ-সঞ্চরণ, কবিতা-গান-হাল আমলের ঘটনাবলি নিয়ে এই বইটি শুধু মানবী নয়, মানবিক চিন্তারও পথপ্রদর্শক। কল্পনির্ভর সখীদের সভায় বিন্যস্ত মেয়েলি আলোচনায় খুব সাবলীলভাবেই পরিবেশিত হয়েছে সমাজের প্রতি প্রেরিত জরুরি বার্তা। মনীষা ও অহনার উদ্যোগে লেখিকার বাড়িতে নানান গুণীজনদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল ‘বন্ধু সভা’, তারই নব রূপায়ণ ‘সখী সংলাপ’ নামে একটি সভা কল্পনা করে নিয়ে লেখিকা নিজেরই ভাবনার বিন্যাস বসিয়েছেন নানা কাল্পনিক নারী চরিত্রের মুখে, আবার সেসব লেখার সমালোচনাও করেছেন অন্যের জবানিতে। তাঁর কাল্পনিক চরিত্রগুলির মধ্যে কোনো পুরুষ চরিত্র না থাকার

কারণ হিসাবে নিজের অক্ষমতাকে দায়ী করার পাশাপাশি তিনি 'বন্ধুসভা'য় উপস্থিত তাঁর উল্লেখযোগ্য পুরুষ-বন্ধু— শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, ভূমেন গুহ, জয় গোস্বামী প্রমুখর উদ্যোগী অংশগ্রহণকে সাদরে সম্ভাষণ জানিয়েছেন। বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে ১৪ টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত সমগ্র বইটি মানবী জীবনাশ্রিত বৃহত্তর সামাজিক জীবনকেও আলোকিত করে।

শব্দ ব্রহ্ম, কথোপকথন বা সংলাপ দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান হতে পারে। তাই দেখা যায় কথোপকথন, উক্তি-প্রত্যুক্তি, আড্ডা, সমালোচনা-পর্যালোচনা; নিজস্ব যুক্তি জাল বিস্তারের মাধ্যমে সুতপা ভট্টাচার্য তাত্ত্বিকভাবে ফেমিনিজমের বেড়াজাল টপকে নিজস্ব ঘরানায় নারীর সমস্যা ও সমাধানের নানান দিককে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এই মাধ্যমেই এসেছে সমাজ জিজ্ঞাসা ও সামাজিক কাঠামো সমন্বিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়— মেয়েদের বন্ধুত্ব, বিবাহ, পরিবার, স্বাধীনতা, যৌনমুক্তি, ভ্রূণহত্যা, অ্যাবরশন, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষা-শিল্প, ভাবনার বিন্যাসক্রম প্রভৃতি নানান দিক এবং এই আলোচনার শেষ আশ্রয় হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। মল্লিকা সেনগুপ্ত-ও তাঁর 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ' গ্রন্থে নারী সমস্যা সমন্বিত সামাজিক সমস্যার দিকগুলিকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সুতপা ভট্টাচার্য বিষয়ের গাম্ভীর্যের দিকটিকে গুরুত্ব দিয়ে তা যাতে কেজো কথার ঘেরাটোপে আটকে না থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছে সমানভাবে সমাদৃত হয়, সেই দিকটির প্রতি জোর দিয়েছেন। তিনি জানেন ও জানাতে চান সমাজের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা নারী অবমাননার মতো একটি গভীর বিষয়কে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, বিরূপতা সহ্য করেই লিখতে হয় মেয়েদের। তাদের যে কোনো সৃষ্টিশীল রচনা বিশেষত কবিতা লেখার সামনে থাকে দ্বিবিধ-প্রতিবন্ধকতা— তার নিজস্ব আবেগ অনুভবের ভাষা সে পুরুষ রচিত ভাষার পরম্পরার মধ্যে খুঁজে পায় না, আর তার ঐকাত্ম্য-অর্জনের প্রয়াসের বিরোধিতা করে পুরুষ পোষিত সমাজ। এইসব প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে লিখতে হয় মেয়েদের। তার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।[১] লেখিকা সুতপা ভট্টাচার্য এই প্রস্তুতির ক্রমেই মেয়েলি সংলাপ গ্রন্থটি নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নিয়েছেন বন্ধুতার নীতি।

প্রথম অধ্যায় 'পরিবার বিষয়ে একটি মেয়েলি দ্বিরালাপ', যেখানে প্রধানত এসেছে একান্নবর্তী পরিবারের প্রসঙ্গ, তুলি ও ঋতুর কথোপকথন এবং ঋতদীপার ডায়েরির মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে আরও একাধিক প্রসঙ্গ। পুরুষতন্ত্র ও ক্ষমতায়ণ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়। ঋতু বোঝাতে চায় 'সুখী পরিবারের সুখী বউ' হবার ইচ্ছেটা তৈরি হয়েছে পুরুষতন্ত্রেরই শিক্ষায়। পুরুষতন্ত্র তো এইটেই চায়, মেয়েরা সুখী বউ হয়ে খুশি থাকুক।[২] তথাকথিত পুরুষ নিয়ন্ত্রিত এই তন্ত্রের অংশীদার আবার চূড়ান্ত রক্ষণশীল নারী সমাজও। তবে নারীর জীবনকে সুখী তকমা দিয়ে তাকে গৃহবন্দি করে রাখার মানসিকতা থেকেই তাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে রাখার বাসনা। এর পশ্চাতে অবশ্য অর্থনীতিও ভীষণভাবে জড়িত। সাধারণভাবে মেয়েদের জীবনব্যাপী বা গড়পরতা আয় পুরুষের তুলনায় কম, কারণ হিসাবে অর্থনীতিবিদ গ্যারি বেকার মনে করেন মেয়েরা মানবিক মূলধনে বিনিয়োগ কম করেন এবং তাদের জৈবিক অক্ষমতা এর জন্য দায়ী। তাই বাজারের চাহিদা ও জোগানের সূত্র অনুযায়ী তাঁরা কম মানবিক মূলধনের জন্য কম উৎপাদনশীল বলে কম মজুরি পাবেন, সুতরাং একজন সাধারণ মেয়ের বিবাহেই বেশি সুবিধা। আর স্বামীর আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তুলনামূলক সুবিধা আরও বাড়ে। বিপরীতে, অ-সাধারণ কোনও নারীর পুরুষের অভাব হবে না এবং তাঁর বিবাহে তুলনামূলক সুবিধা কমও হতে পারে।[৩] মূলত আর্থিক বৈষম্যের কারণে অধিকারবোধের ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে, মানবিক দিকটি লঘু হয়ে যায়। আলোচ্য অধ্যায় অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিলীপ রায়কে বলা কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— "স্ত্রীকে স্থূল বস্তুর মতো পেয়েছি মনে করা অপরিসীম মূঢ়তা, আসলে মানুষকে দখল না করলে, তবেই তাকে লাভ করা সম্ভব।"[৪] কিন্তু অর্থের বিনিময়ে পৃথিবী জুড়ে যে বৈষম্যের প্রবাহ বয়ে চলে,

তার সূত্রপাত হয় পরিবার থেকেই। তাই রাষ্ট্রতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের মতো পরিবার যতক্ষণ একটা ক্ষমতাতন্ত্র ততক্ষণ অধিকারবোধ এবং আধিপত্য একপক্ষের আর আনুগত্য আরেকপক্ষের জন্য নির্দিষ্ট হবে। এই হিসাবে পরিবারের সকল সদস্যের সহ্য ক্ষমতাও নির্ধারিত হয়। সেই সহ্যের সীমা লঙ্ঘিত হলেই একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন বা বিবাহবিচ্ছেদের মতো ঘটনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'মেয়েদের বন্ধুত্ব', যেখানে লেখিকা নানান পুরাণ প্রতিমা ব্যবহার করে মেয়েদের বন্ধুত্বের ধারাবাহিকতা ও বর্তমানে তাঁর প্রামানিকতা তুলে ধরেন। রাধার সখী ললিতা-বিশাখার, সতীর সখী জয়া-বিজয়া, সীতার সখী সরমা যেমন পুরাণক্রমে সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত তেমনই সাহিত্যে উল্লিখিত সখী সংবাদকেও প্রকাশের আলোয় এনেছেন। যেমন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবিত মৃত' গল্পে কাদম্বিনী বিশ্ব-সংসাররে কোথাও ঠাঁই না পেয়ে যোগমায়ার কাছেই গিয়েছে। নিরুপমা-অনুরূপা দেবী আর গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর বন্ধু হিসাবে মিলন হয় পরিণত বয়সে, ক্রমে তাঁরা হয়ে ওঠেন 'মনের আত্মীয়'। আসলে বন্দি জীবনে থেকেও যাদের মনের পরিসর বিস্তীর্ণ হয়, তাদেরই বন্ধুর জন্য আকুলতা দেখা যায়। জ্যোতির্ময়ী দেবীর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সমাজ নির্দিষ্ট নিয়মের কারণেই হয়ত পুরুষের অনেক বন্ধু থাকে, কিন্তু মেয়েদের 'জৈব জীবন' এর বাইরে কিছু নেই। দেরিদার 'Politics of Friendship' গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নীটশের মতে ভালোবাসার ঠিকঠাক নামই বন্ধুত্ব— "This friendship is a species of love, but of a love more loving than love."[৫] মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার জন্য ও মানসিকতার আদানপ্রদানের জন্য স্বর্ণকুমারী দেবী ১৯ শতকে স্থাপন করেন 'সখী সমিতি'। এরই সূত্র ধরে পরবর্তীকালে লেডিজ ক্লাব তৈরি হয়েছে, যারা নানান উন্নয়নমূলক কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নবনীতা দেবসেন সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান তৈরি করে নাম দেন 'সই', যেখানে সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সম মানসিকতার মহিলারা খোলামেলাভাবে মনের আদানপ্রদানের সুযোগ পান। অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে মেয়েদের বন্ধুত্বের প্রবাহটিকে সংঘবদ্ধ ভাবে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস থেকে নারীর নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেবার পথ আরো সুগম হবে বলে আশা করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'বিবাহের বিরুদ্ধে'। বিবাহ শব্দটির শাব্দিক অর্থ হল বিশেষভাবে বহন করা (সং , বি + বহ্ + অ)। সামাজিক অর্থে বিবাহকে যদি এক ধরনের চুক্তি বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে বিবাহ হল যে কোন ধর্মের ধর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে হওয়া একধরণের চুক্তি বা প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থার কর্তা, কোর্টের রেজিস্টার দ্বারা সম্পাদিত পারস্পরিক একটি চুক্তি আবার দু'জন মানুষের মাঝে শুধুমাত্র ভালোবাসার চুক্তি হতে পারে। প্রাচীন শাস্ত্রে আট ধরনের বিয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়— ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রজাপত্য, গান্ধর্ব, রাক্ষস, অসুর ও পৈশাচ।[৬] নিয়তির আকর্ষণে নারী এবং পুরুষ পরস্পরকে ভালবাসবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থনীতি প্রযুক্তিবিদ্যার কারণে পৃথিবী জুড়ে নারী পুরুষের সম্মিলিত জীবনযাত্রা ক্রমশই বদলে যাচ্ছে। ১৯২৭ সালের কাউন্ট কাইজারলিং 'Book of Marriage' বইটিতে বিবাহ প্রতিষ্ঠানকে সংকটমুক্ত করতে একাধিক প্রবন্ধে দেখান বিবাহ প্রতিষ্ঠান পুরনো ধাঁচে না টেকার কারণগুলি। ইউরোপ-আমেরিকা আলোচ্য হলেও আজকের দিনে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশ যুক্ত হয়েছে।[৭] এর জন্য দায়ী পুরুষতন্ত্র। গৌতম ঘোষ 'দখল' সিনেমায় দেখান, ১২ বছর ঘরকান্না করার পর কৃষক দম্পতির পুরুষটি মারা গেলে নারীকে ক্ষমতাবান জোতদার জমি থেকে উৎখাত করে এই কথা রটিয়ে যে, দম্পতির নাকি বিয়েই হয়নি। বোঝা যায় সম্পত্তির মালিকানা জড়িত স্বার্থপর প্রতিষ্ঠান কীভাবে একসূত্রে গেঁথে যাচ্ছে। 'পাত্রী চাই' বা 'Matrimony.com'— এর বিজ্ঞাপনে সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্মার্ট-সুন্দরী-কনভেন্ট এডুকেশনের চাহিদা বাড়ছে আর এক বিবাহের পরিবর্তে বহু পুরুষ বিবাহ, বহুনারী বিবাহ, বহুপার্শিক বিবাহ, সমলৈঙ্গিক

বিবাহ গুরুত্ব পাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে 'লিভ টুগেদার'-এর কনসেপ্ট-ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবাহের ক্ষেত্রে 'মঙ্গল-অমঙ্গলের' ধারণা দেখান, যা 'যোগাযোগ' পরবর্তী উপন্যাসে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'প্রকৃত প্রণয়ের' উল্লেখে বিবাহ সম্পর্ক নির্দেশে নারী পুরুষের যৌনমুক্তির কথা বলতে চেয়েছেন, যাকে সমর্থন করেন সুতপা ভট্টাচার্য নিজেও। এই পদ্ধতিতেই তিনি মনে করেন, বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি মানবিকতা যুক্ত হবে।

চতুর্থ অধ্যায়টি হল 'নারীমুক্তি আর যৌনমুক্তি'। ফেমিনিজমের সঙ্গে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক-সমাজতান্ত্রিক-যুক্তিবাদী ধারণা স্পষ্ট। তার সঙ্গে যুক্ত থাকে পিতৃতন্ত্রের মতো মূল ক্ষমতা কাঠামো। নারীবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যে বিপুল সাড়া জাগানো বইগুলি হল— এঙ্গেলেসের 'The origin of family, private property and the state' (১৮৮৪), ভার্জিনিয়া উলফ-এর 'A room of one's own' (১৯২৯), সিমোন দ্য বোভোয়ার 'The second sex' (১৯৪৯), কেট মিলেটের 'sexual politics' (১৯৭০) এবং হুদা শারাবীর স্মৃতিকথা। নানান পর্যালোচনা ও সমাজের ভূমিকার পরিণতি হিসেবে দেখা যায়, যৌনতা— যা দুটি মানুষের সর্বাঙ্গ মিলনের পরিণতি, তার মধ্যেও এসে পড়ে সমাজ আর সমাজ নিষিদ্ধতার নানা যুক্তি। সিমোন-দ্য-বোভোয়ার এই পরিস্থিতিতেই হয়তো বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজই তাকে নারী করে তোলে'। বোঝা যায়, যৌনতা আসলে একটি সামাজিক সম্পর্ক। পৃথিবীর ইতিহাসে পুরুষ নারীকে সবচেয়ে বড় যে ধাপ্পাটি দিয়েছে তার নাম মনোগ্যামি। অর্থাৎ, এক নারী এক পুরুষের যৌননিষ্ঠার ব্যবস্থা যার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে আধুনিক পরিবার। কিন্তু পুরুষ কোনও দিনই এই যৌননিষ্ঠা পালন করেনি। আগে পরিবার ছিল বহুপত্নিক, অর্থাৎ যৌন একনিষ্ঠতার দায় শুধু মেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[৮] তাই নারী মুক্তির জন্য যৌনতার সঙ্গে আরও কতগুলি বিষয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন— সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, আত্মবিশ্বাসের সুযোগ প্রভৃতি। এই গণ্ডিগুলি অতিক্রম করতে পারলে হয়তো নারী তার নিজস্ব বিকাশের আকাশ খুঁজে পেতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম 'স্ত্রী-র স্বাধীনতা থেকে নারীমুক্তি মেয়েদের চোখে'। স্বাধীনতা হীনতা তথা পরাধীনতার আক্ষেপ ১৯ শতকে বাঙালি নারীদের কলমে প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৬৯ সালে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় বামাসুন্দরী দেবী পরাধীনতার কষ্টের জন্য আক্ষেপ করেন, কারণ— পথে নারী বিবর্জিতা, দেশভ্রমণে মেয়েদের অধিকার নেই। মায়াসুন্দরী দেখান, চার দেওয়ালে বন্দি মেয়েদের ভিতরকার গোমড়ানো কান্না— হাওড়া ব্রিজ নির্মাণের সময় কলকাতাবাসী পুরুষদের তা দেখার অধিকার থাকলেও মেয়েদের ছিল না। প্রসন্নবালা গুপ্তর ১৯৮৭ সালে 'বামাবোধিনী' তে সমানাধিকারের দাবিতে ক্ষোভ নয়, আক্ষেপ প্রকাশ পায়। নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী-ও মেয়েদের জীবনকে কারাগার তুল্য অবস্থান থেকে দেখান। ক্রমে উপনিবেশিক ও পুরুষতান্ত্রিক পরাধীনতা সম্পর্কে মেয়েরা সচেতন হয়ে ওঠে। আশাপূর্ণা দেবী সৃষ্ট সুবর্ণলতা চরিত্র অসহযোগ আন্দোলনে বিলিতি কাপড় পোড়ায়, সুলেখার সান্যালের নায়িকা ঠাকুরদার মার খেয়েও রিলিফের কাজে যোগ দেয়। সাবিত্রী রায়ের 'স্বরলিপি' বা 'পাকা ধানের গান' রাজনৈতিক সংগ্রামের গল্প হয়ে ওঠে। সাংসারিক ভূমিকা পালনের বাইরে গিয়ে নিজের ব্যক্তিসত্তার খোঁজকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র'-গল্পের মৃণাল মুক্তি বলে জেনেছিলেন। জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'ছায়াপথ' উপন্যাসের নায়িকা সুপ্রিয়া ব্যাকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করে এক নারী নেত্রীর, যিনি সংসারকে দেখিয়ে দেবেন নারী শুধু খেলনা নয়, উপকরণ নয় সংসারের, এক সম্পূর্ণ মানুষ। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশি মা' ও সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসগুলিতেও পিঞ্জরাবদ্ধ নারীর মুক্তির প্রসঙ্গ এসেছে। তসলিমা নাসরিন 'আমার মেয়েবেলা' সহ অন্যান্য উপন্যাসে সামাজিক নানান অসংলগ্নতার প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। আলোচ্য অধ্যায়টির

শেষে শোনা যায় উশ্রীর গাওয়া গান— 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'। রবি ঠাকুরের গানের কথার রেশ ধরেই মনে হয়, আত্মনির্ভরতার শক্তিই পারে মেয়েদের আলোর দিশা দেখাতে, তাদের আলোকিত পথের দিকে এগিয়ে দিতে। আগামী দিনের মেয়েরা সেই ভরসাতেই পথ হাঁটবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম 'ভ্রূণহত্যা'। এই শব্দবন্ধর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ইহজগতের যাবতীয় আবেগ। যে আগত প্রাণ পৃথিবীর আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দেবার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তাকে অকালে নারকীয় সামাজিক হত্যার সম্মুখীন করা হয়, তার জন্মের আগে থেকেই। আজকের দিনে মহিলারা শত কষ্ট বুকে চেপে রেখে পারিবারিক বা পেশাগত কারণে অ্যাবরশন করাতে বাধ্য হন। আলোচ্য অধ্যায়টি জুড়ে রয়েছে মিনু নামের এক নারীর গল্প, যার সন্তান ধারণ-পালন বা রক্ষণাবেক্ষণের কোনো সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দেয়নি স্বামী সহ সমগ্র পরিবার। অল্প বয়সে বিয়ের পর প্রথম সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা কালীন পড়ে যাবার ফলে অ্যাবরশন করাতে চাইলে প্রবল বাধা আসে পরিবারের পক্ষ থেকে। অশক্ত পুত্র সন্তানকে বুকে জড়িয়ে লালন পালন করার দুই বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান হিসেবে কন্যা জন্ম দেওয়ার কারণে আবারো লাঞ্ছিত হতে হয়। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে অসুস্থ পুত্র সন্তান মারা গেলে সমস্ত দায় বর্তায় মিনুর ওপর, পাশাপাশি চলতে থাকে অসুস্থ স্বামীর সেবা। মিনু চায় কন্যা সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে মুক্ত আকাশ দিতে। কিন্তু পারিবারিক ঔদাসীন্যে মারাত্মক ক্ষয় রোগে ঝরে যায় মিনুর জীবন। আবার মিসেস সেন দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে নিজের প্রাত্যহিক জীবন ও ক্যারিয়ারের কথা ভেবে অ্যাবরশনকে প্রাধান্য দেয়। সে অনুভব করে দাম্পত্যের কেন্দ্র ভূমিতে মেয়েদের ভূমিকা পরোক্ষ আর বিয়ে আসলে 'লিগালাইশড প্রস্টিটিউশন'। একথা স্বীকার্য যে, নারী স্বাধীনতার সঙ্গে নারীর আইনগত অধিকার প্রসঙ্গে পারিবারিক-সামাজিক ও মাতৃত্বকেন্দ্রিক স্বীকৃতিগুলিকে গ্রহণযোগ্যতা দেবার সময় এসে গেছে। মাতৃত্বকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি অবশ্যই নারীর প্রজননের ক্ষেত্রে নিজস্ব জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। চিকিৎসা শাস্ত্র সম্মত গর্ভপাত আইন (Medical Termination of pregnancy) মেয়েদের সুরক্ষার ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থাকায় মেয়েরা অনেক সময় সহজলভ্য কোন প্রক্রিয়ার শরণাপন্ন হয়। এই 'MTP' আইন ভারতে ১৯৭১ সালে বলবৎ হয়, ২০০৩ সালে তার নারীর অধিকারের মধ্যে আসে আর ২০২১ সালে ২০ সপ্তাহের বদলে ২৪ সপ্তাহ অ্যাবরশন নিয়মের আওতাভুক্ত হয়।[৯] বাস্তবিক ক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা মহাভারতের যুগ থেকে নারীর উপর যে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে এসেছে নারী সুরক্ষার এই আইনগুলি ব্যথা ভরা হৃদয়েও নারীকে আরো দৃঢ়চেতা করে তাকে মুক্ত আকাশের সন্ধান দিয়েছে।

'নারীশক্তি' নামক সপ্তম অধ্যায়টি শুরু হয়েছে দ্যুতির কথা দিয়ে। ক্রমে রোচনা, শ্রুতি, উশ্রী ও ঋতদীপার কথোপকথনে উঠে আসে বাস্তবে-সাহিত্যে-শিল্পে নারীর অবস্থান, ও আত্মসন্ধানের নানান দিক। রুশতী সেনের 'পরানের আলো ভুবনের আঁধার', 'মায়েদের কথা মেয়েদের কথা' বই বা শ্যাম বেনেগালের সিনেমা— সর্বত্রই নারী লাঞ্ছনার হৃদয় বিদারক ছবি স্পষ্ট হয়। সমাজের হাতে প্রতিদিন মার খাওয়া মেয়েদের সমস্ত মানসিক শক্তির প্রতিভূ হয়ে ওঠেন দেবী সরস্বতী। পুরান মতে অসুরের রক্ত থেকে জাত অসংখ্য অসুরকে শায়েস্তা করেন শক্তিরূপিনী দেবীর সঙ্গে চৌষট্টি যোগীনিও। নবজাগরণের কালে মধুসূদন দত্তের লেখা 'বীরঙ্গনা' কাব্যের প্রেম ও প্রতিবাদ মিশ্রিত পত্রগুলি নারী শক্তির অন্যতম আকর। বর্তমানে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ও সামাজিক পদে নারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও কন্যা ভ্রূণ হত্যার মতো নারকীয় ঘটনাগুলিও দীর্ঘকাল যাবত আমাদের অস্তিত্বে নাড়া দিয়ে যায়। মাতৃত্বের উপরে পুরুষতন্ত্রের সবচেয়ে বড় আঘাত হল গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে কন্যা ভ্রূণগুলির গর্ভপাত ঘটানো। 'পুত্রার্থে ক্রীয়তে

ভার্যা'— এই সনাতনী মনোভাবটি কন্যা সন্তানকে আপদ রূপে চিহ্নিত করে তাকে সমূলে উৎপাটিত করার পাশাপাশি গর্ভবতী মায়ের কন্যা ভ্রূণ হত্যার নারকীয় উল্লাস সহ পিতৃতান্ত্রিক উগ্রতার বীভৎস রূপ। লিঙ্গ নির্ধারণ করে কন্যা ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হয়ে চলা আন্দোলনের নেত্রী মালিনী ভট্টাচার্যের ভাষায়— "পুত্র এষনা / কন্যা এসো না।"[১০] পুত্রেষণার মতো সামাজিক মনোবৃত্তির সঙ্গে লিঙ্গ নির্ধারণের মতো আধুনিকতম প্রযুক্তি সংযুক্ত হওয়ায় পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ ও হিংস্র হয়ে উঠেছে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অঞ্চলের মানুষকে আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে নারী পাচার আরো দৃঢ় ভিত্তিতে প্রোথিত হচ্ছে। এই অন্ধকার পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আলোর দিশা দেখানোই একজন সচেতন নাগরিকের আশু কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়া কাম্য।

অষ্টম অধ্যায়ের নাম 'যৌনতা বনাম সংস্কৃতি: তসলিমা নাসরিন'। রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের নারী হয়েও পুরুষতন্ত্রের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সম্যক প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তসলিমা নাসরিন তার 'আমার মেয়েবেলা', 'দ্বিখণ্ডিত', 'নির্বাচিত কলাম' সহ অন্যান্য সাহিত্যকৃতির মাধ্যমে। আমাদের দৈনন্দিন সংস্কৃতি বা জীবনের যে নির্মিতিগুলি অনবরত নারীকে পুরুষের ব্যবহার্য যৌনবস্তুতে পুরুষের প্রয়োজন সম্পাদনের বিষয়ে পরিণত করেছে, নারীকে বন্দি রাখার অদৃশ্য পিঞ্জরের শলাকায় গেঁথে রেখেছে, সেই বন্ধনের স্বরূপ যথেষ্ট বলিষ্ঠতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন তিনি। তবে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত ধর্মের বিধানানুযায়ী নারীকে অবদমিত রাখার কৌশলের কথা তসলিমার আগে বেগম রোকেয়া বা জ্যোতির্ময়ী দেবীর মতো নারীরা বলেছিলেন। তসলিমার প্রতিবাদ সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক লিঙ্গ রাজনীতির বিরুদ্ধে।[১১] 'স্ত্রৈণ' চিহ্নিত হওয়ার অগৌরব থেকে বাঁচতে পুরুষ অনেক ক্ষেত্রে সন্তান পালনকে 'মেয়েলি কাজ' বলে চিহ্নিত করে থাকে, আবার যৌনতার ক্ষেত্রে অবদমিত রাখার জন্য 'দেবী', 'সতী', 'লক্ষী' , 'ফুল'— এর সঙ্গেও তুলনা করে থাকে। তসলিমা মেয়েলি শব্দটির পরিবর্তে 'নারীত্ব' এবং ছেলেবেলা শব্দটির পরিবর্তে 'মেয়েবেলা' ব্যবহার করে নারীর সাংস্কৃতিক উত্তোরণের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করতে চেয়েছেন। তবে 'ছেলেবেলা' শব্দবন্ধে শৈশবের যে আবেগ লুকিয়ে থাকে, সেই প্রেক্ষিতে 'মেয়েবেলা' শব্দবন্ধটি অনেকটাই এক পেশে বলে মনে করেন প্রাবন্ধিক সুতপা ভট্টাচার্য। আবার মল্লিকা সেনগুপ্ত মনে করেন, সংবিধান অনুযায়ী সমানাধিকার নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। নারীকে দেবী ভাবাটা যেমন পুরুষ নিয়ন্ত্রিত বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী একটা বিশাল ধাপ্পা তেমনি ধর্মের ভিত্তিতে নারীকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা পুরুষতান্ত্রিক চতুরতা বা ধৃষ্টতা। কেননা হিন্দু আইন যদি পূর্বপুরুষের সম্পত্তির সমান অংশ মেয়েকে না দেয়, মুসলিম আইন যদি নারীকে তালাক দেওয়ার অধিকার না দেয়, খ্রিস্টান আইন যদি যৌন আচরণের ক্ষেত্রে দুমুখো নীতি চালু রাখে, সেক্ষেত্রে সংবিধান নিরুপায়, রাষ্ট্র ঠুঁটো। কারণ তারা ধর্মের স্বাধীনতায় হাত দেবে না।[১২] তসলিমার প্রতিবাদ ছিল মূলত পুরুষতান্ত্রিক ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে। পরিবারের পুরুষেরা মুসলিম নারীর উপর যে যৌন অত্যাচার করে, ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে অনুভব করে গর্জে উঠেছিলেন তসলিমা, যা প্রকাশ্যে মানতে পারেনি পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ, কঠোর হয় রাষ্ট্রনীতি, তসলিমার উপর তীব্র হয় আঘাত, দেশ ছাড়া করা হয় তাকে। পুরুষের ভালোবাসার নামে যৌন অত্যাচার বা ধর্ষণ আজও সমাজের জীবন্ত সমস্যা। 'শুভ বিবাহ' নামক কবিতায় তাই তসলিমা বলেন— 'আমার জীবন / চর দখলের মতো দখল করেছে এক বিকট পুরুষ/ আমার শরীর চেয়েছে সে নিজের অধীন।'

নবম অধ্যায়ের নাম 'মেয়েদের বিকল্প ঐতিহ্য'। আগের অধ্যায়ে তসলিমা নাসরিনের পুরুষতন্ত্রের কদাচার-এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে সুতপা ভট্টাচার্য মনে করাতে চান পাকিস্তানের সাতজন মহিলা কবির পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার কবিতাগুলিকে। পুরুষ প্রতাপী সমাজে নারীরা চিরকালই

অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে নিজের সত্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসু থেকেছে, সৃষ্টির প্রথম লগ্নের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্মোচিত করতে চেয়েছে নিজের আত্মপরিচয়, জানাতে চেয়েছে 'আমার ব্যক্তিতা নিছক তোমার লালসার প্রতীক নয়'।[১৩] আত্মানুসন্ধানের সূত্রেই রুকসানা আহমেদ 'we singful woman' বা 'আমরা গুন্‌হগার মেয়েমানুষ' নামে সংকলনটিতে পাকিস্তানের সাতজন মহিলা কবিদের কবিতার ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। এখানে নারীবাদ যেন প্রতিবাদের আরেক নাম। এই কবিরা জানেন, রাষ্ট্রপ্রতাপ আর ধর্মপ্রতাপ যখন একযোগে পুরুষতন্ত্রের আশ্রয়ে লালিত হয়, তখন প্রতিবাদের কবিতাই মেয়েদের পরিত্রাণের একমাত্র আশ্রয়। মার্কসবাদীরা দেখিয়েছেন, স্বাভাবিক কোনো কারণবশত নয়, স্রেফ অর্থনৈতিক কারণের জন্য অর্থাৎ আদিম যুগের স্বাভাবিক ও যৌথ ধনসম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত ধন-সম্পদের জয়লাভকে ভিত্তি করে, তারই প্রথম অভিব্যক্তিরূপে এই পারিবারিক প্রথা উদ্ভূত হয়। পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য পুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য একমাত্র তারই ঔরসজাত সন্তান প্রজনন— একনিষ্ঠ বিবাহের যে এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য, গ্রীকরা তা খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করে। অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলির ক্ষেত্রে বিবাহ বোঝার মতোই গণ্য হত। এ ছিল দেবতা, রাষ্ট্র ও পূর্বপুরুষদের কাছে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।[১৪] শুধু গ্রীকরা নন, পৃথিবীর অপরাপর সভ্যতাও পুরুষতন্ত্রের এই বিধিকে মান্যতা দিয়েছেন। সুতরাং, এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে নারী সরব হবে, এটাই স্বাভাবিক, ওই মাধ্যমেই নারীরা ঐকাত্ম্যের সন্ধান করেছেন। 'বিকল্প সাহিত্য-ঐতিহ্যের সন্ধানে' নামক শিরোনামে লেখিকা দেখান মেয়েদের লেখা মানেই মেয়েলি নয়। অ্যালিস ওয়াকারের 'In search of our mother's Gardens' বইয়ের 'মেয়েলি গদ্য' (womanist prose) এর 'মেয়েলি' শব্দ প্রসঙ্গে বলা আছে— সেই মেয়েকে বলা যায় মেয়েলি, যে ভালোবাসে অন্য মেয়েদের, মেয়েদের সংস্কৃতি-আবেগ-কান্না ও তার সামর্থ্য। কখনো বা ব্যক্তিগত ভাবে কোনো পুরুষকে ভালোবাসে, আর সে দায়বদ্ধ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষদের বেঁচে থাকার জন্য, তাদের সম্পূর্ণতার জন্য। সে কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়, সে হল বিশ্বমানবিক। সুদূরপ্রসারী আলোর অভিমুখী এই মানসিকতা শুধু মেয়েদের নয়, মানুষের জীবন ও সাহিত্যের অভিমুখ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দশম অধ্যায় হল 'রাজনীতি ও মেয়েরা'। মল্লিকা সেনগুপ্ত 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে' কবিতায় দেখিয়েছিলেন ইতিহাস মানে 'His' স্টোরি, 'Her' এর অংশগ্রহণ সেখানে বিলুপ্তপ্রায়, আর সুতপা ভট্টাচার্য দেখালেন ইতিহাসের দিকে পিছন ফিরলে দেখা যায় রাজনীতিতে চিরকালই পুরুষের অংশগ্রহণ বেশি ছিল, নারীরা পর্দার আড়ালে থেকে পুরুষের অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করেছে। তাই প্রাচীনকাল থেকে রাজনীতিতে ছিল পুরুষের ঘোষিত দাপট, ক্রমে মেয়েরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে বুঝেছে, নারীর অন্তরাত্মায় লালিত থাকে রাজনীতি। উনিশ শতক পর্যন্ত পর্দানসীন থেকে বিশ শতকের শুরুতে সচেতন মেয়েরা বুঝতে পেরেছে, পিতা স্বামী বা সন্তানের অধীনতা নয়, সম্পত্তির ক্ষেত্রে তারও মালিকানা থাকা প্রযোজ্য। ফলত সমাজ বাধ্য হয় একপেশে মনোভাব থেকে সরে আসতে, কার্যকরী হয় আইন অনুযায়ী নীতি প্রয়োগ, নারীর সম্পত্তির অধিকার আইন ও ধর্ম অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। হিন্দু আইনে ১৯৫৬ সালের পর কন্যাদের পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইন প্রযুক্ত হয়েছে, আর মুসলিম নারীরা এক্ষেত্রে সম্পত্তির কিছু শেয়ার লাভ করে। ক্রমে রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতেও মেয়েরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। পঞ্চায়েত-রাজ্যসভা-বিধানসভা-লোকসভাতে মেয়েরা নির্দিষ্ট অনুপাত অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনে অংশগ্রহণ করে। নারীকে পুতুল করে রাখার কায়েমী স্বার্থ নির্ভর পুরুষতন্ত্রের অভিসন্ধির গোড়ায় আসলে আর্থিক ও সামাজিকতা নির্ভর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল ছিল। কৃষ্ণভাবিনী দাস 'ইংল্যান্ডে বঙ্গমহিলা' নামক গ্রন্থে ইংল্যান্ডের স্বাধীন মেয়েদের দেখে স্বদেশীয় পরাধীন মেয়েদের দুঃখময় জীবনের কথা স্মরণ করে উচ্চশিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে

চেয়েছিলেন। নারীর সর্বতোভাবে অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য হয় ১৯৫০ সালে গৃহীত হওয়া ভারতের সংবিধান অনুযায়ী সর্বজনীন ভোটাধিকার আইন, যেখানে নির্ধারিত হয় পুরুষের মতো ১৮ বছরের ঊর্ধ্বের প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরাও ভোট দিতে পারে। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ভোট প্রদান সমাজ ও রাজনীতি স্বীকৃত সফল পদক্ষেপ হলেও এই জয় সহজে আসেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো স্থিতধী পুরুষ মনে করেছিলেন, বিপ্লব নারীকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে না। তবে পরবর্তীকালে যন্ত্র নির্ভর অমানবিক সভ্যতার আস্ফালন দেখে তিনি প্রমাণ করেছিলেন সমাজে শ্রী ও মানবিকতা ফিরিয়ে আনতে নারীর ভূমিকাও কম নয়, লিঙ্গ রাজনীতি আর রাষ্ট্র রাজনীতি পেরিয়ে সদর অন্তরে বিরোধ ঘোচাতে নারীর ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবী যেমন 'দ্রৌপদী' গল্পে রাষ্ট্ররক্ষীদের নগ্ন রূপ দেখিয়েছিলেন, তেমনি আশাপূর্ণা দেবী তার 'ট্রিলজি'তে— (প্রথম প্রতিশ্রুতি-সুবর্ণলতা-বকুলকথা) দেখাতে চেয়েছেন অন্দর থেকে বাইরে আসার পর্যায়ক্রমে সামাজিক পরিকাঠামো ও রাষ্ট্র রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের প্রয়োজন আছে। এই অধ্যায়ের শেষে ঋতদীপার ডায়েরি অনুযায়ী নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে সমস্ত 'বাঁধন' ছিন্ন করে নারীকেই যে এগিয়ে আসতে হবে, এমনই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়।

একাদশ অধ্যায়ের নাম 'নারীর ক্ষমতায়ন'। যুগে যুগে নারীর স্বাধিকারের প্রসঙ্গে ক্ষমতায়নের বিষয়টি সমান্তরালে এগিয়ে চলেছে। লেখিকা দেখান অধিকার অর্জনের প্রথম শর্ত ছিল পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতাচাপের স্বরূপ বুঝে নেওয়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাঁশিওয়ালা' কবিতাতে দেখিয়েছিলেন ঘরে কাজ করা 'শান্ত মেয়ে'কে সবাই বলে 'ভালো'। এও ঠিক 'ভালো'র কোনো শেষ নেই। তাই ক্ষমতায়নের প্রথম পদক্ষেপ হল পুরুষতন্ত্র নির্দেশিত রোল মডেলকে প্রত্যাখ্যান করে সংসার থেকে বেরিয়ে বাইরের কাজে-দেশের কাজে নিজেকে সঁপে দেওয়া। শাস্ত্র অনুযায়ী 'স্বামী সেবা' থেকে কিছুটা সরে এসে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারলেও মেয়েরা সামাজিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকতে পারে। প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে যুগে যুগে নারী অবমাননা দেখা গেছে— পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চিরকালই মনে মনে শরীরে স্ত্রী লিঙ্গকে অপমান করে এসেছে। তার মধ্যেই সোচ্চার প্রতিবাদে ব্রহ্মবাদিনী বেদকন্যা অপালা, ঘোষা, সূর্যা, রেমিশা, বিশ্ববারা, সরমা-রা উঠে দাঁড়ান বেদমন্ত্রে। বেদোত্তর কালেও গার্গী, মৈত্রেয়ী, বাৎসী, বাক্‌ঋষিকা-রা বজ্রনির্ঘোষে জানিয়ে দেন সমাজে নারীর স্থান তুল্যমূল্যে সমানাধিকারে।[১৫] যতই দিন বদলের পালা আসুক এ প্রমাণিত যে 'বিবাহ'ই হল ব্যক্তিগত ক্ষমতাচাপ প্রয়োগের এক ক্ষমতাতন্ত্র, যা ঐতিহ্য অনুসারী বৈষম্যমূলক নীতি নিয়মকেও অগ্রাধিকার দেয়। প্রাগৈতিহাসিক কালে মাতৃ পরিচয় ছিল সন্তানের পরিচয়। তখন একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাঝে বিবাহ এবং যৌন সম্পর্ক দুটোই ভিন্ন বিষয় ছিল। পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা সামাজিকভাবে একক দাম্পত্য জীবনের প্রয়োজনিয়তা উপলব্ধি করে, যার সঙ্গে যুক্ত হয় অর্থনীতি। একক দাম্পত্য জীবনে নারী ক্রমাগত সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির অন্তঃপুরে একজন ক্রীতদাসীর ভূমিকা পালন করা আরম্ভ করে। দার্শনিক মিল্ এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন— 'No slave is a slave to the same as wife'। এঙ্গেলস এর ব্যাখ্যায়—

> "The wife becomes the first domestic servent pushed out of participation in social production. The modern individual family is based on the open or disguised enslavement of the woman."[১৬]

নারীকে কৌশলে করায়ত্ত করে নিজের সুবিধাজনক অভিরুচি ও অভিপ্রায়ে পুরুষতন্ত্র তাকে 'সুন্দর' তকমা দেয়। কিন্তু আত্মসচেতন মেয়ে তার বুদ্ধি বৃত্তির ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজেকে প্রমাণ করে। মেয়েদের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে বিশ্বকবি-ও দোলচলতায় ছিলেন। নারীর এই ক্ষমতায়নের পথে তার সবচেয়ে বড় বাধা

হল তার শরীর ও যৌনতা। তবে এই বাধা গণ্ডিকে পেরিয়ে আজকের দিনে নারী সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-অর্থনীতি-রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছে। বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন'-তে যে স্বপ্ন রাজ্যে সুলতানা ভ্রমণ করে, সুলেখা সান্যালের 'নবাঙ্কুর' বা সাবিত্রী রায়ের 'মেঘনা-পদ্মা'র মতো উপন্যাসে যেভাবে বালিকা প্রটাগনিস্টরা উঠে আসে, বা আশাপূর্ণা দেবী ও মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্ররা যেভাবে নিজেদের মতন করে প্রতিবাদে সামিল হয়, বর্তমানের নারীরা তাদেরই আলোকবর্তিতা বহন করে যথার্থ কর্মে ও মানবিক ধর্মে। সেকারণেই আজকের দিনে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে শ্রমের হায়ারারকি, মুছে যাচ্ছে ঘর বাহিরের দ্বিবিভাজন। নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে ১৯৪৭ সালের পর ভারতবর্ষে তৈরি হয় বেশ কিছু আইন— হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৫), হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬), দেহ নিয়ে অবৈধ কারবার নিবারণ আইন (১৯৫৬), সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন (১৯৮৭), ভ্রূণ হত্যা নিবারণ আইন (১৯৯৪), মাতৃত্বের সুযোগ সুবিধা আইন (১৯৬১), যৌতুক নিষিদ্ধ আইন (১৯৬১), ও ঘরোয়া হিংসার বিরুদ্ধে মহিলা সুরক্ষা আইন (২০০৫)। শুধু আইনের ঘেরাটোপে থাকলেই হবে না, মানসিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দিলেই সমাজ আধুনিক ও লিঙ্গ বৈষম্যহীন হবে। কোলরিজের মহৎ মনকে উভলিঙ্গের তকমা দেবার মতো সমাজ মন-ও উভলিঙ্গ হবে। তবেই 'আগুনের পরশমণি' ছুঁইয়ে আমরা সেই আলোকসন্ধানী হতে পারব, যেখানে জোরের সঙ্গে বলা যায়— 'There is something more important— to be human.' ঋতদীপার ডায়েরি অনুযায়ী নারীর ক্ষমতায়নের অন্য নাম হোক 'Humanity' বা মানবিকতা।

'নারী ও ধর্ম' নামে দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বা পুরুষতন্ত্রের কদর্যতাকে জিইয়ে রাখার অন্যতম উপাদান হিসেবে ধর্ম কত ভাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ধর্মের ভয় দেখিয়ে মেয়েদের ঘোমটা বা বোরখার আড়ালে মাথা নত করে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে আজীবন। আবার দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে স্বার্থসিদ্ধি করেছে মুনাফা লোভী রাজনৈতিক মদতদুষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী। নারীর ক্ষেত্রে সতী হওয়া থেকে ব্রতকথা পালন— সব ক্ষেত্রেই সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে পুরুষতান্ত্রিক শাসনের কঠোরতা। 'সতীমন্দির' নামক ধর্মীয় পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে বারে বারে নারীকে সতী হতে বাধ্য করেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। রাজস্থানে রূপ কানোয়ারের সতী হওয়া নিয়ে দেশজোড়া তোলপাড়ের পর মধ্যপ্রদেশের কুট্টুবাই এর সতী হওয়ার ঘটনায় উত্তাল হয়েছে সারা দেশ। ধর্মের আইন কানুন যে মেয়েদের পদানত রাখার জন্যই তৈরি হয়েছিল, তা আজকের দিনে প্রমাণ সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠিত। তাই অনিন্দিতা দেবী তীব্র বেদনায় লিখেছিলেন— 'হায় ধর্ম, তোমারই বা এ কি অধর্ম'। রামমোহন রায় ১৯ শতকের গোড়াতেই যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন, মেয়েরা স্বেচ্ছায় সতী হয় না, নানা উপায় জোর করে স্বামীর চিতায় পোড়ানো হয়।[১৭] এই সত্যকে আড়াল করে ধর্মমাদকতা পুষ্ট সমাজ দেখাতে চায়, সতী হওয়া হত্যা নয়, আত্মহত্যা। মেয়েদেরই চিহ্নিত করা হয় কখনো দেবী বা কখনো 'বাজারের মেয়ে' তকমায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার ব্রতকথা' প্রবন্ধতেও দেখান, ব্রত যেমন একাধারে শিল্পের অঙ্গ, তেমনি সতীন সমস্যার মতো বিকৃত রূপও ব্রতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। ঈশ্বর উপলব্ধির ক্ষেত্রে ধর্মের বিস্তারে দেখা যায় পুরুষের আধিপত্য আর ধর্ম যেখানে ক্ষমতাতন্ত্র, সেখানে পুরুষতন্ত্র নারীকে চিহ্নিত করে 'নরকের দ্বার' হিসাবে এবং নারী ও শূদ্র সেখানে সমানভাবে পোষিত। লক্ষ্মীমণি দেবী বা মধুমতি গঙ্গোপাধ্যায় দেখান, নারীর এই অবস্থার প্রধান কারণ অশিক্ষা। উপেন্দ্রমোহিনী দেবী নারীর এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়েছেন। সুবাসিনী সেহানবীশ ধর্মাচরণ ও জ্ঞানোপার্জন উভয় ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারের দাবি জানান। ধর্মের নামে একাদশীর দিন উপোসী বিধবাকে এক বিন্দু জল এর অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়। এই জঘন্য প্রথাটিকে সাবিত্রী রায় 'পাকা ধানের গান'— এর

আন্নার মাধ্যমে দেখান, একাদশীর দিন পুকুরে স্নান করতে গিয়ে যে দু'ঢোঁক জল খাবার অপরাধে সমাজের তাড়নায় আত্মঘাতী হতে বাধ্য হয়। উনিশ শতকের লেখিকারা ধর্মের কদর্য প্রথাকে 'দেশাচার' বলে চিহ্নিত করে সমস্যাগুলিকে তুলে ধরার প্রয়াস রাখলেও হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের কারণে প্রতিবাদী হতে পারেননি। বিশ শতকের গোড়ায় এই প্রতিবাদকে প্রথম ভাষা দিলেন বেগম রোকেয়া। হিন্দু জাতীয়তাবোধের চাপ তার ওপর না থাকা বা মুসলমান জাতিত্ববোধের উগ্রতা ততটা না থাকার কারণে তিনি ১৯০৩ সাল নাগাদ শাস্ত্রের বচনকে প্রতিবাদী মেয়ের উপর 'অস্ত্রাঘাত' হিসাবেই দেখতে চেয়েছিলেন। ধর্মীয় মৌলবাদ বা মুসলিম মেয়েদের উপর হওয়া তালিবানি হুকুমনামার বিরুদ্ধ প্রতিবাদী ছিলেন তিনি। ১৯২১ সাল নাগাদ জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখার মাধ্যমে ধর্মের বিরুদ্ধে প্রখর প্রতিবাদ আরো জোরালো হয়। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্ত্রীর পত্র'র মতো গল্প বা 'চতুরঙ্গ' মত উপন্যাসে মৃণাল ও দামিনী চরিত্রের মাধ্যমে নারীর প্রতিবাদী সত্তাকে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। জ্যোতির্ময়ী দেবীর প্রতিবাদ নির্দিষ্ট ছিল পুরুষের ধর্মভাবনায়। মেয়েদের সম্মানহীনতার কারণে, সেই অপমানের জ্বালাই তিনি প্রকাশ করেছিলেন 'নারীর কথা'তে। আবার রমলা বসু 'নারীর দেবীত্ব' নামক লেখায় দেখালেন, মেয়েদের উপর দেবীত্বের আরোপ পুরুষের স্বার্থসিদ্ধি ঘটিয়ে সমগ্র স্ত্রী জাতিকে প্রবঞ্চিত করারই বিশেষ কৌশল। লেখনীর মাধ্যমে সমাজের মুখোশ খুলে দেওয়া সে যুগের নারীরা দেখাতে পেরেছিলেন, 'Ideal'-এর তকমা দিয়ে নারীকে কীভাবে 'Real' বা বাস্তব সত্য থেকে কৌশলে সরিয়ে রাখা হয়। মীরাতুন নাহার ও সুকুমারী ভট্টাচার্য কোরান-হাদিস বা উপনিষদ-ব্রাহ্মণের সূত্র অবলম্বন করে দেখিয়েছিলেন, ধর্ম কীভাবে নারীকে 'অশুচি, স্বভাব পাপিষ্ঠা, অমঙ্গলের হেতু' তকমা দিয়ে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বর্ণভিত্তিক কর্মসন্ধান থেকেও নারীকে বঞ্চিত রেখে যে কোনো ধর্ম গুরুত্ব দিয়েছে স্বামী সেবাকে। সুতপা ভট্টাচার্য এই অধ্যায়ে তথ্যসূত্রের উল্লেখে ও প্রমাণ সাপেক্ষ বক্তব্যের সাবলীলতায় দেখিয়েছেন ধর্ম কত পদ্ধতি ও প্রকারে নারীর পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখেছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অঙ্কিত হয়েছে 'বাঙালি মেয়ের শিক্ষা সামর্থ্যের মানচিত্র'। সমাজ নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী নারীর ক্ষেত্রে ধ্যান-জ্ঞান কর্ম ছিল স্বামীসেবা। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত নারীরা স্বামীকেই দেবতা হিসেবে মান্যতা দিতে বাধ্য থাকত। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য দেবতাদের সভায় নৃত্য করেছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের দুই পত্নী কানড়া ও কলিঙ্গা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, যা মেয়েদের পেলব ধারার বিপরীতের সামর্থ্যকে চিহ্নিত করে। ত্রিপুরাসুন্দরী রানীও গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। মধ্যযুগের রূপকথায় মেয়েদের শিক্ষা সামর্থ্যের যে সমস্ত চিত্র ছড়িয়ে আছে তার বেশিরভাগটাই মৌখিক। আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে যে সমস্ত ধর্মের অভ্যুত্থান আমাদের দেশে হয়েছিল, সেখানে ছিল মেয়েদের শিক্ষার অধিকার। থেরিগাথা রচয়িতা ভিক্ষু নারী যেমন তাদের কাব্য রচনার পরিচয় রেখে গেছেন, তেমনি বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান সহজযান সাধনার চুরাশি জন সিদ্ধাচার্যের মধ্যে কয়েকজন মহিলা-ও ছিলেন। এরা হলেন— মনিভদ্রর দুই বোন মেখলি এবং কঙ্গলা আর ইন্দ্রভূতির বোন লক্ষ্মীঙ্করা। [১৮] পরবর্তীকালে শ্রী চৈতন্য ব্রাহ্মণ ধর্মের বিরোধিতা করলে বৈষ্ণব ধর্ম মেয়েদের শিক্ষার স্বীকৃতি দেয়। মৌখিক ঐতিহ্য রচনায় মেয়েদের বিশেষ সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'মেয়েলি ভাষায় মেয়েলি ছড়াতে মেয়েলি ভঙ্গিতে' রচিত ব্রতকথায় নারীর কামনা-বাসনা অবাঞ্ছিত থাকার অবদমিত যন্ত্রণার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষারও সম্যক রূপায়ণ হয়েছে। নারী জন্মকে চিরকালই অবহেলার চোখে দেখা হয়। আধুনিককালে আল্ট্রাসাউন্ড পদ্ধতিতে সেক্স ডিটারমিনেশন দ্বারা কন্যা ভ্রূণ হত্যার ঘটনাও দেখা যায়। যদিও আইনানুযায়ী তা বন্ধ হয়েছে। জ্যোতির্ময়ী দেবী রাজস্থানের পরিবেশে 'বেটি কা বাপের' গল্পে শুনিয়েছেন, শিশুকন্যাকে আফিম খাইয়ে হত্যা করা হয়, মহেশ্বতা দেবী গিরিবালা গল্পে দেখান বিবাহের নামে কীভাবে বাবা মেয়েকে

বিক্রি করে দেয়। কবিতা সিংহ 'ভ্রূণা' কবিতায় লেখেন 'আমরা ভ্রূণ না ভ্রূণা / জন্ম দিওনা মা।' তবে উনিশ শতকে সুদক্ষিণা সেনের স্বামীর পরিবারের মতো আদর্শ উচ্চ শিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারে মেয়েদের কদর আর আদর ছিল অনেক বেশি। তবে ঐ প্রেক্ষাপটেই মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের চিত্রটা ছিল অন্যরকম। সুতপা ভট্টাচার্য 'গোরা' উপন্যাস ধরে তুলনামূলক আলোচনায় দেখান, গোরার দাদা মহিম তার মেয়ে শশিমুখীর দশ বছর বয়স হবার আগেই বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, আর পরেশবাবু তাঁর পালিতা কন্যা সুচরিতার বিয়ের জন্য আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করাকেই মান্যতা দেন। হিন্দুধর্ম ছেড়ে ব্রাহ্ম ধর্মে আশ্রয় নিতে যেসব মেয়েরা কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন, তাদের কথা ভেবেই বেথুন সাহেব স্কুল তৈরি করেন। ১২৭৪ সালের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা অনুযায়ী বালকদের তুলনায় বালিকাদের বুদ্ধি বেশি বলে প্রমাণিত হয়। আবার 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় দেখানো হয় কোমল স্বভাবের কারণে বিদ্যাক্ষেত্রে নারী বেশিদূর এগোতে পারবে না। এইরকম অস্বাস্থ্যকর ধারণা আমাদের দেশে বহুদিন পর্যন্ত চলেছিল। স্বাধীনতার পর রাধাকৃষ্ণাণের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা শিক্ষা কমিশন স্বীকার করেছিলেন, শিক্ষা গ্রহণের সামর্থ্যের দিক থেকে নারী পুরুষের কোন ভেদ নেই কিন্তু মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গৃহরচনায়ও বাধা হতে পারে। এরপর কোঠারি কমিশনে (১৯৬৪-৬৬) বলা হয়—

> "In the modern world, the role of women goes much beyond the home and bringing up the children. She is now adopting a career of her own and sharing equally with the men, the responsibility for the development of society in all aspects."[১৯]

এই সুপারিশ অনুযায়ী আধুনিক বিশ্ব নারী স্বাধীনতাকে স্বাগত জানাতে বাধ্য হয়। বিশ শতকের প্রাক্কাল থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে, বুদ্ধিপ্রয়োগের ক্ষমতাকে বেগম রোকেয়া 'সুলতানার স্বপ্ন'র মাধ্যমে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বাসরকক্ষের শৃঙ্খল ছেড়ে বেরিয়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদর বা মাতঙ্গিনী হাজরার মতো মহীয়সী নারীরা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বীণা দাস, কমলা চক্রবর্তী কিংবা মণিকুন্তলা সেনের আত্মজীবনীতেও ধরা আছে নারীর বীরত্বগাথা। আজকের দিনে মেয়েরা শিক্ষা-চিকিৎসা-বিজ্ঞান-খেলা-কারিগরি দক্ষতা সব ক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণ করে চলেছে। সংসার সন্তান সামলে নারীর কৃতিত্ব ছড়িয়ে পড়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। কল্পনা চাওলা, সুনিতা উইলিয়ামস এর মতো ভারতীয় মহাকাশচারী বা পাইলট দুর্বা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকাশকে এনেছে হাতের মুঠোয়। যশোধরা রায়চৌধুরী 'নূতন পাঁচালি' নামের লক্ষ্মীর পাঁচালীর বিনির্মিত কর্মে দেখিয়েছেন সব ক্ষেত্রে নারীর সফল অংশগ্রহণকে। আলোচ্য অধ্যায়ে ঋতদীপার ডায়েরি অংশে আয়েশার তথ্য অনুযায়ী দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ'র প্রসঙ্গ আসে, যেখানে নারীর সামর্থ্যের নানা চিত্র দেখানো হয়েছিল। এই সামর্থ্য ও সক্ষমতার রেশ টেনেই দেখা যায় 'সখি সংলাপ' সভার দুই সদস্য দ্যুতি ও শ্রুতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকরির ছাড়পত্র পেয়েছে এবং শ্রবণা-ও স্টাডি লিভ নিয়ে বিদেশে পড়তে যাবার আয়োজন শুরু করেছে। বোঝা যায়, নারী আর গৃহকোণে বন্দি নয় তার সামর্থ্য ও সক্ষমতা দেশের পরিধি ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

বাংলা সাহিত্যচর্চা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অসম্পূর্ণ। তিনি এমন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যার প্রভাব আরো বহু ক্ষেত্রের মতো নারীর জীবনেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাই 'মেয়েলি সংলাপ' বইটির শেষ তথা চতুর্দশ অধ্যায় 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ।' লেখিকা এই অধ্যায় নিজের স্মৃতিচারণার প্রসঙ্গে মাত্র সতেরো বছর বয়সে বাবার থেকে ২৬ খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী উপহার হিসেবে পাওয়ার আনন্দকে জীবনে যেন অখণ্ড আকাশ উন্মোচিত হবার সঙ্গে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্র রচনাবলীর সূত্রে আসে রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসের প্রসঙ্গ, যেখানে নর-নারীর সম্পর্কের নবরূপায়ন লক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে মাধ্যম থাকে মেয়েদের পড়াশোনা। 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র-

বিনোদিনীর সম্বন্ধ প্রগাঢ় হয় বঙ্কিম উপন্যাসের পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে আর 'শেষের কবিতা'র অমিত লাবণ্যর মানসিক সূক্ষ্মতারও মাঝে সেতুবন্ধন স্বরূপ থাকে জন ডানের কবিতার বই। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ আর সন্দীপের বইকেন্দ্রিক ভাবনা ভিন্নমুখী। নিখিলেশের মানসিকতা বোঝাতে আসে এমিয়েলের জার্নালের উল্লেখ, যা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। 'চতুরঙ্গ'তে দামিনীর গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের অস্ত্র হয় শ্রীবিলাসকে দিয়ে আধুনিক সাহিত্যিকদের বই আনিয়ে নেওয়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পর্যায়ে বইয়ের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সেখান থেকে ইন্টারনেট নির্ভর চ্যাট অনেকখানি ঘরে এসেছে। তবে রবি ঠাকুরের সৃজনকর্ম সম্বলিত 'ছিন্নপত্রাবলী', 'লিপিকা' বা 'পূরবী' যদি আজকের দিনে উপহার হিসেবে দেওয়া যায়, তবে প্রিয়জন খুশি হবে বলে মনে করেন সুতপা ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীর নানান সামাজিক সমস্যার দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তার নিদর্শন ছোটগল্পগুলি— পণপ্রথা ('দেনা পাওনা'), মেয়েদের অন্যায় ভাবে 'বাঁজা' বলে অপমান করা ('পুত্রযজ্ঞ'), নিম্নবর্গীয় শোষিত মানুষের অসহায়তা থেকে উদ্ভূত নির্মমতায় বলিপ্রদত্ত নারী ('শাস্তি')। এরকম প্রতিবাদ আরো অনেকের লেখায় থাকলেও রবীন্দ্রনাথের লেখায় নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ছাপ স্পষ্ট। 'স্ত্রীর পত্র'র মৃণাল, 'পহেলা নম্বর'-এর অনিলা বা 'শাস্তি'র চন্দরার মৃত্যুদণ্ড বরণের মাধ্যমে প্রতিবাদী নারীর ব্যক্তিস্বরূপ বারে বারে উন্মোচিত হয়। নাটকে নারী চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্ত্বার দুই ভিন্ন দিককে দেখাতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বিসর্জন' নাটকে অপর্ণা বাইরে নিঃস্ব ভিখারি কিন্তু অন্তরসম্পদে ঐশ্বর্যময়ী আবার গুণবতী বাইরে রাজগরবিনী অন্তরে দীন। রাজা নাটকে সুদর্শনা রাজার প্রেমাস্পদা বলে অহংকারী হয়েও বোধহীন বলে রাজার প্রকাশ বুঝতে পারে না। আর সুরঙ্গমা দাসী হয়েও অন্তর সম্পদে ঐশ্বর্যবতী। 'নটীর পূজা'র রাজকন্যা রত্নাবলী অহংকারে মুখরা আর শ্রীমতি নটী বলে অবজ্ঞার পাত্রী হয়েও অন্তর সম্পদে দৃঢ়। দুই বিপরীত ধর্মী নারী চরিত্র চিত্রনের মাধ্যমে নারীকে স্বরূপত্য চিত্রায়িত করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙালির রবীন্দ্র ভাবনা যেমন চিরন্তন, তেমনি নারী ভাবনা ব্যতীত রবীন্দ্র সাহিত্য কল্পনা করা যায় না। সে জন্যই বোধ হয় 'সখী সংলাপ'এর সদস্য শ্রবণা 'বিসর্জন', 'রক্তকরবী', 'রাজা', 'ঘরে বাইরে'-কে নিজের মতো করে ভেবে তাকে কবিতায় রূপ দিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এভাবেই তার সৃষ্টির মাধ্যমে যুগ যুগান্তর ধরে সৃষ্টিশীল নারীর হৃদয়ে নিজের স্থান করে নেবেন। তিনি ভবিষ্যৎ নারীর তথা সমগ্র মানবকুলের হৃদয়ে শাশ্বত চিরন্তন হয়ে থাকবেন বলে মনে করেন লেখিকা।

১৪ টি অধ্যায় আলোচনার শেষে বোঝা যায় লেখিকা সুতপা ভট্টাচার্য সমাজে ও সাহিত্যে মেয়েদের অবস্থানকে চিহ্নিত করতে যেমন প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ ও সমাজ দর্পণ অনুযায়ী নারীর অবস্থানকে দেখাতে চেয়েছেন, তেমনি 'সখী সংলাপ'-এ অংশগ্রহণকারী মেয়েদের আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ভাবনাক্রমকেও সজ্জিত করেছেন আলোচ্য 'মেয়েলি সংলাপ' গ্রন্থে। নারীর প্রকৃত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারক পুরুষের অংশগ্রহণ ও আইনকে তিনি স্বীকৃতি দেবার পাশাপাশি নারীকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার জন্য দায়ী করেছেন নারী পুরুষের সম্মিলিত বিকৃত মানসিকতায় সৃজিত পুরুষতন্ত্রের দাপটকে। নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা যে অনস্বীকার্য, তা তিনি অকুণ্ঠচিত্ত সমর্থন করেন। শেষ পর্যন্ত লেখিকা বিশ্বাস করেন, নারীর নিজস্ব স্বাধীনতা চিহ্নায়নের কোনো নির্দিষ্ট সময় বা গণ্ডি থাকে না, এ এক অনন্ত যাত্রা। এই যাত্রাপথের আনন্দগানে তিনি তাঁর ছাত্রীসমা ভবিষ্যৎ নারীদের সেই দায়িত্বভার তুলে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। লেখিকার সেই আহবানে সামিল হন তার পাঠককূল। সবমিলিয়ে যৌথতা-বিশ্বাস-ভালোবাসা প্রাচীনত্বের স্বীকরন আর নবীনের আত্তিকরণে সমৃদ্ধ হয় সামগ্রিক পরিক্রমা, আলোকিত হয় নারীর নিজস্ব ভুবন।

তথ্যসূত্র:

১। ভট্টাচার্য, সুতপা। লেখিকাদের লেখালেখি। ভৌমিক, তাপস (সম্পা)। কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বইমেলা সংখ্যা, জানুয়ারি— এপ্রিল ২০১৭, R.N— 41092/82, পৃ. ১০।
২। ভট্টাচার্য, সুতপা। মেয়েলি সংলাপ। প্রথম অধ্যায়। কারিগর, ২০১৩, পৃ. ১৭।
৩। ঘোষ, শাশ্বতী। 'পরিবারের অর্থনীতি'। চন্দ, পুলক (সম্পা)। "নারীবিশ্ব"। গাংচিল, ২০০৮, পৃ. ৫০০।
৪। ভট্টাচার্য, সুতপা। মেয়েলি সংলাপ। প্রথম অধ্যায়। কারিগর, ২০১৩, পৃ. ১৯।
৫। তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়। পৃ. ২৮।
৬। লাহিড়ী বড়ুয়া, সুপর্ণা। 'নারীর পৃথিবী'। "নারীর পৃথিবী নারীর সংগ্রাম"। র‍্যাডিক্যাল, জানুয়ারি- ২০১১, পৃ. ১৩।
৭। ভট্টাচার্য, সুতপা, মেয়েলি সংলাপ। তৃতীয় অধ্যায়। কারিগর, ২০১৩, পৃ. ৩০।
৮। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। 'খোলনলচে বদলে ফেলুন পরিবারের'। "স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ"। আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৬৫।
৯। https;//pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10321178
১০। বাগচি, যশোধারা। 'মাতৃত্ব ও পিতৃতন্ত্রিকতা'। চন্দ, পুলক (সম্পা)। "নারীবিশ্ব"। গাঙচিল, জুলাই ২০০৮, পৃ. ৫৫৫।
১১। ভট্টাচার্য, সুতপা। মেয়েলি সংলাপ। অষ্টম অধ্যায়। কারিগর, ২০১৩,পৃ. ৯৬-৯৭।
১২। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। 'নারী ও সংবিধান'। "পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র"। বিকাশ গ্রন্থভবন, ২০০২, পৃ. ৮২।
১৩। ভট্টাচার্য, সুতপা। মেয়েলি সংলাপ। নবম অধ্যায়। কারিগর, ২০১৩, পৃ. ১২০।
১৪। পোলিট, হ্যারি (সংকলক)। 'মেয়েদের গোলামি'। "নারী ও কমিউনিজম: মার্কস থেকে মাও"। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ডিসেম্বর ২০২২, পৃ. ২১-২২।
১৫। বিশ্বাস, অমিত রঞ্জন। 'সে পণ্য সে ঊন মানব'। চট্টোপাধ্যায়, অনিন্দ্য (সম্পা), "রোববার— প্রতিদিন", নিশির ডাক, ১৮ আগস্ট ২০২৪, পৃ. ১১।
১৬। লাহিড়ী বড়ুয়া, সুপর্ণা (সম্পা)। নারীর পৃথিবী নারীর সংগ্রাম। র‍্যাডিক্যাল, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৩-১৪।
১৭। ভট্টাচার্য, সুতপা। মেয়েলি সংলাপ। দ্বাদশ অধ্যায়। কারিগর, ২০১৩, পৃ. ১৭৪।
১৮। তদেব, ত্রয়োদশ অধ্যায়। পৃ. ১৯২।
১৯। তদেব, পৃ. ১৯২।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 637-646
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.253

কর্তব্য, ন্যায় ও সংহতি: বাংলাদেশে অধিকার- আন্দোলনে ব্যক্তির নৈতিক অংশগ্রহণের দার্শনিক ভিত্তি

কাজী মাহফুজা হক, *সহকারী অধ্যাপক, নীতিবোধ ও সমতা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

Received: 12.01.2026; Accepted: 20.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article proposes that, in the context of Bangladesh. Rawls's theory of justice and Kant's moral philosophy together form a strong foundation through which participation in the struggle to secure the rights of every citizen is not merely a political or legal entitlement, but a profound moral duty. The article argues that working toward the transformation of discriminatory structures in Bangladesh is a moral responsibility of every individual, and that fulfilling this responsibility is the pathway to building a just society.

Keywords: Moral duty, Sense of justice, Philosophy of solidarity, Rights movement, Individual moral participation

বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আজ এক গভীর বৈপরীত্যের মুখোমুখি। একদিকে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচারের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে বাস্তবে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সংগ্রাম। এই প্রেক্ষাপটে অধিকার আদায় কেবল একটি রাজনৈতিক বা আইনগত দাবিই নয়, বরং একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ, শ্রমিক ইউনিয়ন, নারী সংগঠন, কৃষক আন্দোলন এবং আদিবাসী অধিকার কর্মীদের বিভিন্ন সংগ্রাম প্রতিফলিত করে কীভাবে ব্যক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ সামষ্টিক পরিবর্তনের চাবিকাঠি হয়ে উঠতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটেই জন রলসের 'ন্যায়পরায়ণতা হিসেবে ন্যায়' তত্ত্ব এবং ইমানুয়েল কান্টের নৈতিক দর্শন প্রাসঙ্গিক আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে। রলস তার 'ন্যায় তত্ত্ব'-এ এমন একটি সামাজিক চুক্তির প্রস্তাব করেন যেখানে 'অজ্ঞানতার পর্দা' এর অন্তরালে থেকে মানুষ এমন ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করবে যা সমাজের সবচেয়ে সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য, লৈঙ্গিক অসমতা, জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা বিশ্লেষণে রলসের এই দৃষ্টিভঙ্গি গভীর তাৎপর্য বহন করে। রলসীয় ন্যায়ের দুই মূলনীতি-প্রথমত, মৌলিক স্বাধীনতার সমান অধিকার এবং দ্বিতীয়ত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য কেবল তখনই ন্যায় সঙ্গত যখন তা সবচেয়ে বঞ্চিতদের উপকারে আসে-বাংলাদেশের অধিকার আন্দোলনের জন্য একটি দার্শনিক কাঠামো সরবরাহ করে।

অন্যদিকে, ইমানুয়েল কান্টের নৈতিক দর্শন ব্যক্তির কর্তব্য ও নৈতিক বাধ্যবাধকতার প্রশ্নটিকে কেন্দ্রে স্থাপন করে। কান্টের জন্য নৈতিকতা নির্ভর করে 'শুভইচ্ছা' (good Will) এবং 'বিধিবাদী আদর্শ'

(Categorical Imperative)-এর ওপর। তাঁর দ্বিতীয় প্রণিধান- "মানুষকে কখনো কেবল মাধ্যম হিসেবে নয়, সর্বদা একই সাথে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করো"-বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ব্যক্তি মর্যাদা ক্ষুন্নের ঘটনাবলির বিরুদ্ধে একটি মৌলিক নৈতিক অবস্থান তৈরি করে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হলো কান্টের "কর্তব্য পরায়ণতার জন্য কর্তব্য" (Duty for Duty's Sake) ধারণা, যা আমাদের প্রশ্ন করতে বাধ্য করে: বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ কি আমাদের নিঃস্বার্থ নৈতিক কর্তব্য?

এই দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান নিবন্ধের মূল অনুসন্ধান হলো বাংলাদেশের অধিকার আন্দোলনে প্রত্যেক ব্যক্তির অংশগ্রহণের নৈতিক ভিত্তি কী? আমরা কি কেবল স্বার্থপর গণনার ভিত্তিতে, নাকি রলস ও কান্টের আলোকে গভীরতর নৈতিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সামাজিক পরিবর্তনে অবদান রাখি? বাংলাদেশের মতো একটি গণতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা ও ক্ষমতা কাঠামোর জটিলতা বিদ্যমান, সেখানে ব্যক্তির নৈতিক সংকল্প ও সক্রিয়তাই হয়ে উঠতে পারে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার। এই নিবন্ধ যুক্তি দেবে যে বাংলাদেশের অধিকার আন্দোলনে ব্যক্তির অংশগ্রহণ কেবল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং রলসীয় ন্যায়বিচার ও কান্টীয় কর্তব্যজ্ঞানের আলোকে একটি অপরিহার্য নৈতিক বাধ্যবাধকতা। যখন নাগরিকেরা তাদের নৈতিক দায়িত্বের প্রতি সচেতন হয়ে সম্মিলিত ভাবে কাজ করে, তখনই বাংলাদেশ তার সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি পূরণের দিকে অর্থপূর্ণভাবে এগোতে পারে।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার:

সংবিধানের ২য় অংশে (ধারা ২৬-৪৪) এসব অধিকার উল্লেখ আছে:

১. আইনের সমতা ধারা- ২৭
২. আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার ধারা- ৩১
৩. জীবনের অধিকার ধারা- ৩২
৪. কর্ম ও পেশার স্বাধীনতা ধারা- ৪০
৫. চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ধারা- ৩৯
৬. ধর্মের স্বাধীনতা ধারা- ৪১
৭. আবাসের অধিকার ধারা- ৪৩
৮. শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার ধারা- ২৩
৯. নারী-পুরুষের সমান অধিকার- ধারা ২৮
১০. মত প্রকাশের স্বাধীনতা ধারা- ৩৯
১১. নির্যাতন থেকে মুক্তি ধারা- ৩৫
১২. ধারণা ও চলাফেরার স্বাধীনতা ধারা- ৩৬
১৩. সমাবেশ ও সংগঠনের অধিকার ধারা- ৩৭-৩৮

নৈতিকভাবে স্বীকৃত মানবিক অধিকার:

১. সম্মান ও মর্যাদার অধিকার।
২. সততার সাথে আচরণ পাওয়ার অধিকার।
৩. সঠিক তথ্য জানার অধিকার।
৪. ন্যায়বিচার পাওয়ার নৈতিক অধিকার।
৫. পরিবেশ বান্ধব জীবনের অধিকার।

৬. অবস্থান অনুযায়ী ন্যায্য সুযোগের অধিকার।

৭. শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহারের অধিকার।

৮. নৈতিক মত প্রকাশের অধিকার।

৯. অসুস্থ, বৃদ্ধ, শিশুদের জন্য সুরক্ষা পাওয়ার নৈতিক অধিকার।

সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার গুলো আইনত রক্ষিত, এবং নৈতিক অধিকার গুলো মানুষ হিসেবে আমাদের সম্মানজনক ও মানবিক আচরণ পাওয়ার দাবি তুলে ধরে। দুটোই ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গঠনে অপরিহার্য।

কান্টের নৈতিক কাঠামো:

ইমানুয়েল কান্টের নীতিশাস্ত্র 'বিধিবাদী আদর্শ' (Categorical Imperative) এবং 'শুভ ইচ্ছা' (good Will) এর উপর প্রতিষ্ঠিত। তার দ্বিতীয় প্রণিধানে তিনি বলেন "মানুষকে-তোমার নিজের ব্যক্তিসত্তা বা অন্য কারও কখনো কেবল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করোনা, বরং সর্বদা একই সাথে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করো।" বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকার ও মানুষের নৈতিক অধিকার কিছু ক্ষেত্রে একে অপরকে সমর্থন করে, আবার কিছু ক্ষেত্রে নৈতিক অধিকার গুলো আইনি রূপ পায়নি, কিন্তু নৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

কান্টের মূলনীতি:

১. কর্তব্য পরায়ণতার জন্য কর্তব্য (Duty for Duty's Sake) স্বার্থ বা ফলাফল নয়, নৈতিক নীতিই একমাত্র নির্ধারক।

২. সর্বজনীনতা- যে নীতি অনুসরণ করছি, তা সমগ্র মানব জাতির জন্য আইন হওয়া উচিত কিনা।

৩. মানুষকে লক্ষ্য মানুষকে কখনো মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার না করা।

ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক দায়িত্বের দ্বন্দ্ব: কান্টীয় দৃষ্টিকোণে বাংলাদেশী প্রেক্ষাপট:

পরিবেশ দূষণ ও শিল্পায়ন:

পরিস্থিতি: একটি ট্যানারি মালিক সাভারে তার কারখানার বর্জ্য সরাসরি নদীতে ফেলেন, কারণ বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ ব্যয়বহুল এবং লাভ কমাবে।

ব্যক্তিগত স্বার্থ: উৎপাদন খরচ কমানো, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা, সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন সামাজিক দায়িত্ব: পরিবেশ সংরক্ষণ, নদীর পানিতে নির্ভরশীল মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংরক্ষণ।

কান্টীয় বিশ্লেষণ:

বিধিবাদী আদর্শের পরীক্ষা: 'প্রতিটি শিল্প মালিককি তার বর্জ্য নদীতে ফেলতে পারবে?' এটি সর্বজনীন নিয়ম হলে সমস্ত নদী দূষিত হয়ে যাবে, যা অযৌক্তিক।

মানুষকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার: নদীর পানি ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়ে ট্যানারি মালিক মানুষকে মুনাফা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে।

কর্তব্য পরায়ণতার জন্য কর্তব্য: পরিবেশ সংরক্ষণ কেবল আইন মানার জন্য নয়, বরং নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে পালন করা উচিত। (কান্টের গ্রাউন্ডওয়ার্ক ফর দ্য মেটাফিজিক্স অফ মোরালস (১৭৮৫), দ্বিতীয় বিভাগ)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বাণিজ্য:

পরিস্থিতি: একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা তার অযোগ্য সন্তানকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানোর জন্য প্রভাব খাটান।

ব্যক্তিগত স্বার্থ: সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা, সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখা, পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষা।

সামাজিক দায়িত্ব: মেধা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, যোগ্য প্রার্থীদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা, প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

কান্টীয় বিশ্লেষণ:

সর্বজনীনতা পরীক্ষা: "প্রতিটি পিতা মাতা কি তাদের সন্তান দের জন্য বিশেষ সুবিধা দাবি করতে পারবে?" এটি সর্বজনীন নিয়ম হলে সমাজের যোগ্যতা ব্যবস্থা ধ্বংস হবে।

অন্যকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার: মেধাবী কিন্তু প্রভাবহীন শিক্ষার্থীদের তাদের ন্যায্য স্থান থেকে বঞ্চিত করে তাদের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

শুভ ইচ্ছা: প্রকৃত শুভ ইচ্ছা হলো ন্যায়পরায়ণ প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, ব্যক্তিগত সুবিধানয়। (কান্টের ক্রিটিক অফ প্র্যাকটিক্যালরিজন (১৭৮৮), প্রথম বই।)

কর ফাঁকি ও সম্পদ পাচার:

পরিস্থিতি: একজন ব্যবসায়ী বিদেশে সম্পদ পাচার করেন এবং কর ফাঁকি দেন, যেখানে ঐ কর রাজস্ব স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়ার কথা।

ব্যক্তিগত স্বার্থ: সম্পদ বৃদ্ধি ও সুরক্ষা, করের বোঝা কমানো, ব্যক্তিগত বিলাসিতা।

সামাজিক দায়িত্ব: রাষ্ট্রীয় সম্পদে অবদান, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অর্থায়ন, সামাজিক সমতা উন্নয়ন।

কান্টীয় বিশ্লেষণ:

বিধিবাদী আদর্শ: "প্রতিটি নাগরিক কি কর ফাঁকি দিতে পারবে?" এটি সর্বজনীন নিয়ম হলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ধ্বংসহবে।

সমাজকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার: সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া।

স্বাধীন ইচ্ছা: প্রকৃত স্বাধীন ইচ্ছা হলো যুক্তি সম্পর্কতায় পরিচালিত হওয়া, যা কর্তব্য পালনের দিকে পরিচালিত করে।

উদাহরণ: বাংলাদেশে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের সংকট (৩.৫ লাখ কোটি টাকার বেশি) ব্যক্তিগত স্বার্থে ঋণ নেওয়া এবং পরিশোধ না করা সামাজিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ধ্বংসকরছে। (কান্টের দ্য মেটাফিজিক্স অফ মোরালস (১৭৯৭), আইনতত্ত্ব বিভাগ)

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা:

পরিস্থিতি: একজন চিকিৎসক সরকারি হাসপাতালে কর্মরত থাকার সময় অতিরিক্ত আয়ের জন্য ব্যক্তিগত চেম্বারে বেশিসময় দেন, সরকারি দায়িত্বে অবহেলা করেন।

ব্যক্তিগত স্বার্থ: আয়বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত খ্যাতি, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

সামাজিক দায়িত্ব: সরকারি হাসপাতালের রোগীদের সেবা নিশ্চিত করা, দরিদ্র রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি, পাবলিক হেলথ সিস্টেমের কার্যকারিতা।

কান্টীয় বিশ্লেষণ:

মানুষকে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা: সরকারি হাসপাতালের রোগীরা যারা সেবা পাচ্ছেনা, তারা চিকিৎসকের ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধিও মাধ্যম মাত্র।

কর্তব্যের দ্বন্দ্ব: চিকিৎসকের কর্তব্য প্রথমত তার নিয়োগকর্তা (সরকার) ও সাধারণ জনগণের প্রতি, যারা তাকে সেই অবস্থানে বসিয়েছে।

শুভ ইচ্ছা: প্রকৃত শুভ ইচ্ছা হলো পেশাদার দায়িত্ব পালন, আয়ের সম্ভাবনা নয়। (কান্টের লেকচার্স অন এথিক্স (১৭৭৫-১৭৮০)

কান্টীয় সমাধান: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা:

১. নৈতিক নীতির অগ্রাধিকার: কান্ট যুক্তি দিতেন যে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক দায়িত্বের দ্বন্দ্বে নৈতিক নীতিই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হওয়া উচিত, স্বার্থ বা ফলাফল নয়। বাংলাদেশে দুর্নীতি ও স্বার্থপরতার যে সংস্কৃতি, তা কান্টের দৃষ্টিতে নৈতিক ব্যর্থতা।

২. প্রতিফলনশীল যুক্তি সম্পর্ক: কান্টের "স্বয়ং-নির্ধারিত আইন" (Autonomy) ধারণা অনুযায়ী, প্রতিটি ব্যক্তি যুক্তি সম্পর্ক সত্তা হিসেবে নিজেই নৈতিক নীতি নির্ধারণ করে এবং তা মেনেচলে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর অর্থ: আমলাতন্ত্রে স্বচ্ছতা, ব্যবসায়িক নৈতিকতা, পেশাদার দায়িত্ব পালন।

৩. সর্বজনীন নাগরিক কর্তব্য: কান্টের প্রতিশান্তি (Perpetual Peace) গ্রন্থে তিনি বিশ্ব নাগরিকত্ব (Cosmopolitanism) ধারণার প্রস্তাব করেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগ: জাতীয়তাবাদী চেতনার বাইরে গিয়ে বৈশ্বিক নাগরিকের দায়িত্ব, পরিবেশ, মানবাধিকার, ন্যায়বিচারের প্রতি দায়িত্ব, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংরক্ষণ।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কান্টের প্রাসঙ্গিকতা:

চ্যালেঞ্জ:

১. ব্যক্তি কেন্দ্রিক সমাজ: বাংলাদেশে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রায়ই সামাজিক দায়িত্বের উপর প্রাধান্য পায়।

২. ফলাফল কেন্দ্রিক নৈতিকতা: 'সাফল্য'র সংজ্ঞা মুনাফা ও ক্ষমতা নির্ভর, নৈতিকতা নির্ভর নয়।

৩. দায়িত্ব জ্ঞান হীনতা: প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উভয় ক্ষেত্রে দায়িত্ব জ্ঞান হীনতার সংস্কৃতি।

সম্ভাবনা:

১. নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি: কান্টের দর্শন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতা শিক্ষার ভিত্তি হতে পারে।

২. পেশাদার নৈতিকতা: চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনজীবী, আমলাদের জন্য পেশাদার নৈতিকতা কোড।

৩. কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা: শুধু আইনি দায় নয়, নৈতিক দায়িত্ব পালন।

কান্টের দর্শন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কারণ এটি সরাসরি মোকাবেলা করে সেই ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা যা দেশের সামাজিক কাঠামোকে দুর্বল করছে। কান্টের 'কর্তব্য পরায়ণতার জন্য কর্তব্য' ধারণা একটি শক্তিশালী প্রতিকার প্রদান করে, যেখানে সামাজিক দায়িত্ব পালন ব্যক্তিগত সুবিধার হিসাব নয়, বরং নৈতিক বাধ্যবাধকতা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কান্টের দর্শনের সফল প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন:

১. নৈতিক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ২. সামাজিক মূল্যবোধ পুনর্গঠন ৩. দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের সংস্কৃতি তৈরি। কান্ট স্মরণ করিয়ে দিতেন যে সত্যিকারের স্বাধীনতাহলো যুক্তির নির্দেশনা অনুসরণ করার ক্ষমতা, এবং এই যুক্তিই আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সামাজিক দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই কান্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য।

সামষ্টিক কল্যাণের জন্য ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব: রলসীয় দৃষ্টিকোণে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট:

রলসীয় মূলনীতি:

ন্যায়ের দুই মূলনীতি: প্রথম নীতি প্রত্যেকের সমান মৌলিক স্বাধীনতার অধিকার, দ্বিতীয় নীতি: সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা শুধুমাত্র তখনই গ্রহণযোগ্য যখন: ক) এটা সবচেয়ে কম সুবিধা প্রাপ্তদের জন্য সর্বোচ্চ সুবিধা বয়ে আনে (ভেদ-নীতি), খ) সকলের জন্য সমান সুযোগের সাথে সংযুক্ত।

অজ্ঞানতার পর্দা: ন্যায়নীতি নির্ধারণের সময় ব্যক্তি নিজের সামাজিক অবস্থান, শ্রেণী, ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে।

রলসের দৃষ্টিতে সামষ্টিক কল্যাণের জন্য ব্যক্তির দায়িত্ব:

ন্যায়পরায়ণতা ও পারস্পরিকতা: রলসের মতে, ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠনের জন্য ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক দায়বদ্ধতা প্রয়োজন। তিনি বলেন "ন্যায়পরায়ণ সমাজ এমন একটি সমাজ যেখানে প্রতিটি সদস্য উপলব্ধি করে যে তাদের অর্জন গুলো সামাজিক সহযোগিতার ফল।"

ন্যায়ের প্রাকৃতিক দায়িত্ব: রলস ন্যায়ের প্রাকৃতিক দায়িত্ব ধারণা প্রস্তাব করেন যা দুটি অংশে বিভক্ত ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার দায়িত্ব, ন্যায় বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের দায়িত্ব।

সবচেয়ে কম সুবিধা প্রাপ্তদের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব: রলসের ভেদ-নীতির মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করা ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রলসীয় বিশ্লেষণ: উদাহরণ ও প্রয়োগ

উদাহরণ ১: শিক্ষাব্যবস্থা ও সমান সুযোগ

পরিস্থিতি: বাংলাদেশে শিক্ষার ব্যয়বহুল বেসরকারি খাতএবং দুর্বল সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে দরিদ্র শিশুরা গুণগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।

রলসীয় বিশ্লেষণ: অজ্ঞানতার পর্দার পরীক্ষা: যদি আমরা নাজানি আমরা কোন পরিবারে জন্মাব, তবে আমরা এমন শিক্ষাব্যবস্থা চাইব যা সবচেয়ে দরিদ্র শিশুদের জন্য সর্বোত্তম সুযোগ প্রদান করে।

সমতার সুযোগ নীতি লঙ্ঘন: বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা রলসের দ্বিতীয় নীতির অংশ লঙ্ঘন করে।

সামাজিক সহযোগিতার ধারণা: শিক্ষিত নাগরিকরা যে সামাজিক সুবিধা ভোগকরেন তা সমগ্র সমাজের অবদান।

ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব: সক্ষম ব্যক্তিদের সরকারি শিক্ষায় অর্থায়ন/স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে অবদান রাখা, শিক্ষা নীতি পরিবর্তনের জন্য সক্রিয়তা। (এ থিওরি অফ জাস্টিস, ১৩: "সামাজিক সহযোগিতার ধরণা")

উদাহরণ ২: স্বাস্থ্য সেবার অসম বণ্টন

পরিস্থিতি: বাংলাদেশে বেসরকারি হাসপাতালে উচ্চমানের চিকিৎসা শুধুমাত্র ধনী পরিবারের জন্য সুলভ, যখন সরকারি হাসপাতাল গুলো ভর্তি ও মানের সংকটে ভোগে।

রলসীয় বিশ্লেষণ: ভেদ-নীতি পরীক্ষা: স্বাস্থ্যখাতের অসমতা কি সবচেয়ে দরিদ্রদের জন্য সর্বোত্তম সুবিধা দেয়? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে না।

মৌলিক অধিকারের স্বাস্থ্য: রলস মৌলিক অধিকারের তালিকায় স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে যুক্তি দেন।

সামাজিক প্রাথমিক সম্পদ: স্বাস্থ্য একটি সামাজিক প্রাথমিক সম্পদ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত।

ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব: চিকিৎসকদের সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় অবদান রাখার নৈতিক দায়, ধনী ব্যক্তিদের জনস্বাস্থ্য প্রকল্পে অর্থায়নের দায়। (জাস্টিস অ্যাজ ফেয়ারনেস, "সামাজিক প্রাথমিক সম্পদ" অধ্যায়)

উদাহরণ ৩: নগর উন্নয়ন ও বস্তিবাসী

পরিস্থিতি: ঢাকার নগর উন্নয়ন প্রকল্প গুলো প্রায়ই বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করে, যাদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল।

রলসীয় বিশ্লেষণ:

অজ্ঞানতার পর্দা: আমরা যদি না জানি আমরা বস্তিতে জন্মাব নাকি ধনী পরিবারে, তবে আমরা এমন উন্নয়ন নীতি চাইব যা সবচেয়ে দুর্বলদের রক্ষা করে।

ন্যায় পরায়ণতা নীতি: বস্তি বাসীদের প্রান্তিক করণ রলসের প্রথম নীতি (মৌলিক স্বাধীনতা) লঙ্ঘন করে।

সমষ্টির কল্যাণ: প্রকৃত সমষ্টির কল্যাণ সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণের উপর নির্ভর করে।

ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব: নগর নাগরিকদের বস্তিবাসীদের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার হওয়া, উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি মূলক নীতি প্রণয়নে চাপ তৈরি করা। (এ থিওরি অফ জাস্টিস, ২৬: "ন্যায়পরায়ণতা ও সার্বজনীন কল্যাণ")।

উদাহরণ ৪: জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রান্তিক কৃষক

পরিস্থিতি: বাংলাদেশের প্রান্তিক কৃষকরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ভোগ করছেন, যদিও তাদের অবদান নগণ্য।

রলসীয় বিশ্লেষণ:

প্রজন্মান্তর ন্যায়: রলস 'ন্যায়ের সঞ্চয় নীতি' প্রস্তাব করেন যেখানে বর্তমান প্রজন্ম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ন্যায়পরায়ণ ব্যবস্থা রেখে যায়। আন্তঃপ্রজন্মীয় ন্যায়: জলবায়ু পরিবর্তনের বোঝা অসম ভাবে বহন করা আন্তঃপ্রজন্মীয় ন্যায়ের লঙ্ঘন।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সর্বোচ্চ সুবিধা: জলবায়ু ন্যায়ের ক্ষেত্রে রলসের নীতির প্রয়োগ।

ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব: নগর বাসিন্দাদের জলবায়ু অভিযোজন তহবিলে অবদান, টেকসই জীবন যাপনের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানো। (এ থিওরি অফ জাস্টিস, ৪৪: "আন্তঃপ্রজন্মীয় ন্যায়ের সমস্যা")

রলসের তত্ত্বে ব্যক্তির চারটি স্তরের দায়িত্ব (বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে):

স্তর ১: আইনমান্য করার দায়িত্ব। রলস: "ন্যায়পরায়ণ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনেচলা"।

বাংলাদেশী উদাহরণ: কর প্রদান, পরিবেশ আইনমানা।

স্তর ২: ন্যায় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব। রলস: "ন্যায় বহির্ভূত আইন/প্রথা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা" বাংলাদেশী উদাহরণ: নারী বান্ধব আইনের জন্য আন্দোলন, দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম।

স্তর ৩: সামাজিক সহযোগিতার দায়িত্ব। রলস: "সামাজিক প্রাথমিক সম্পদের ন্যায় পরায়ণ বণ্টনে অবদান"।

বাংলাদেশী উদাহরণ: বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সরকারি স্বাস্থ্য সেবায় অবদান।

স্তর ৪: পারস্পরিকতার দায়িত্ব। রলস: "সামাজিক সুবিধা ভোগীদের সামাজিক দায়িত্ব"।

বাংলাদেশী উদাহরণ: বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে চ্যালেঞ্জ:

১. পারিবারিকতা বনাম সামাজিক দায়িত্ব: বাংলাদেশে পারিবারিক দায়িত্ব প্রায়ই সামাজিক দায়িত্বের চেয়ে প্রাধান্য পায়।

রলসীয় সমাধান: রলসের 'ন্যায় পরায়ণতা' ধারণা পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য তৈরিতে সাহায্য করে।

২. ধর্মীয় দান বনাম ন্যায়পরায়ণ পুনর্বন্টন: জাকাত ও ধর্মীয় দান ব্যক্তিগত পর্যায়ে হয়, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বণ্টন ব্যবস্থা দুর্বল।

রলসীয় বিশ্লেষণ: রলস প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায়ের উপর জোর দেন, যা ব্যক্তিগত দানের চেয়ে বেশি টেকসই।

৩. রাষ্ট্র-কেন্দ্রিকতা বনাম ব্যক্তি দায়িত্ব: বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব প্রায়ই রাষ্ট্রের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

রলসের অবস্থান: রলসের মতে, ন্যায় পরায়ণ সমাজ গঠনে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়েরই দায়িত্ব আছে।

রলসের ন্যায় তত্ত্ব বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কারণ এটি সরাসরি মোকাবেলা করে: ১. চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য ২. সামাজিক প্রান্তিক করণ ৩. প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা।

রলসের 'অজ্ঞানতার পর্দা' চিন্তন কৌশল বাংলাদেশী নাগরিকদের তাদের নিজেদের সামাজিক অবস্থান ভুলে গিয়ে। এমন নীতি সমূহ চিন্তা করতে সাহায্য করতে পারে যা সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষের জন্য সবচেয়ে ভালো। এই দৃষ্টি ভঙ্গি অনুসারে, বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব হলো: ১. নিজের সুবিধার উৎস হিসাবে সামাজিক সহযোগিতা চিহ্নিত করা। ২. সবচেয়ে প্রান্তিকদের অবস্থার উন্নতিতে অবদান রাখা। ৩. ন্যায়পরায়ণ প্রতিষ্ঠান গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা। রলসের শেষ কথাই বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে "ন্যায়পরায়ণ সমাজ গড়ে ওঠে না স্বার্থপর ব্যক্তিদের মাধ্যমে, বরং সেই সব নাগরিকদের মাধ্যমে যারা বুঝতে পারে যে তাদের নিজের সমৃদ্ধি সমগ্র সমাজের সমৃদ্ধির সাথে গভীরভাবে যুক্ত।" বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে এই রলসীয় উপলব্ধি অপরিহার্য ব্যক্তির সমৃদ্ধি ও সামষ্টিক কল্যাণ একটি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

বাংলাদেশের সংবিধান ও নাগরিক দায়িত্বের সাথে দার্শনিক নীতি রসাদৃশ্য বিশ্লেষণ:

বাংলাদেশের সংবিধান কেবল একটি আইনি দলিল নয়, এটি একটি দার্শনিক-নৈতিক চুক্তির প্রতিফলন। এর বিভিন্ন, অনুচ্ছেদ ও নীতিমালায় ক্লাসিকাল ও আধুনিক দার্শনিক চিন্তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

রলসীয় ন্যায় তত্ত্বের সাথে সাদৃশ্য:

অজ্ঞানতার পর্দা ও সামাজিক ন্যায় বিচার বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং তৃতীয় ভাগ (মৌলিক অধিকার) রলসের "অজ্ঞানতার পর্দা" ধারণার প্রতিফলন: "রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণ মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকসাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"

রলসীয় প্রতিধ্বনি: রলসের "ন্যায়পরায়ণতা" ধারণার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

সাদৃশ্য বিশ্লেষণ: বাংলাদেশের সংবিধান রলসের ন্যায় তত্ত্ব সাদৃশ্য

অনুচ্ছেদ ১৯: সমান সুযোগ সমান স্বাধীনতার নীতি উভয়ই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা হ্রাসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অনুচ্ছেদ ২৭-২৯: সাম্যের অধিকার ভেদ-নীতি (Difference Principle) সবচেয়ে কম সুবিধা প্রাপ্তদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি।

অনুচ্ছেদ ১৫: মৌলিক প্রয়োজনের অধিকার সামাজিক প্রাথমিক সম্পদ মৌলিক প্রয়োজন পূরণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব। উদাহরণ: অনুচ্ছেদ ১৫(ক)-এ "মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা" রলসের "সামাজিক প্রাথমিক সম্পদের" ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কান্টীয় নৈতিকতার সাথে সাদৃশ্য:

ব্যক্তি মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসন: বাংলাদেশের সংবিধান ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদার উপর যে গুরুত্ব দেয় তা কান্টের নীতিশাস্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সাংবিধানিক বিধান

অনুচ্ছেদ ৩১: "জনসাধারণের অন্য কাহারও জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির অর্থনৈতিক ক্ষতি করিতে পারিবেন না।"

অনুচ্ছেদ ৪১: ধর্মীয় স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ ৩৯: চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা।

কান্টীয় সাদৃশ্য: কান্টের "বিধিবাদী আদর্শের" দ্বিতীয় প্রণিধান: "মানুষকে কখনো মাধ্যম হিসেবে নয়, সর্বদা লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করো" সংবিধানের মৌলিক অধিকার ধারাগুলো প্রতিটি নাগরিককে স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। উদাহরণ: অনুচ্ছেদ ৩২-এ 'জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার' কান্টের "মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্য" ধারণার আইনি অভিব্যক্তি।

দার্শনিক ভিত্তি:

কান্টের কর্তব্য নীতি: কর্তব্যপরায়ণতা দেশপ্রেম ও আইনমান্য করা। "নৈতিক আইন" হিসেবে সংবিধান মান্য করা।

রলসের ন্যায়ের প্রাকৃতিক দায়িত্ব: ন্যায়প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার দায়িত্ব। সংবিধান রক্ষায় নাগরিকের ভূমিকা।

উপসংহার:

বাংলাদেশের জন্য এই নিবন্ধটি একটি কার্যকর রূপকল্প বাংলাদেশের গণ-অংশ গ্রহণের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তিনটি স্তম্ভের উপর-

১. নৈতিক ভিত্তি: কান্টের কর্তব্যবোধ ও রলসের ন্যায়পরায়ণতার চেতনা।

২. ব্যবহারিক কাঠামো: প্রাতিষ্ঠানি কসংস্কার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

৩. সাংস্কৃতিক রূপান্তর: দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন।

বাংলাদেশের সংবিধান ইতিমধ্যেই এই পরিবর্তনের আইনি ভিত্তি প্রদান করে। এখন প্রয়োজন এর দার্শনিক চেতনা কে ব্যবহারিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রূপান্তর। কান্ট ও রলসের ধারণা কোনো বিমূর্ত দার্শনিক তত্ত্ব নয় এগুলো বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য একটি ব্যবহারিক রোড ম্যাপ যা তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গণ অংশগ্রহণ কেবল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি নৈতিক অনুশীলন যা বাংলাদেশকে তার সাংবিধানিক আদর্শের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। এই পথ সুগম করার দায়িত্ব রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয়েরই, যেখানে রলসের "সামাজিক সহযোগিতা" এবং কান্টের "নৈতিক সম্প্রদায়"-এর ধারণা বাস্তবে রূপ পেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

1. Kant, I. (1997). *Critique of Practical Reason* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1788).
2. Kant, I. (1998). *Critique of Pure Reason* (P. Guyer & A. W. Wood, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1781/1787).
3. Kant, I. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1785).
4. Kant, I. (2000). *Critique of the Power of Judgment* (P. Guyer & E. Matthews, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1790).

5. Kant, I. (2002). *Groundwork for the Metaphysics of Morals* (A. W. Wood, Trans.). Yale University Press. (Original work published 1785).
6. Kant, I. (2004). *Prolegomena to Any Future Metaphysics* (G. Hatfield, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1783).
7. Kant, I. (n.d.). *The Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1797).
8. Khalek, A. S. M. Abdul. (n.d.). *সামাজিক ন্যায়বিচার ও জন রলস.* নভেল পাবলিশিং হাউস।
9. Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
10. Rawls, J. (1993). *Political Liberalism*. Columbia University Press.
11. Rawls, J. (1999). *The Law of Peoples*. Harvard University Press.
12. Rawls, J. (2001). *Justice as Fairness: A Restatement*. Harvard University Press.

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 647-655
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.254

বাংলার ঘর-গৃহস্থালি ও চাকর-বাকর: দাসবৃত্তির ইতিহাস ও পরিণতি বিষয়ক একটি তথ্যগত সংক্ষিপ্ত আলোচনা

তুলিকা বণিক, *গবেষক, ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 01.12.2025; Accepted: 20.12.2025; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper critiques the history, structure, and socio-cultural implications of domestic servitude in colonial Bengal, situating it within global patterns of household labour. This discussion highlights how servants historically mediated the macro-structures of political and economic power and the micro-structures of everyday domestic life. The essay examines how industrialisation, demographic shifts, and the spread of Victorian ideals reshaped household arrangements in India during the nineteenth century.

The analysis traces India's older traditions of servitude—from epic literature, temple culture, and feudal households—to the emergence of "jhī–chākar" as a regular presence in middle-class Bengali homes. It demonstrates how caste, gender, religion, region, and racial hierarchies structured the recruitment and treatment of servants, producing multilayered inequalities even within servant groups. It explores how domestic work, especially for women, often involves not only physical labour but also sexual vulnerability, reinforced by the employer's social and economic power. To theorise servitude in this paper, the essay draws on literary and cinematic examples from Rabindranath Tagore's memoirs as well as Bengali films such as Deya-Neya, Puja, and Galpo Holeo Sotyi. It explores the cultural representation of servants as comic figures, romantic impossibilities, loyal caregivers, and even moral agents. These portrayals underscore the tension between dependency and distance characterising servant–master relationships, and unspoken hierarchies that continue to shape contemporary domestic labour in South Asia.

Keywords: Servant, Master, Domestic servitude, Inequality, Hierarchy

মাইকেল টসিগ ও অ্যান রাব্বোর ভাষায় "Servants become the essential link between macro-structure of political life and the micro-structure of domestic and personal experience which prepares and sustains people for their roles in society." (টসিগ ও রাব্বো, ৫-৬) অর্থাৎ এই বৃহত্তর সামাজিক পরিকাঠামোতে চাকর বা দাস একটি প্রয়োজনীয় সংযোগ মাধ্যম। তবে এই প্রয়োজনীয়তার সূচনাবিন্দু কিরূপ বা কিভাবে এই প্রয়োজনীয়তা সকল মানুষের রন্ধে একইসাথে কিন্তু বিভিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার আলোচনা করা দরকার। তবে এই গৃহকর্ম ও গৃহকর্মীর প্রয়োজনীয়তা মূলত বিশ্বব্যাপী (world-wide pattern of domestic service) (রোলিনস, ৪৪) এবং এই ব্যবস্থাপনা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্নধারায়। তবে ভারতবর্ষে প্রাথমিকভাবে এই দাসব্যবস্থা

এবং পরবর্তীতে গৃহকর্মীর নিয়োগ প্রভৃতির সূত্রপাত কখন ও কিভাবে, সেই ইতিহাস ঘাটলে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ করা এবং ঠিক কি কারণে বা কোন প্রভাবে এই প্রভু-দাস সম্পর্কের উত্থান তা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। রসতত্ত্বের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাতে 'দাস্য' একটি গুরুত্বপূর্ণ রস এবং এই রসের গুরুত্ব কিরূপ তা *রামায়ণে* রাম-হনুমানের সম্পর্কে দৃশ্যমান। এমনকি বর্ণাশ্রমপ্রথানুযায়ী সমাজের একশ্রেণীর মানুষ (ঋকবেদানুসারে কার্যসূত্রে এবং উপনিষাদানুসারে জন্মসূত্রে) আগাগোড়াই সমাজের অন্যশ্রেণীর মানুষের পরিচর্যা ও সেবায় লিপ্ত ছিল। তবে সময়ের সাথে সাথে সমাজের এই পিরামিডাকৃতি কাঠামোর মজ্জাগত ও গঠনভিত্তিক বিপুল পরিবর্তন ঘটে চলেছে এবং এই ঘটমান পরিবর্তনই দাসব্যবস্থার আদিমসত্ত্বার আমূল কিছু পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

এই লেখনি তাই মূলত উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঔপনিবেশিক বাংলার গৃহকেন্দ্রিক দাসব্যবস্থা, বিশেষত গৃহকর্মী (তৎকালীন সমাজে 'ঝি-চাকর') ও সমাজে তাদের অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কিত বিবিধ তথ্যের বিশ্লেষণাত্বক একটি দলিল। সেই সময়ে এই প্রভু ও দাসের সম্পর্ক কিরূপ ছিল এবং কিভাবে তা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে প্রভাবিত করে তা আলোচনা করা এই লেখনীর অন্যতম এক উদ্দেশ্য। এই লেখনীতে প্রাথমিক ভাবে শিল্পায়ণ ও তার প্রভাবে ঔপনিবেশিক ভারতে দাসব্যবস্থার গতিবিধির পরিবর্তন, দাস বলে তৎকালীন বাংলায় কি বোঝা হত, তাদের অবস্থানগত তারতম্য, প্রকৃতি ও সাহিত্যে বা পপুলার কালচারে তার কি প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তার একটি আলোচনা তুলে ধরা হল।

শিল্পায়ণ, সমাজ ও দাস:

ডেভিড চ্যাপলিন তাঁর বই *ডমেস্টিক সার্ভিস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইসেশন: কম্পারেটিভ স্টাডি অফ সোশিওলজি-*তে দাস ও শিল্পায়ণের যোগসূত্র নিরিখে পাঠকদের জন্য কিছু প্রশ্ন তুলে ধরে তার যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন যে দাসব্যবস্থা প্রাক-শিল্পায়ণের ফসল কিনা কিংবা তাই যদি হয় তাহলে শিল্পায়ণ, মূলত ইউরোপের ক্ষেত্রে (১৭৮০র দশক-১৮৪৯) অর্থনৈতিক যে পরিবর্তন এনেছিল তার সাথে সামন্তরিক কিনা। শিল্পায়ণ ও প্রাক-শিল্পায়ণের সময় চলতে থাকা অর্থনৈতিক দোলাচল, বাজার মন্দা প্রভৃতির কারণে যদি দাসব্যবস্থার বিস্তার হয়ে থাকে তাহলে তা কি ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে কি দাসব্যবস্থা মুছে যাবে? যদি দাস ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় সেক্ষেত্রে যারা অন্যের চাকর বা দাস হিসাবে বহুকাল নিযুক্ত থাকলো তাদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা কিরূপ? (চ্যাপলিন, ১২৭)

ইউরোপে শিল্পায়ণের হাত ধরে অর্থনীতির যে ঋণাত্বক পরিবর্তন অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে এসেছিল, তার সূত্রপাত বলা চলে ইউরোপে ঘটে যাওয়া বিপুল জনচ্ছাস। (১৭৫০ থেকে ১৮০০) সমগ্র মহাদেশে, বিশেষত ব্রিটেনে শতকরা মোট পঞ্চাশ থেকে নব্বই ভাগ জনসংখ্যা বৃদ্ধির নজির পাওয়া যায়। খাদ্যসংকট, মহামারি, দুর্ভিক্ষের কারণে নাজেহাল ইউরোপীয়বাসী তখন গ্রাম থেকে উঠে এসে ভিড় জমাতে লাগল শহরের বুকে কাজের আশায়। একে একে কারখানা গড়ে উঠলন। নানা পেশায়, মূলত দিনমজুর ও বেগার-খাটুনে হিসাবে মানুষ কাজে লাগতে শুরু করলো এবং ফলস্বরূপ উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পেল, তখন অর্থনৈতিক অবস্থার ধণাত্বক পরিবর্তন হতে দেখা গেল যাকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ আর্নল্ড টবি (১৮৫২-৮৩) নাম দিলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। ইউরোপে বেড়ে ওঠা এই উন্নয়নের ছাপ ধীরে ধীরে পড়তে শুরু ভারত সহ ইউরোপের অনান্য উপনিবেশগুলিতেও। ভারতে দাসব্যবস্থার বীজ আগাগোড়াই রোপিত ছিল এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসার পর, চা-কর্মী, নীলচাষী, জাহাজের খালাসী, কুলি প্রভৃতি বিভিন্ন পরিচয়ে, বিভিন্ন কাজের বাবদে প্রচুর মানুষকে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে একজায়গা থেকে অন্য

জায়গায় আদান-প্রদান করা হয়। তবে আফ্রিকাতে যেভাবে দাস হিসাবে মানুষ কেনা-বেচার প্রথা চালু ছিল, তা ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না তাই লিখিতরূপে ভারতীয় দাসবৃত্তির নজির খানিক কম। তবে গৃহস্থালির কর্মে নিপুণা সাহায্য কর্মী বা ততকালীন বাংলায় চাকর হিসাবে পরিচিত মানুষদের জীবনযাত্রা বিষয়ক কিছু লেখাপত্র আছে।

সেই সকল দলিল ঘাটলে দেখা যাবে ঘরের কাজ করার জন্য নিযুক্ত মানুষের উল্লেখ সেই মহাকাব্যের সময় থেকেই পাওয়া যায়। এমনকি গুরুকূলে শিষ্যরা তাদের গুরু ও গুরুমাতাকে সাহায্য করার জন্য ঘর-গৃহস্থালির কাজকর্ম ও গুরুর সেবায় নিজেদের নিযুক্ত রাখত। এছাড়া সুলতান-রাজাদের হারেম কিংবা প্রাসাদেও দাস-দাসীরা থাকত। এমনকি হিন্দু মন্দিরে দেবদাসীর উপস্থিতি বিষয়েও নানা তর্ক-বিতর্ক পরবর্তীতে উঠে আসে। খুব খেয়াল করলে দেখা যাবে এই দাস-দাসীর বিলাসিতা মূলত সীমাবদ্ধ ছিল প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর মহলে। সাধারণ মানুষের এই বিলাসিতার সুযোগ ছিলনা। কিন্তু ভারতে তথা বাংলায় উনিশ শতকের অন্তিমভাগে স্বল্প সম্ভ্রামশালী ঘরে একটি করে ঝি বা চাকর রাখার যে প্রবণতা দেখা যায় তা মূলত ইউরোপীয় জীবনযাত্রার অন্যতম প্রভাব। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে যাকে বলা হয় ভিক্টোরিয়ান এজ (১৮৩৭-১৯০১), সেই সময়কার সাহিত্যে "longing" অর্থাৎ অপেক্ষা একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ আখ্যানবস্তু। ডেভিডঅফ এবং হলের মতে উনিশ শতকের মধ্যভাগে পশ্চিমে "the separation of sphere", (ডেভিডঅফ, ৪১৫-৪২৮) যার আক্ষরিক অনুবাদ "পরিমন্ডলের প্রভেদ", নামক একটি নতুন ধারণার জন্ম হয়। পারিমান্ডলিক এই বিভাজন মূলত গাঠনিক ভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত: প্রথমত, "private space" বা ব্যক্তিগত ক্ষেত্র ও দ্বিতীয়ত, "public sphere" বা সামাজিক ক্ষেত্র। ফার্স্ট ওয়েভ ফেমিনিসমের আগে অবধি এই ব্যক্তিগত ক্ষেত্রটি সংরক্ষিত ছিল মহিলাদের জন্যে। তবে তাদের বিশেষ কিছু করণীয় কাজকর্ম ছিল না। তাই ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যের প্রথমার্ধের নায়িকাদের জীবনে অপেক্ষা ও একাকিত্ব বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল। তাদের ঘরের কাজকর্ম থেকে শুরু করে নবজাত শিশুর পরিচর্যা করা অবধি সকল কাজ করার জন্যই নিযুক্ত থাকত বিভিন্ন স্তরের চাকরেরা। শুধু ইউরোপের সাহিত্যের উদাহরণ দিলে লেখাটি অসমাপ্ত থেকে যাবে কারন ঘর কে বাদ দিয়ে আলোচনা করা একপ্রকার বৃথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *জীবনস্মৃতি*-র *ঘর ও বাহির* প্রবন্ধে বলেন "আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখিলে এখনকার কাল লজ্জায় তাহার সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিবে। এই তো তখনকার কালের বিশেষত্ব, তাহার পরে আবার বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিল না। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই।" ঠাকুর পরিবারের উচ্চ-মনস্ক জীবনধারা বজায় রাখার একটি অন্যতম উপাদান। তাদের কাজ ছিল পিতা-মাতার মতন ছোট্ট রবিসহ বাকি বাচ্চাদের শাসন করা, তাদের খাওয়া-পড়া ও অনান্য সকল প্রয়োজনীয়তার খেয়াল রাখা, "বাহির বাড়িতে দোতলায় দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত।" তবে এই খেয়াল রাখার সাথে পিতা-মাতার তাদের সন্তানের প্রতি খেয়াল রাখার মধ্যে পার্থক্য থেকেই যেত কারণ যে স্নেহ মা-বাবা তাদের সন্তানকে দিতে পারে তার সাথে ভৃত্যের দায়িত্ব পাল্পনের মধ্যে তফাত থেকেই যায়। তাই সন্তানের সাথে তার বাবা-মায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠত না কখনই। রবীন্দ্রনাথ এই দুরত্বকে তাঁর বেড়ে ওঠার পথের পাথেয় করে তুললেও বহু শিশুদের কাছে তাদের শৈশ্যব ও কিশোরকাল যথেষ্ঠ বেদনাদায়ক ছিল। তবে চাকরদের জীবনও বেশ বিলাসবহুল ছিল বা তাদের কাছে মালিকের সন্তানের দায়িত্ব ছিল বলে তারা যে বিশেষ কোনো সুযোগ-

সুবিধার প্রাপ্ত করত তা একেবারেই নয় কারণ বাস্তব জীবনেও এই সকল সাহায্যকারীদের কথাবার্তা বা জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সাদামাটা আর একঘেয়ে কারণ তাদের জীবনের অস্তিত্ব কেবল তাদের প্রভুদের বাড়ির আঙিনায় সীমাবদ্ধ ছিল। (ডাডেন, ১১৫) সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের কোনো অস্তিত্ব কখনোই নজর কাড়েনি। এমনকি বাড়ির বাইরে কোন উৎসবে যখন বাড়ির মহিলারা পুরুষদের সাথে যোগদান করতো অর্থাৎ বলা চলে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের একটি ভাগ যখন সামাজিক ক্ষেত্রের সাথে খানিক হলেও মিলিত হত, তখনও মনিবেরা তাদের চাকরের নাম ধরে ডাকা দূর তাদের সাথে কথাও বলত না কারণ বাড়ির চাকরের সাথে কথা বলাতে মনিবের অস্তিত্বহানী ঘটতে পারে: "do make it a strict rule not to talk to servants and housekeeping when you go out…" (ম্যাকমিলান, ৮৮)

উল্লেখিত এই নিয়মের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসাবে বর্তমানের একটি ফেসবুক পেজ, "Koi-hai tea-Planters Assam, Darjeeling and North-East India"- এর কথা বলা যাক। এই ফেসবুক পেজটি ২০১৯ সালে ২২ শে ফেব্রুয়ারী খোলা হয়েছে এবং কুড়ি হাজারেরও বেশি মানুষ এই গ্রুপের মেম্বার হয়েছে। এই মেম্বাররা মূলত দার্জিলিং, আসাম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু মানুষ যাদের পূর্বপুরুষ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির চা-এস্টেটের মনিবের নিজস্ব ভৃত্য ও চা-কর্মী। এই গ্রুপের মেম্বাররা মূলত তাদের কাছে সঞ্চিত তাদের পূর্বপুরুষদের পুরোনো চিঠিপত্র, ছবি বা তাদের মুখে শোনা জীবনের গল্প প্রভৃতি পোস্ট করার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সংযোগ বজায় রাখে এবং তথ্য সংরক্ষণের কাজ করে থাকে। ফেসবুক পেজটির এই অসাধারণ নামটির পিছনের ইতিহাসই ডেভিডঅফের সেই পারিমান্ডিলিক বিভাজনের নজির। চা-এস্টেটের সেই মনিবেরা তাদের ভৃত্যদের কখনই নাম ধরে ডেকে কাজের হুকুম দিত না কারণ সাদা চামড়ার মনিবের মুখে, তাদের ভাষায় "নেটিভ" চাকরের নামও যদি উচ্চারিত হয় সেক্ষেত্রেও মনিবের সম্মানহানি হতে পারে। তাই তারা "koi hai" বা কেউ আছে বলে সম্বোধন করত। এই সম্বোধনের পিছনের উদ্দেশ্য এটাই যে তাদের আপ্যায়নের জন্য কাউকে না কাউকে মজুত থাকতেই হবে। এই "koi hai" -এর উত্তর তাই অবধারিত ভাবে "জি হুজুর"-ই ছিল, কখনই এই ডাকের প্রতিউত্তর নেতিবাচক হয়নি।

কর্মচারী, ভৃত্য ও তাদের অবস্থানগত বিভেদ ও বিরোধ:

ভিক্টোরিয়ান সংস্কৃতির প্রতিবিম্ব স্বরূপ যখন ভারতে তথা বাংলায় প্রতিফলিত হয় তখন সম্ভ্রম পরিবারে এবং বাবু সম্প্রদায়ের নিজেদের কাজ গুছিয়ে ও এগিয়ে দেওয়ার জন্য ভৃত্য নিয়োগ করার প্রচলন শুরু হয়। বলা বাহুল্য এই সমাজে মানুষের অবস্থানগত প্রভেদ আদিম কাল থেকে চলে আসছে এবং এই প্রভেদ আগাগোড়াই সামাজিক স্তরবিন্যাসকে আরও বড়ো করে তোলে। সমাজে সকলশ্রেণীর মানুষদের সমান অধিকার ও সমতা বজায় রাখা সম্পর্কিত মার্ক্সবাদী যে ধারণা প্রবর্তিত হয়, সেই ধারণাকে এই মনিব-ভৃত্য প্রথা সম্পূর্ণ রূপে নস্যাৎ করে। বরং ভৃত্য থাকলে তবেই সমাজে নিজেদের স্থান আরও উচ্চত্তরও হবে এমন এক ধারনা সকলের মনে দানা বাঁধতে শুরু করে। (হানসেন)

তবে কোন চাকর কি কাজ করবে এবং তাদের অবস্থান কিরূপ হবে তা নির্ণয় করা শুরু হয় কিছু শর্তানুযায়ী, যেমন- জাত, জাতি, ধর্ম, গায়ের রঙ, লিঙ্গ, উপনিবেশিত হলে তার অবস্থান কিরূপ, সে গ্রাম নাকি শহর থেকে বিরাজ করে প্রভৃতি: "Grounded in satisfaction, domestic service was always composed of people considered inferior (by virtue of their unfree status, their gender, their geographic origins, their lower-class background and/oer their caste, race and ethnicity) and always held in the lowest esteem." (রলিনস, ৫৮)। শিল্পায়ণের সাথে সাথে যেহেতু কর্মসংস্থানের বহু পন্থা সূচিত হয় তাই বুঝে নেওয়া দরকার যে কর্মচারী (employee) ও সাহায্যকর্মী বা ভৃত্যের

(servant) মধ্যে কিপ্রকার পার্থক্য রয়েছে। বলা বাহুল্য যে এই পার্থক্য মূলত শ্রেণীগত। অর্থাৎ কারখানার কর্মচারী, দরবার ও কাছারির কর্মচারী বা নিজস্ব সহকারীর শ্রেণীগত যোগ্যতা ভৃত্যের তুলনায় বেশি। এই শ্রেণী নির্বাচন আবার পূর্বল্লেখিত শর্তাবলি অর্থাৎ জাত, জাতি, ধর্ম প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং দপ্তরের কর্মচারী শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট নয় বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁকে অনান্য শর্তাবলির অধীনে এসে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। কর্মচারী ও ভৃত্যের এই অবস্থানগত প্রভেদ যথেষ্ট স্পষ্ট তবে এর চেয়েও বেশি স্বচ্ছ হয়ত ভৃত্যদের অভ্যন্তরীণ অবস্থানগত পার্থক্য এবং তাদের সাথে তাদের মনিবের সম্পর্ক যা মূলত এই অবস্থানের তুলনামূলক বিভেদপ্রসূত (কক): " …the relationship to the master or mistress was one based primarily on status and not on contract." (অবার্ট, ১৫২) অর্থাৎ মনিব কোন ভৃত্যের সাথে কিরূপ সম্পর্ক বজায় রাখবে তাও নির্ভর করবে ভৃত্যদের নিজস্ব শ্রেণী পরিচয়ের উপর যেখানে তাদের কৃত কাজের পরিমাণও অনেক সময় লঘু হয়ে দাঁড়ায়। একটি সাধারণ উদাহরণ সহযোগ এই সম্পর্কগত প্রভেদ আরো বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

হিন্দু প্রতিপত্তিশালী পরিবারে রান্না করার জন্য যে ঠাকুর রাখা হত তা মূলত গরীব ব্রাহ্মণ বা অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ ব্রাহ্মণকে রাখা হত এবং যাকে সাহায্য করার জন্য থাকত তার এক বা একাধিক সহকারী। অর্থাৎ রান্নার গুণ-মান, পদ বা আয়োজন প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা মনিব মূলত করবে ব্রাহ্মণ ঠাকুরের সাথে এবং সেই ঠাকুরের নিয়ম ও নির্দেশানুসারে তাঁর সহকারীরা প্রভূত কার্য করবে। এমনকি এই ব্রাহ্মণরা কোনো ইউরোপীয়দের রন্ধনশালায় ঢুকেও রান্না করত না কারণ সেক্ষেত্রে কিছু বিশেষ খাদ্যের সাহচর্যে তাঁরা নিজেদের ধর্ম হারানোর শঙ্কা করত। ঘরের বাসি কাজকর্ম, ঘর ঝাড়-পোছ্য করা, জামা-কাপড় ধোয়া প্রভৃতির জন্য থাকত আলাদা চাকর। তারা কেবল এই সকল বাসী কাজ করারা জন্যই নিযুক্ত ছিল। তবে তারা মৃত পোষ্যের দেহ পরিষ্কার করত না, তার জন্য আসত আলাদা জমাদার এবং তাদের বাড়িতে প্রবেশের রাস্তাও ছিল ভিন্ন। মূলত বাড়ির সম্মুখ দ্বার দিয়ে কখনো জমাদার বাড়িতে প্রবেশ করতে পারত না, খিড়কির দরজা বা বারান্দার দরজা ছিল তাদের জন্য বরাদ্দ। এই জমাদার মূলত দলিত এবং সমাজে পিছিয়ে রাখা মানুষজনই ছিল।

তবে মহিলা ভৃত্যদের ক্ষেত্রে এই স্তরভেদ অন্যরকম ভাবে কাজ করতো। ১৯৭০ সালে আমেরিকায় এক মিলিয়নের বেশি গৃহস্থালির কর্মনিপুণা ভৃত্যদের মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগই ছিল মহিলা যাদের পরিবার নয়তো কোনো বিপর্যয়ে বিদ্ধস্ত হয়ে গিয়েছিল কিংবা পরিযায়ী শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছিল। (শ্রীনিবাস, ২৭১) সাউথ আফ্রিকায় মূলত কালো মহিলারাই ছিল সাদা চামড়ার উপনিবেশকারীদের বাড়ির কাজের লোক। (*দ্য ইকোনমিস্ট*) বাংলার ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি বললেই চলে। পুরুষ চাকরদের সাহায্য করার জন্য ঠিকে ঝি রাখার প্রবৃত্তি জন্মে ছিল অনেক পরিবারেই। এদের কাজ ছিল ঘর-বাড়ি পরিস্কার রাখা সহ আরো নানা কাজে বাড়ির মহিলাদের সাহায্য করা। অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারে অবশ্য মহিলাদের অন্তরমহলে তাদের সাহায্য করার জন্য, সাজ-পোষাক তৈরি করার জন্য, কেশচর্চা কিংবা পান সেজে দেওয়ার জন্য থাকত আলাদা আলাদা ঝি। তবে বাংলায় মালকিন ও তাঁর ঝি-এর সম্পর্কের সমীকরণ ভিক্টোরিয় আদলের ছিল না। বরং কিছুক্ষেত্রে এই ঝি-রা হয়ে উঠত অন্তরমহলের মহিলাদের প্রাণের দোসর। কিন্তু তফাৎ তবুও থেকেই যায়। গিলের ভাষায় অন্তরমহলের এই ঝি-দের অস্তিত্ব খানিক সংকটময় ছিল, তারা সেই অর্থে কায়িক পরিশ্রমী চাকরও ছিলনা আবার অন্তরমহলে তারা নিজেদের মর্জির অধীনস্থও ছিলনা। তারা তাদের বেতনের বাইরে গিয়েও অনেকসময় মহিলাদের ছেলেপুলে দেখাশোনা করা থেকে শুরু করে তাদের বড় করে তোলার কাজও করে যেত কিন্তু ফলস্বরূপ তাদের প্রাপ্তি কিছুই হতনা, অর্থাৎ সন্তানকে মায়ের পরিচর্চা দিয়ে বড়ো

করে তুললেও মায়ের অধিকার দাবি তারা কখনোই করতে পারেনি: "...the house-worker is neither a labourer in the traditional sense nor one who carries out the unpaid domestic tasks of wife or mother." (গিল, ১২৮)

মহিলা ভৃত্য বা দাসী কিংবা ঠিকে ঝি-দের নিয়োগ করা হত তাদের বয়স, অভিজ্ঞতা ও অবশ্যই জাত দেখে। মূলত বয়জেষ্ঠ্য ও অভিজ্ঞ মহিলাকর্মীরা নিযুক্ত হত ঠাকুরঘর ও পাকশালার কার্যে, অপেক্ষাকৃত নবীন ও অবিবাহিত ঝি-রা মূলত বাড়ির মেয়ে-বউদের পরিচর্যা ও পুরুষ মনিবের ফাইফরমাস খাটার কাজে ব্রত হত। হানসেনের মতে মনিব ও তার ঝি-এর সম্পর্ক মূলত "psycho-sexual power relationship" (২২)। অর্থাৎ বলা চলে মহিলা সাহায্যকারীদের ক্ষেত্রে কেবল তাদের কায়িক পরিশ্রম তাদের বেতন যোগাড়ের জন্য যথেষ্ট ছিলনা বরং তাদের নিজেদের শরীর দিয়ে মনিবের চাহিদাও মিটিয়ে চলতে হত। তবে এই যৌনসুখ প্রাপ্তির পরেও মালিকের লেগে থাকত যৌনরোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা এবং ফলস্বরূপ বহু মহিলা সাহায্যকর্মীকে কেবল সন্দেহের বশে তাদের কাজ থেকে বহিস্কৃতও করা হত। অপরদিকে এই "psycho-sexual power relationship" খাটিয়ে আফ্রিকায় কালো চামড়ার মেয়েদের এবং বাংলায় দলিত কিংবা সাঁওতাল সহ অন্য ট্রাইবাল মহিলাদের উপর নিজেদের পুরুষত্ব এবং ক্ষমতা দেখিয়ে মজা পেয়ে এসেছে তামাম পুরুষ মালিকরা। তাই লন্ডনেও ঘরছাড়া মহিলারা ও সমাজ যাদের বেশ্যা বলে দাগিয়ে দিয়েছে তারাই পরবর্তীতে "domestic-help" হিসাবে কাজে যোগদান করে। (টেলিস-নায়াক, ৭১)

চাকর ও মনিবের সম্পর্ক এবং অবস্থানগত বিভেদ:

চাকর ও মনিব সেই অর্থে একে অন্যের পরিপূরক হলেও তাদের মধ্যেকার দুরত্ব আগাগোড়াই রয়ে গেছে। এই সম্পর্কের অভিমুখ তাই সর্বদাই একমুখী ছিল অর্থাৎ বলা চলে চাকর একতরফা তার মনিবের জন্য কাজ করে যেত এবং মনিবের তার চাকরের প্রতি ব্যবহার ছিল তার নিজস্ব অবস্থান ও অবস্থাঙ্গত ক্ষমতার প্রতিমূর্তি। তাদের সম্পর্কের যে পদানুক্রম তা সর্বদাই বিরাজমান এবং তা বজায় রাখতে সর্বদাই মালিকের তৎপরতাই বেশি এবং এই সম্পর্কের অভ্যন্তরীণ এই পদানুক্রম বজায় রাখার জন্য মনিবেরা তাদের ভৃত্যদের প্রতি ব্যবহৃত ভাষা, শব্দ, তাদের প্রতি করা ব্যবহার, অনুভূত অনুভূতি, তাদের বেশভূষা প্রভৃতির একটি বিকৃত প্রতিলিপি তৈরি করে চলেছে আজও। উনিশ শতক কিংবা বিংশ শতকের মনিবদের যখনই তাদের ভৃত্যদের আদেশ দেওয়ার বা কোন বার্তা প্রদান করার প্রয়োজন হয়েছে, তারা সম্বোধন করেছে "তুই" বলে। এই সম্বোধন লিঙ্গ কিংবা বয়স কোনটির ধার না ধেরে সকলের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। অর্থাৎ বলা চলে এই সম্বোধনের ক্ষেত্রে একধরণের সমতা রয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে প্রবীণ ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে বাকি চাকররা ঠাকুর কিংবা "মহারাজ" (শ্রীনিবাস, ২৭৫) বলে ডাকলেও, মনিবের কাছে তার পরিচয় ছিল রাঁধুনি। অর্থাৎ তার কাজটাই তার নামের প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকি কখনো কখনো ঝি-চাকরদের মনিবেরা নিজেদের স্বেচ্ছামতন তাদের নামকরণ করত এবং এই নাম মোটের উপর তাদের কাজের অবস্থান, শারীরিক গঠন, সামাজিক অবস্থান আবার কখনো কখনো তাদের ব্যক্তিগত কোন ঘটনার জের টেনেও নাম রাখা হত। ধরা যাক কোনো মহিলা সাহায্যকর্মী সন্তানপ্রসাবে অপারক তবে অন্তরমহলে তার নাম 'বাঝা-ঝি' রাখা হত এবং তাকে মালিকের সন্তানের কোন দায়িত্ব দেওয়া হত না। মনিব তার সনাতন নামের একজন চাকর, যে সম্প্রতি হয়তো পিতা-মাতা হারা হয়েছে, তাকে অনাথন বলে ডাকতে দ্বিধাবোধ করতেন না এবং এই মশকরার মধ্যে দিয়ে মনিব কিরূপ হাস্যকৌতুকে পটু এবং নিজের চাকরদের উপর তার কি দারুণ অধিকার আছে তার পরিচয় সে তার বন্ধু ও পরিচিতদের দিতেন। বাবু সম্প্রদায়ের সদ্য ইংরাজী শেখা বাবুরা তাদের বাড়িতে আসা ব্রিটিশ কিংবা অ্যাংলো বন্ধু ও অতিথিদের সাথে

ইংরাজীতে কথা বলার সময় তাদের নিজেদের ভৃত্যদের ডেকে অনেকসময় ইংরাজীতে তাদের প্রতি কথা বলে তাদের অবুঝ উত্তর পেয়ে তা নিয়ে মজা করতেন এবং তারপর তাদের সাথে বাংলা বা তাদের বোধগম্য ভাষায় কথা বলে নিজেদের পান্ডিত্য জাহির করতেন।

ভৃত্যদের প্রতি ব্যবহৃত ভাষা ও তাদের প্রতি মনিবের কৃত ব্যবহারের বাইরে গিয়েও সমাজ ও অবশ্যই মালিক আরও কিছু বাঁধাধরা নিয়ম বা "stereotypes" ঠিক করে রেখেছিল আগাগোড়াই। তার মধ্যে মানুষের প্রাথমিক তিনটি প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রতি কিছু আরোপিত বাঁধা-নিষেধ নিয়ে এবার কথা বলা যাক। চাকররা নিয়মানুযায়ী খাওয়ার খেত সকলের শেষে এবং তাদের খাওয়ার বাসন, জলের গ্লাস এমনকি কোনো কোনো গৃহস্থালিতে পাকশালাও আলাদা ছিল এবং খাওয়ার পদও ছিল পরিবারের সকলের চেয়ে ভিন্ন। কখনো কখনো মালিকের খেয়ে খাওয়ার অবশিষ্ট থাকলে তা বাড়ির ভৃত্যদের মধে ভাগ করে দেওয়া হত। মালিকের চোখের আড়ালে গিয়ে কিংবা বাড়ির বাইরের ঘরে বসে আত্রা তাদের খাওয়ার খেত নিশব্দে। তাদের পায়ে জুত পড়ার অনুমতি ছিলনা এবং বিশেষ কার্যক্ষেত্রে যেমন গাড়িচালক, দাড়োয়ান, কখনো কখনো খাওয়ার পরিবেশনকারীদের জন্য আলাদা পোষাক বানানো হত যাতে তাকে সহজে চিহ্নিত করা যায় এবং সে ঐ একই গাড়িতে বসলেও মালিকের থেকে আলাদা সেই সম্পর্কে তাকে সচেতন করা হত। মালিক ও তার পরিবার-পরিজন তাদের ব্যবহৃত কাপড় ভৃত্যদের ব্যবহার করতে দিয়ে খানিক নিশ্চিন্তে গালে পান দিয়ে নিজেদের উদারতার বড়াই করত। বাড়ির ভৃত্যদের থাকার ব্যবস্থা হত সাধারণত নীচতলার বারান্দায়, কলঘরের পাশে কিংবা সিঁড়িঘরের মেঝেতে। তাদের নিজিস্ব কোন ঘর সাধারণত ছিল না। অর্থাৎ মালিকের তলায় যে তার অবস্থান তা কেবল তার কাজের মাধ্যমে নয় বরং দোতলায় মালিকের শোয়ার ঘরের নীচের ঘরে কিংবা বারান্দার মেঝেতে তার শয়নের জোগাড় করার সময়ও তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হত যে তার অবস্থান তার মালিকের অবস্থানের তলায় অর্থাৎ বেশ নীচুতে: "The message is clear, the domestic's place is at the bottom in the family hierarchy as well as the social hierarchy." (রলিনস, ১৭২)

চাকরের আদর্শ, প্রেম ও বন্ধুত্ব: একটি উপসংহার

শেক্সপিয়ার কিংবা শেরিডনের নাটকে চাকরদের সাধারণত এমনভাবে পুনরুস্থাপন করা হয়েছে তারা যেন কৌতুকের পাত্র। তাদের কথাবার্তা মূলত প্রধান চরিত্রেদের দর্শকের সাথে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য কিংবা ঘটনার ঘনঘটায় হাস্যরস যোগ করে নাটকের গভীর প্লটে খানিক লঘুতা আনার জন্য ব্যবহার করা হয়। চাকরের জীবনকে কেবল সাহিত্যের পাতায় নয় বরং বিনোদন জগতেও একপ্রকার কৌতুকময় করে তোলা হয় বিভিন্ন উপাদান সহযোগে। এইক্ষেত্রে তিনটি ভিন্ন সময়ের তিনটি বাংলা ছায়াছবিতে চাকরের উপস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ টিপ্পনি করা যাক। মহানায়ক উত্তমকুমার, তনুজা, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় অভিনীত এবং সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ছায়াছবি 'দেয়া-নেয়া' তে উত্তমকুমারের তিনটি চারিত্রিক উপস্থাপনার মধ্যে হৃদয়হরণ বি.এ পাশের গুরুত্ব এই লেখনীর ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ। প্রশান্ত একজন গাড়িচালক জেনে সুচরিতার বাবা কখনই তাঁর সাথে সুচরিতার বিয়ে দিতে চাননি কিন্তু যখন জানতে পারেন যে তিনি চালক তো ননই বরং বিখ্যাত গায়ক ও একইসাঘে একটি প্রতিপত্তিশালী পরিবারের একমাত্র ছেলে, তখন আর সুচরিতার বিয়ে দিতে তিনি অমত করলেন না। অপর দিকে গায়ক অভিজিতের কেবল গান শুনে প্রেম পরলেও, সুচরিতা কখনই চালক হৃদয়হরণের মনের হদিশ করেননি কারণ চাকর ও মনিবের প্রেম চলে না এবং চাকরের প্রেম নিতান্তই কৌতুক সমতুল্য। অপরদিকে সুভাষ সেন পরিচালিত 'পূজা' চলচ্চিত্রে, চুমকি চৌধুরী অভিনীত পূজা চরিত্রটি বাড়ির ঝি। সে যখন শোনে তাঁর মনিবের মেয়ে

ময়নাকে তাঁর শ্বশুরবাড়ির মানুষজন পণ দিতে না পারার কারণে নিত্য জ্বালা-যন্ত্রনা দিচ্ছে, তখন সে তাঁর 'রেবেল' রূপে হাজির হয় সেই বাড়িতে। এরপর গল্প এগোলে তাঁর সাথে সেই বাড়ির ছোট ছেলের (টোটা রায়চৌধুরী অভিনীত) বিবাহ হয়। এক্ষেত্রে আবার চাকর ও মনিব স্থানীয় ব্যক্তির অন্য এক প্রেমের গল্প চোখে পরে। অপরদিকে ২০০৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত, জিত, কোয়েল, রঞ্জিত মল্লিক, লকেট, লাবণী, শুভাশিষ, মোনালিসা অভিনীত এবং সুজিত মন্ডল পরিচালিত 'সাত পাঁকে বাঁধা' ছবিতে শুভাশিষ জিতের বাড়ির কাজের লোক, অফিসে পি.এ এবং একইসাথে বন্ধুও। সে সর্বদাই তাঁর বন্ধুস্থানীয় মনিব কিংবা 'বসের' সাহায্য করে ও উপযুক্ত বুদ্ধি দেয়। এক্ষেত্রে মনিব-চাকরের বন্ধুত্বের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

আবার *স্বর্ণলতা*-র মতন উপন্যাসে কখনো কখনো বাড়ির ঝি হয়ে ওঠে গোপালের (মালিকের সন্তানের) আরেক মা। সে মালিকের পরিবারের তার জমানো বেতন তুলে দেয় তার মালিকের হাতে। হানসেনের ভাষায়: "The literary writer's servant is there in an active variety: as a loyal tool, mercenary opportunist, active agent, distributer of the social order, representative of the rising bourgeoisie, fortuner of the revolution." (22) আবার গোয়েন্দা উপন্যাসে দেখা যায় বাড়ির প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস চুরি গেলে তার দায় প্রথমত এসে পড়ে বাড়ির ভৃত্যের উপর। পুলিশি জেরা ও চোর বদনাম প্রাপ্ত বাড়ির ভৃত্যকে অন্য কাজ খুঁজতে যেতে হয়। অপরদিকে বাড়ির লোককে খুঁজতে হয় আরেকজন চাকর কিন্তু তা সত্বেও মনের মতন আদর্শ চাকর বা "ideal domestic workers" (গুপ্ত, ১৪৫) পাওয়া হয়ে ওঠেনা। তাই আজও বাঙালি রবি ঘোষ অভিনীত এবং তপন সিনহা পরিচালিত 'গল্প হলেও সত্যি' সিনেমা দেখে হাঁ-পিত্তেশ করে আর ধনঞ্জয়ের মতন চাকরের দিন গোনে। তবে এই আর্দশ চাকরের কি কি গুণ থাকা দরকার তা বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে এই লেখনীর "কর্মচারী, ভৃত্য ও তাদের অবস্থানগত বিভেদ ও বিরোধ" অংশে উল্লেখিত সেই সকল শর্তাবলিতে। অর্থাৎ গল্প হলেও সত্যি সিনেমার রবি ঘোষকেও কেবল সব কাজে নিপুণ কিংবা সংসারের অভ্যন্তরীণ সমস্যা মিটিয়ে দিয়ে চলে গেলে হবেনা। তাঁকেও অবশ্যম্ভাবী ভাবে প্রভূত শর্তাবলির তোয়াক্কা করতে হবে।

তবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই পেশা বহু মানুষের মুখে ভাত জুগিয়ে চলেছে। ঘরছাড়া বহু মানুষ ও অল্পশিক্ষিত মহিলাদের নিজের রোজগারের সন্ধান করে দিয়েছে এই পেশা। ইংরাজী শব্দ "servant", "maid-servant" কিংবা বাংলা শব্দ ভৃত্য, ঝি-চাকর প্রভৃতি আজ আর ব্যবহৃত হয়না। বরং শব্দের অর্থগত ও মানগত পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে তা "househelp" বা গৃহস্থালীর কাজে সাহায্যকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আজ আর এত শর্তাবলির ঘেরাটোপ না থাকলেও এক অলিখিত আইন যেন তৈরি হয়ে রয়েছে, যা মনিব ও চাকর উভয়ই জেনে বা নিজের অজান্তে পালন করে চলেছে। তাই আজও হয়ত তাদের পরিচয় কর্মচারী নয় বরং সাহায্যকর্মী।

তথ্যসূত্র:

১। গিল, লেসলি। পেইন্টেড ফেসেস: কনফ্লিক্ট এন্ড এম্বিগুইটি ইন ডমেস্টিক সার্ভেন্ট-এমপ্লইয়ার রিলেশনস ইন লা পাজ। লাতিন আমেরিকান রিসার্চ রিভিউ, ১৯৩০-১৯৮৮।

২। গুপ্ত, চারু। ডমেস্টিক অ্যাংসাইটিস, রিক্যালসিট্রান্ট ইন্টিমেসিসঃ রিপ্রেসেন্টেশন অফ সার্ভেন্টস ইন হিন্দি প্রিন্ট কালচার অফ কলোনিয়াল ইন্ডিয়া। স্টাডিস ইন হিস্টোরি। সেজ পাবলিকেশন, ২০১৮।

৩।কক, জ্যাকলিন। মেইডস এন্ড ম্যাডামস: এ স্টাডি অফ দ্য পলিটিকস অফ এক্সপ্লয়টেশন। কর্ণেল ইউওনিভার্সিটি প্রেস, জোয়ানেসবার্গ, ১৯৮০।

৪। কৈই-হেঁ টি-প্ল্যান্টার্স আসাম, দার্জিলিং এন্ড নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া। ফেসবুক পেইজ, ২০১৯। www.koi-hain.com

৫। চ্যাপলিন, ডেভিড। ডমেস্টিক সার্ভিস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইসেশন: কম্পারেটিভ স্টাডি অফ সোশিওলজি । ১৯৭৮।

৬। টসিগ মাইকেল, অ্যান রাব্বো। আপ অফ দেয়ার নিস: সার্ভেন্টহুড ইন সাউথ-ওয়েস্ট কলম্বিয়া। ১৯৮৩।

৭। টেলিস-নায়াক, ভি। পাওয়ার এন্ড সলিডিটারিঃ ক্লিনটেজ ইন ডোমেস্টিক সার্ভিস। কারেন্ট এনথোপলজিন। সংখ্যা ২৩, ১৯৮৩।

৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতি। বিশ্বভারতী, ২০০৮।

৯। ডেভিডফ, লিওনর। মাস্ট্রার্ড ফর লাইফ: সার্ভেন্ট এন্ড ওয়াইফ ইন ভিক্টোরিয়ান এন্ড এডওয়ার্ডিইয়ান ইংল্যান্ড। জার্নাল অফ সোশ্যাল হিস্টরি।

১০। দ্য সার্ভেন্ট প্রবলেম। দ্য ইকোনমিস্ট। মার্চ ১৭, ১৯৯০।

১১। ম্যাক্সিলান, মার্গারেট। ওমেন অফ দ্য রাজ। টেমস এন্ড হাডসন, লন্ডন, ১৯৮৬।

১২। রলিনস, জুডিথ। বিটউইন ওম্যান: ডমেস্টিকস এন্ড দেয়ার এমপ্লয়ারস। টেম্পেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ফিলাদেলফিয়া, ১৯৮৫।

১৩। রায়, রাকা এবং কইয়াম, সিমিন। কালচারস অফ সার্ভিটিউড: মর্ডানিটি, ডমেটিসিটি এন্ড ক্লাস ইন ইন্ডিয়া। অক্সফোর্ড ইউওনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০।

১৪। শ্রীনিবাস, লক্ষ্মী। মাস্টারস সার্ভেন্ট রিলেশনশিপ ইন এ ক্রস-কালচারাল পার্স্পেক্টিভ। ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি। ফ্রেব্রুয়ারি ৪, ১৯৯৫।

১৫। হানসেন, কারেণ ট্রানবার্গ। ডিস্ট্যান্ট কম্পেনিয়নস: সার্ভেন্টস এন্ড এমপ্লয়ার্স ইন জোম্বিয়া। কর্ণেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ইথাকা, ১৯৮৯।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 656-663
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.255

ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছন্দ চিন্তা এবং বাংলা ছন্দে তাঁর অবদান

সুমন মোদক, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই, অসম, ভারতবর্ষ*

Received: 25.12.2025; Accepted: 28.12.2025; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Our discussion highlights a vital aspect of Rabindranath Tagore's poetic vision: his deep exploration of rhythmic thought. Tagore placed great importance on traditional meters, diving deep into their inner structures to understand how they work. Throughout his writing, he not only analyzed these rhythms but also identified and named various types of meters, which are explored in this article.

One of Tagore's most significant contributions was his transformations of the Dalbritta meter. Before him, this rhythm was often dismissed as a style suited only for nursery rhymes, folk chants, or light humour. Tagore changed the perception, proving that it could carry the weight of serious and profound poetry. Like a river carving a new path, he broke through the rigid structures of Bengali verse and reshaped them into something entirely new. While he is not traditionally called the inventor of Bengali meter, it was through his artistry that it reached its most refined and meaningful form. Along with that, Tagore was a pioneer and a master artist of prose rhythms, showing that even prose could possess a musical soul.

Keywords: Rabindranath, Meters, Rhythms, Prose rhythms, Bengali poetry, Verse

বিশ্বব্যাপী বঙ্গ সংস্কৃতি তথা সাহিত্যের যে চিরন্তন চর্চা তার মূলে যাঁর সার্বভৌম অবদান তিনিই আমাদের প্রিয় রবি ঠাকুর। তিনি কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, গান প্রভৃতি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শুধু যে নিজেকে বিশ্বের প্রথম সারিতে বসিয়েছেন তা নয়, বাঙালি জাতি তথা বাংলা ভাষাকেও শ্রেষ্ঠত্বের মহিমায় মহিমান্বিত করেছেন। আসলে কবিসত্তা যে বাঙালির সহজাত তা বিশ্ববাসীর অন্তরে চিরন্তনত্ব প্রদান, তাঁর কীর্তিই বলা চলে। এহেন মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অতি সক্রিয়তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তিনি তাঁর কাব্যসম্ভারের মধ্য দিয়ে এম্‌নি এম্‌নি 'কবিগুরু' বা 'বিশ্বকবি' হয়ে ওঠেননি। তার পিছনে ছিল তাঁর নিরলস সৃষ্টি উদ্যম, সৌন্দর্যবোধ, সার্বিক দৃষ্টি, সর্বোপরি সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার অকৃত্রিম অপরিমেয় ভালবাসা। তাঁর শুভজন্মের 'সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের পরও তাঁকে নিয়, তাঁর কাব্যসম্ভার নিয়ে আজও নানান চর্চা চলছে। যদিও তা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য ঐ সমস্ত কাব্যসম্ভার সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি কিভাবে চোখ কান খোলা রেখেছেন এবং সৃষ্টির আনন্দে মেতে সেইসব রচনাকে নানাভাবে তরঙ্গায়িত করেছেন তাকেই স্মরণ করে নেওয়া। তাঁর চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে সূক্ষ্মাতিমুখী করে তুলতে বীজ বপন করা। কাব্যের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে 'ছন্দ'-কে তিনি কিভাবে ব্যবহার করেছেন, বাংলা ছন্দ প্রসঙ্গে নানা চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন -

তাও আমরা আলোচনা করবো। এককথায় রবীন্দ্রনাথের ছন্দ চিন্তার পর্যালোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয়। যার মাধ্যমে সহজেই প্রকাশিত হয় বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের অবদান, তারও প্রকাশ ঘটানো আমাদের উদ্দেশ্য।

১

ছন্দ হল শব্দের শিল্পময় বিন্যাস, যা ভাষার চলনভঙ্গিকে অবলম্বন করে বিশেষভাবে বিন্যস্ত হয় এবং উচ্চারণে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি করে এবং পরিণামে চিত্তে জাগায় আনন্দানুভূতি। আসলে যা কিছু ছন্দোময় সে সমস্তই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কাব্যে ছন্দের প্রয়োগ যদি আদি অনন্তকাল ধরে তাই হয়তো সাধারণভাবে চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি এবং ছান্দসিক। স্রষ্টা হিসাবে তিনি ছন্দের তাজমহল নির্মাণ করেছেন। অন্যদিকে ছান্দসিক হিসাবে বাংলা ছন্দের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোকপাত করে সুনির্দিষ্ট পথনির্মাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর এই দুই রূপ একে অপরের পরিপূরক। এবারে আমরা দেখে নিতে চাইবো রবীন্দ্রনাথ ছন্দ বলতে কী বুঝতেন। তিনি 'ছন্দ' গ্রন্থে ছন্দ প্রসঙ্গে বলেছেন- "ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়।"[১] তিনি ঐ গ্রন্থে আরও বলেছেন- "প্রত্যেক ভাষারই একটি স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি আছে সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়।"[২]

বাঙালির চিরন্তন কোমল স্বভাবের ন্যায় বাংলা শব্দ উচ্চারণের মধ্যে ঝোঁক গাম্ভীর্য প্রায় নেই। সেইজন্য আমাদের কোনো লেখা অত্যুক্তি-পুনরক্তি বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আড়ম্বরপূর্ণ না করলে পাঠক মনে তেমন সাড়া দেয় না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনায় মধুসূদনের মহাকাব্যের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গাম্ভীর্য শব্দই কাব্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে তেমন নয়। উপযুক্ত শব্দের অভাবে কাব্যের রস বিনষ্ট হয়। আসলে তিনি দেখাতে চেয়েছেন ছন্দ হচ্ছে বিশেষ বিধি নিয়ন্ত্রিত বিরামময় পদ্ধতি। আবৃত্তি যার মাধ্যমে সুখপাঠ্য ও সুখশ্রাব্য হয়ে ওঠে এবং পরিণামে চিত্তে জাগায় আনন্দানুভূতি অর্থাৎ পরিশেষে রস সঞ্চারিত হতে বিশেষ সাহায্য করে।

২

কাব্যে ছন্দের প্রয়োজনীয়তা তথা প্রাসঙ্গিকতা কী তা রবীন্দ্র কাব্য সম্ভারের দিকে লক্ষ্য করলেই পরিস্ফুট হবে। আসলে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ছান্দসিক নন, তিনি মূলত স্রষ্টা তথা শিল্পী। শিল্পীর পক্ষে সর্বদা শিল্প ও ব্যাকরণকে এক লাইনে রাখা অসম্ভব। কখনো কখনো শিল্পত্বের খাতিরে ব্যাকরণকে মাথা নোয়াতে হয়। তাই এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন- "যারা ছান্দসিক তাদের উপর এই কাটাছেঁড়ার ভার দাও, তুমি যদি ছন্দরসিক হও তবে ছুরিকাঁচি ফেলে দিয়ে কানের পথ খোলসা রাখ যেখান দিয়ে বাঁশি মরমে প্রবেশ করে।"[৩] এই বক্তব্যে সুস্পষ্ট কাব্যে ছন্দের প্রয়োজনীয়তা মূলত কানের তৃপ্তি ঘটানো এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কাব্যরস মরমে পৌঁছানোর উপযোগী করে তোলা। আসলে ভাষায় যে শব্দগুলি শুধু অর্থবহন করে সেগুলিই কাব্যে তথা কবিতায় ছন্দের দ্বারা বিশেষ রূপগ্রহণ করে। বস্তুত যা কিছু সাধারণ, জীর্ণ, মলিন তাই যেন কাব্যে সাহিত্যে ছন্দের দোলায় প্রাণবন্ত ও রঙিন হয়ে ওঠে,পার করে তার ব্যাচার্থ, পাড়ি দেয় ভাবের অতলে, আমরা হই রস সমুদ্রে নিমজ্জিত। কবির ভাবনায় তারই প্রকাশ-

১. "মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে।" – ('ভাষা ও ছন্দ'- 'কাহিনী')

অতএব বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ কাব্যোৎকর্ষে ছন্দের অবদানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সেইজন্য তিনি গদ্যছন্দকে কখনো কখনো কাব্যের বাহন করলেও প্রথাগত ছন্দকে ও তার প্রয়োজনীয়তাকে কোনদিন অস্বীকার করেননি।

৩

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের নানা কাটাছেঁড়া, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যবহার করে ক্ষান্ত থাকেননি বরং নানান নামে সেগুলিকে অভিহিত করেছেন, এইসব ছন্দের নিজস্ব নামকরণ তথা পরিভাষা প্রদান করেছেন। প্রকৃতি বিচারে বাংলা ছন্দে মূলত তিনটি রীতি প্রচলিত। বিভিন্ন ছান্দসিক, কবি, সমালোচক প্রমুখ অজস্র ব্যক্তি তাঁদের নানা দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন এবং সেইরূপে ছন্দের নামকরণ করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথও এই তিন রীতির ছন্দের নামকরণ করেছেন। যদিও তাঁর নামকরণে ব্যাকরণগত বা বৈজ্ঞানিক নীতি সম্মত ত্রুটি আছে বলে অনেকে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন-এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে- "রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের দেওয়া নামগুলি ছন্দের উৎস বা গুণ পরিচায়ক, ছন্দের গঠন প্রকৃতির পরিচায়ক নয়।[৩] তবু আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রকৃত নামকরণ একেবারে ফেলে দেওয়ার মত নয়।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের তিন রীতিরই আলাদা আলাদা নামকরণ করেছেন। দলবৃত্ত ছন্দকে তিনি বলেছেন 'বাংলা প্রাকৃত ছন্দ'। কলাবৃত্ত ছন্দকে তিনি 'সাধু নূতন' এবং মিশ্রবৃত্তকে 'সাধু পুরাতন' ছন্দ বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বাংলা ছন্দ রচনার দুই রীতি- 'সাধু' ও 'প্রাকৃত'। আমরা যাকে 'দলবৃত্ত' রীতি বলি তাকে তিনি 'প্রাকৃত' রীতি বলতেন। অন্যদিকে আমরা যাকে বলি 'কলাবৃত্ত' তাকে তিনি সাধু রীতিরই প্রকারভেদ হিসাবে গণ্য করতেন। এছাড়াও তিনি ঐ তিন রীতির ছন্দ বোঝানোর জন্য কখনো কখনো আরো একাধিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। লোকসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে দলবৃত্ত ছন্দকে বলেছেন 'অসংস্কৃত অমার্জিত ভাঙাচোরা' ছন্দ; আবার কখনো একে 'ছড়ার ছন্দ'ও বলেছেন। কখনো আবার কলাবৃত্ত ছন্দকে 'সংস্কৃতভাঙা' এবং মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে 'পয়ার জাতীয় ছন্দ', 'সাধু বাংলার ছন্দ' বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে স্বপ্রচলিত 'গদ্য ছন্দ'-কে বলেছেন 'ভাবের ছন্দ'। গদ্য কবিতার ভাষাকে বলেছেন 'গৃহস্থ পাড়ার ভাষা'।

রবীন্দ্রনাথ এই তিন রীতির নামকরণ ছাড়াও ছন্দ আনুষঙ্গিক বহু বিষয়ের নামকরণ করেছেন। 'পয়ার' ও 'মহাপয়ার' বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন। রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় তা হয়েছে 'ইন্দ্রের উচ্চৈশ্রবা ও ঐরাবত'। তিনি বাংলা মুক্তক ছন্দকে বলেছেন 'গণ্ডিভাঙা', 'বেড়াভাঙা' পয়ার; কখনো আবার 'হৃদয়ের ছন্দ' কখনো 'লাগাম ছাড়া' ইত্যাদি নানা অভিধা প্রদান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'পূর্ণযতিহীন ছন্দ' অর্থাৎ 'পঙক্তি যতিলঙ্ঘক' ছন্দকে বলেছেন 'পঙ্ক্তিলঙ্ঘক ছন্দ'। আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'প্রবাহমান ছন্দ'। রবীন্দ্রনাথের এই সব নামকরণ অনেক সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ একই পরিভাষা তিনি কোথাও কোথাও ভিন্নার্থক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্র প্রদত্ত এই ছন্দ সংক্রান্ত সমস্ত পরিভাষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তা যেমন ছন্দের উৎস নির্দেশক তেমনি কাব্যিক ব্যঞ্জনাময়।

৪

সাধারণভাবে দলবৃত্ত ছন্দ বলতে বুঝি- বাংলা ছন্দের যে বিশেষ রীতিতে ধ্বনি পরিমিত হয় দলসংখ্যার হিসাবে অর্থাৎ যে ছন্দোরীতিতে দলই ছন্দের মাত্রা হিসাবে নিরূপিত হয়, তাই দলবৃত্ত ছন্দ। ব্যাপকভাবে বলা যায় প্রতি পর্বের আদ্যাক্ষরে শ্বাসাঘাতযুক্ত দ্রুত লয়াশ্রিত, সাধারণত চার মাত্রার পূর্ণপর্বে গঠিত, উভয় দলই একমাত্রা হিসাবে বিবেচিত সুপ্রাচীন লৌকিক ছন্দকে বলে দলবৃত্ত ছন্দ। এবারে আমরা এই ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ বোঝার চেষ্টা করবো।

প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব দক্ষতায় যেভাবে দলবৃত্ত ছন্দের উত্তরণ ঘটিয়েছেন তা বিস্ময়ের ব্যাপার। রবীন্দ্র পূর্বকালে ছেলেভুলানো পদ্য, তন্ত্র-মন্ত্র, খনার বচন, হাস্কাহাসি, ব্যঙ্গ কবিতা, হালকা সুরের কবিতা, সর্বোপরি আপাত তুচ্ছ বিষয় ছিল মূলত দলবৃত্ত ছন্দের বাহন। রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে তুচ্ছ বিষয়ে এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তবে লক্ষ্য করলে রবীন্দ্র রচনার আদি পর্বেই এরূপ কবিতার দৃষ্টান্ত লক্ষ্যণীয়। 'কথা ও কাহিনী'র 'নকলগড়' ও 'হোরিখেলা' এবং 'কল্পনা' কাব্যের 'হতভাগ্যের গান' প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য। তবে 'খেয়া'(১৯০৫-০৬) কাব্য রচনার সময় থেকেই দলবৃত্ত ছন্দ পাকাপাকি ভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে।

দলবৃত্ত ছন্দের বিশেষ ভারবহন ক্ষমতা আছে, রবীন্দ্রনাথ তা স্বরচিত কাব্যের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন তাই কুর্নিশ জানিয়ে বলেছেন-

> "রবীন্দ্রনাথ এই দলবৃত্ত ছন্দের স্রষ্টা নন। তাঁর কৃতিত্ব এই যে, তিনিই প্রথম লোকসাহিত্যের বাহন স্থানীয় এই খাঁটি বাংলা ছন্দটিকে বহুকালের অবজ্ঞা ও তুচ্ছতা থেকে উদ্ধার করে তাকে নিঃসংকোচে সর্বপ্রকার লোকসাহিত্যের বাহন হবার উপযুক্ত মর্যাদা ও আভিজাত্য দান করেছেন এবং এটিকে যথোচিতরূপে মার্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে তথা বহু শাখা-প্রশাখায় পরিবর্ধিত ও অলংকৃত করে বাংলার ছন্দ ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তুলেছেন।"[৪]

সর্বোপরি বলা যায় রবীন্দ্রনাথ দলবৃত্ত ছন্দের যে উত্তরণ ঘটিয়েছেন তা তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর। যার জন্য পরবর্তী কবিগণ তাঁর কাছে বিশেষ ঋণী। আসলে রবীন্দ্রনাথ দলবৃত্ত ছন্দের ভারবহন ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন, প্রসারিত করেছেন তার ক্ষেত্রকে। ফলস্বরূপ এই ছন্দ আজ নতুন নতুন ভাবের মায়ালোক সৃষ্টি করে চলেছে।

৫

এবারে আমরা আসবো কলাবৃত্ত ছন্দ সম্পর্কে। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন কলাবৃত্ত ছন্দের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে- "যে রীতিতে বাংলা ছন্দের ধ্বনি পরিমিত হয় কলাসংখ্যার হিসাবে তাকে বলা হয় কলাবৃত্ত ছন্দ। ভাষান্তরে বলা যায়, যে ছন্দোরীতিতে কলাই ছন্দের মাত্রা বলে গণ্য হয় (অর্থাৎ এক কলাকে একমাত্রা বলে গণ্য হয়) তার নাম কলাবৃত্ত।"[৫] আসলে যে বাংলা ছন্দোরীতি বিলম্বিত লয়াশ্রিত(মধ্যম), ধ্বনিঝঙ্কার যুক্ত, সাধারণত ৫/৬/৭ মাত্রার পূর্ণপর্বে গঠিত, যার রুদ্ধ অক্ষর মাত্রই দুই মাত্রা তাকে কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে।

সৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টার মনে-প্রাণে, দেহে গর্ভযন্ত্রণা অনুভূত হয়, এগোতে হয় অতি সাবধানে। তেমনি কবি রবীন্দ্রনাথকেও সে যন্ত্রণা বইতে হয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছন্দোরীতিতে 'কলাবৃত্ত' রীতির প্রতিষ্ঠাতা। এ প্রসঙ্গে প্রবোধবাবুর মন্তব্য যুক্তিযুক্ত- " 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'ছবি ও গান' রচনার কালটাকে (১৮৮১-৮৪) এবং আংশিকভাবে 'কড়ি ও কোমল' রচনার সময়টাকেও (১৮৮৫-৮৬) ছন্দ ব্যাকুলতা ও নিয়মভাঙার যুগ বলে অভিহিত করতে পারি।"[৬] তারপর 'মানসী' কাব্য রচনা কালে কবির সঙ্গে যোগ দিলেন একজন শিল্পী। সব মিলিয়ে 'মানসী' কাব্যে প্রবর্তিত হলো নতুন ছন্দোরীতি -যার রবীন্দ্র প্রবর্তিত নাম 'সাধু নূতন ছন্দ' অর্থাৎ সর্বজনগ্রাহ্য 'কলাবৃত্ত' ছন্দ। তিনি দেখালেন অক্ষর সংখ্যা নয় 'কলা'ই ছন্দের প্রাণ। প্রতি এক কলাকে এক মাত্রা ধরা হলো। প্রকাশ পেল নতুন বাংলা ছন্দ। সেদিক দিয়ে 'মানসী' কাব্যের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিলে আমাদের দেওয়া বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট হবে-

"তোমারে কহিব লজ্জাকাহিনী, লজ্জা নাহিকো তায়

তোমার আভায় মলিন লজ্জা পলকে মিলায়ে যায়।" (সুরদাসের প্রার্থনা- মানসী)

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তের দুটি চরণেই চারটি অর্থাৎ তিনটি পূর্ণ একটি অপূর্ণ পর্ব বর্তমান। প্রতি পূর্ণ পর্বে ছয়টি ও অপূর্ণ পর্বে দুটি করে মাত্রা বর্তমান। অর্থাৎ প্রত্যেক রুদ্ধ দলই তার প্রসারিত উচ্চারণের জন্য দু-মাত্রার মর্যাদা পেয়েছে। যদিও ১৮৮৭ (বাংলা ১২৯৪) সালের বৈশাখ মাসে রচিত 'ভুলভাঙা' কবিতাটি প্রকৃত পক্ষে বাংলা সাহিত্যে কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে রচিত প্রথম কবিতা। নদী যেমন আপনার পথ আপনিই করে নেয়। ঠিক তেমনই রবীন্দ্রনাথও কাব্যের প্রয়োজনে বাংলা ছন্দকে ভেঙে গড়ে ব্যবহার করেছেন। এই নতুন সৃষ্টির গোপন অভীপ্সার ফলস্বরূপ তৈরী হয়েছে 'কলাবৃত্ত' ছন্দ। যার ফলে বাংলা ছন্দ ভাণ্ডার যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে তেমনি বাংলা কাব্যও হয়েছে সর্বাঙ্গ সুন্দর।

৬

এবারে আসি মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির ছন্দ সম্পর্কে। যে বাংলা ছন্দোরীতিতে শব্দান্ত রুদ্ধদল এবং একক রুদ্ধদল সর্বদা বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রকরূপে এবং শব্দের অপ্রান্ত রুদ্ধদল সাধারণত একমাত্রকরূপে উচ্চারিত হয় তাকে মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দ বলে। সদ্য বর্ষার প্রাদুর্ভাবে গাছপালা যেমন সবুজ হয়ে ওঠে, মেলে দেয় নিজেকে। ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের দুর্বার প্রতিভায় মিশ্রবৃত্ত ছন্দও নিজেকে প্রসারিত করেছে ভাবের নানা মহিমায়। আসলে মিশ্রবৃত্ত রীতিটি কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রবর্তিত নয়, বহু কবির বহু ব্যবহারে বিবর্তিত হতে হতে এটি বর্তমান রূপ লাভ করেছে। তবে রবীন্দ্রনাথের হাতেই এই ছন্দের যথার্থ প্রকৃতি নিরূপিত হয়েছে। বোঝা গিয়েছে এটি আসলে একটি মিশ্র প্রকৃতির ছন্দ। তাই ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন প্রদত্ত 'মিশ্রবৃত্ত' নামটিও রবীন্দ্র ছন্দ চিন্তনের ফসল। তিনিও বলেছেন- "এটির শেষ পরিমার্জিত রূপ প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের রচনায়।"[৭]

রবীন্দ্র পূর্ববর্তীকালে এই বিশিষ্ট ছন্দোরীতির মাত্রা নিরূপিত হতো অক্ষর গণনার মাধ্যমে। তিনিই শতাধীক বৎসরের আক্ষরিক সংস্কারকে ছিন্ন করে মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে ধ্বনিভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে- "আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুদ পদার্থ বাংলায় কিংবা অন্য কোনো ভাষাতেই চলতে পারে না।"[৮] রবীন্দ্র রচনা থেকে একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে-

"ভালো মন্দ দুঃখ সুখ অন্ধকার আলো
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরনী ভালো।" ('ধরাতল'- 'চৈতালী')

-দৃষ্টান্তটিতে শব্দের অন্তে অবস্থিত রুদ্ধদল আমাদের উচ্চারণে প্রসারিত হয় এবং দুই কলার মর্যাদা পায়। একদল শব্দের রুদ্ধদলও প্রসারিত উচ্চারণের জন্য শব্দান্ত হিসাবে গণ্য হয়েছে। আবার অপ্রান্ত রুদ্ধদল সঙ্কুচিতভাবে উচ্চারিত হবার জন্য এককলা পরিমিত হয়। দৃষ্টান্তটিতে 'মন্দ' শব্দের 'মন্', 'দুঃখ' শব্দের 'দুঃ' এবং অন্ধকার শব্দের 'অন্' প্রত্যেকটি এককলার সমান। মুক্তদল সাধারণভাবেই এককলা। সুতরাং এই হিসাবে দেখলে দেখা যাবে প্রতি পূর্ণ পর্বে চার কলা এবং অপূর্ণ পর্বে দুই কলা আছে। রুদ্ধদলের এই দুই রূপের একত্র সমাবেশের জন্যই এই রীতির নাম 'মিশ্রকলাবৃত্ত'। যার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটনের জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষ ঋণী। মিশ্রবৃত্ত ছন্দের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যটি ছন্দের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাব্য। রবীন্দ্রনাথ তপোলব্ধ ঐশ্বর্য এ কাব্যে অসাধ্য সাধন ঘটিয়েছে। এককথায় রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দের আবিষ্কারক না হলেও সার্থক পরিমার্জিত রূপের সর্বোত্তম স্রষ্টা।

৭

'গদ্য ছন্দ' -এর আবিষ্কারক ও সুনিপুণ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা ভাষায় গদ্য ছন্দ তথা গদ্য কবিতার প্রতিষ্ঠাতা নিঃসংশয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আবার তিনিই এখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষায় গদ্য কবিতার শ্রেষ্ঠ রূপকার। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরাজী অনুবাদ রচনাকালে কবির মনে এক নতুন ভাবনা জাগ্রত হয়। তারপর যখন ঐ গদ্যানুবাদ ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা পেল, তখনই কবির লেখনীর মাধ্যমে ভূমিষ্ঠ হল 'গদ্য কবিতা' বা 'গদ্য ছন্দে'র কবিতা। শুধু তাই নয়, কবির অনুসন্ধিৎসু মন গদ্য সাহিত্যের মধ্যেও খুঁজে পেয়েছে কাব্যের ধর্ম, তার রস ও স্পন্দন। তিনি বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এর অনেক রচনা এবং 'উপনিষদ'-এর গদ্য রচনাকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সত্যকাম জাবালের আখ্যায়িকা গদ্যে রচিত হলেও তার মধ্যে কাব্যের রস গভীর হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সমস্ত কাহিনী পড়ে যেমন মুগ্ধ হয়েছেন তেমনি 'গদ্য ছন্দ'এর কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। গদ্য কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ 'ভাবের কবিতা' বলেছেন। এর ছন্দকে বলেছেন 'ভাবের ছন্দ'। তাই তিনি মনে করেন ভাবকে গুচ্ছে গুচ্ছে সাজিয়ে এ ধরনের কবিতা রচনা করতে হয়। তাছাড়া তিনি গদ্য কবিতাকে পদ্যের ঘেরাটোপ থেকে বের করবার জন্য বিশেষ সচেতন ছিলেন। পদ্যে ব্যবহৃত 'মেনে', 'তরে', 'মোর' ইত্যাদি শব্দগুলো গদ্য কবিতায় বর্জন করেছেন। শুধু তাই নয় গদ্যে ব্যবহৃত শব্দ এ ধরনের কবিতায় অধিক ব্যবহার করেছেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬ -এর মধ্যে প্রকাশিত হল 'পুনশ্চ' বর্গের চারটি কাব্য 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' -গদ্য ছন্দে লেখা। 'শেষ সপ্তক'এর ছেচল্লিশটি কবিতায় গদ্যে লেখা। অন্যদিকে 'শ্যামলী' কাব্যের কুড়িটি কবিতা এই ছন্দে লেখা। তবে 'শেষ সপ্তক'-ই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্য কবিতা গ্রন্থ। এ কাব্যের 'পঁচিশে বৈশাখ' উৎকৃষ্ট গদ্য কবিতার উদাহরণ –

"পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে
মৃত্যুদিনের দিকে
সেই চলতি আসনের উপর ব'সে কোন কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা।" ('পঁচিশে বৈশাখ'- "শেষ সপ্তক")

আসলে গদ্য কবিতার উপকরণ পদ্যের পর্ব নয়, সাধারণ গদ্যের এক একটা 'Pharse' বা 'অর্থবাচক সমষ্টি'। যদিও রবীন্দ্রনাথ এরপরে আর ধারাবাহিকভাবে গদ্যেছন্দে কাব্য লেখেননি। কারণ এই ধরনের কবিতা রচনার জন্য অসাধারণ দক্ষতার দরকার হয়। কিন্তু রবীন্দ্র সমকালীন একদল কবি গদ্য কবিতার ঢঙে কবিতা লিখতে শুরু করেন। যা না কবিতা না গদ্য। তাই হয়তো কবিতার মান রক্ষার্থে রবীন্দ্রনাথ এরূপ সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেন প্রমুখ গদ্য কবিতা রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথই এ ধরনের কবিতার একেশ্বর রূপে বিরাজমান।

৮

সব মিলিয়ে বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ভাবনার প্রভাব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ শুধু গদ্যছন্দ, কলাবৃত্ত ছন্দের স্রষ্টা কিংবা মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের বা দলবৃত্ত ছন্দের সর্বোত্তম সংস্কারকই নন, তিনি ছন্দের উৎকর্ষ ঘটিয়েছেন নানাভাবে। যেমন তিনি ছন্দ মুক্তি ঘটিয়েছেন 'মুক্তক ছন্দ' রচনার মাধ্যমে। আবার মধুসূদন অমিল প্রবাহমান পয়ার পর্যন্ত এসে থেমেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রকাশ পেল সমিল প্রবাহমান পয়ার। এককথায় রবীন্দ্রনাথ সার্বিক ভাবে বাংলা ছন্দের মুক্তি ঘটিয়েছেন, প্রসারিত করেছেন তার ক্ষেত্রকে। তাই

প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন- "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ছন্দ সমৃদ্ধির কথা বিবেচনা করলে সহজেই উপলব্ধি হবে যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলার শুধু কবিগুরুই নন, তিনি আমাদের ছন্দোগুরু বটেন।"[৯]

তাই রবীন্দ্রনাথ সমকালীন ও পরবর্তীকালের বহু প্রধান ও অপ্রধান কবিরা নির্দ্বিধায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে মেনে নিয়েছেন। রমণীমোহন ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রজনীকান্ত সেন, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিগণ তো বটেই স্বয়ং নজরুলও কোথাও কোথাও রবীন্দ্র ছন্দের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এমনকি একালের কবিরাও রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হয়ে কোনো বলিষ্ঠ ছন্দোরীতি প্রয়োগ করতে পারেননি। এমন সর্বগ্রাসী শক্তি রবীন্দ্রনাথ ছড়িয়ে গেছেন তা ভাবলেই বিস্মিত হতে হয়। সেজন্য রবীন্দ্রোত্তর কবিরা জ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় রবীন্দ্রনাথকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। পরিশেষে বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান অবদানকে সূত্রাকারে বললে এমন বলা যেতে পারে-

- বাংলা ছন্দের আলোচনায় 'অক্ষর' সংখ্যা গণনার অনাবশ্যকতা।
- সাধুরীতির ছন্দে শব্দান্ত রুদ্ধ দলের দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রক উচ্চারণ।
- সাবেক সাধুছন্দের বিশ্লেষণে সিলেবল -এর (মাত্রার) ভূমিকা এবং এজাতীয় ছন্দের মিশ্রপ্রকৃতি স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা।
- লৌকিক ছন্দের ক্ষেত্রে সিলেবল গোনা প্রকৃতি স্বীকার।
- তিন রীতি ভেদে ত্রিবিধ পয়ারের পরোক্ষ স্বীকৃতি।
- গদ্য ছন্দের কবিতার শৈল্পিক ব্যবহার।
- অমিল মুক্তকের ব্যবহার।
- সমিল প্রবাহমান পয়ারের স্বীকৃতি।

আমরা আমাদের আলোচনায় রবীন্দ্র সৃষ্টি সম্ভারের তেমন কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিনি বরং ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রচিন্তনের পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছন্দবিষয়ক অবদানের দিকটিও ওঠে এসেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য কবিতায় ছন্দকে ভেঙেচুরে ব্যবহার করেছেন, গড়েছেন নতুনভাবে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রবন্ধ, বিভিন্ন আলোচনায় যেভাবে ছন্দ সম্পকে চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তাতে তাঁর ছান্দসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। আপন ক্ষমতা বলে তিনি হয়ে উঠেছেন 'ছন্দোগুরু'। আসলে রবীন্দ্রনাথ চিরজীবনই বিচিত্রের সন্ধান করে গেছেন, যা পেয়েছেন তাকে আঁকড়িয়ে থাকেননি। প্রকৃতপক্ষে নব নব রূপের সন্ধানই তিনি সারাজীবন ধরে করে গেছেন। কোনো প্রাচীন ছন্দোরীতিরই তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেননি, সর্বদাই তাকে নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন এবং সফলও হয়েছেন আপন ক্ষমতাবলে। তাই সব দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হবে রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছন্দের সার্থক ও মহান রূপকার। তিনি শুধু কবি নন, তিনি একজন সার্থক ছন্দোশিল্পী। তাই ছন্দ সম্পর্কিত তাঁর ভাবনা-চিন্তা, ব্যাখা-বিশ্লেষণ একালের কবিদের তো বটেই ভবিষ্যৎ কবিদেরও পাথেয় হয়ে থাকবে, একথা বলাই যায়।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছন্দ। বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪১৫, পৃ. ৪।
২. তদেব, পৃ. ৩১।
৩. তদেব, পৃ. ১৮৯।
৪. সেন, প্রবোধচন্দ্র। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ। আনন্দ পাবলিশার্স, মে ২০১১, পৃ. ২৪।
৫. সেন, প্রবোধচন্দ্র। নূতন ছন্দ পরিক্রমা। আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ২৩৭।

৬. সেন, প্রবোধচন্দ্র। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ। আনন্দ পাবলিশার্স, মে ২০১১, পৃ. ৪।

৭. তদেব, পৃ. ৪৩।

৮. তদেব, পৃ. ৪০।

৯. তদেব, পৃ. ৩।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. মুখোপাধ্যায়, অমূল্যধন। কবিগুরু (রবীন্দ্রকাব্যের মূলসূত্র)। দশহরা (২য় সংস্করণ), দে'জ পাবলিশিং, ১৩৭১, কলকাতা, ৭০০০৭৩।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দশম খণ্ড)। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ৯-ই মে-২০১১, কলকাতা, ৭০০০৭৩।

৩. সেন, নীলরতন। আধুনিক বাংলা ছন্দ (দ্বিতীয় পর্ব)। প্রথম দে'জ সংস্করণ, অক্টোবর-১৯৯৫, কলকাতা, ৭০০০৭৩।

৪. সেন, প্রবোধচন্দ্র। ছন্দ সোপান ও ছন্দ চর্চা চতুর্থ সংস্করণ। অণিমা প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৮, কলকাতা, ৭০০০০৯।

৫. সেন, প্রবোধচন্দ্র। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, তৃতীয় মুদ্রণ। আনন্দ পাবলিশার্স, মে-২০১১, কলকাতা, ৭০০০০৯।

৬. সেন, প্রবোধচন্দ্র। নূতন ছন্দ পরিক্রমা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর-২০১২, কলকাতা, ৭০০০০৯।

৭. কামিল্যা, মিহির চৌধুরী। বাংলা ছন্দ: রূপ ও রীতি, অষ্টাদশ সংস্করণ। সন্দীপ, ২০১২, কলকাতা, ৭০০০০৯।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 664-672
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.256

‘বাঙ্গলার কথা’ ও ‘বাঙালি পেট্রিয়টিজম্’: ব্যক্তিত্ব ও ব্যবধান: একটি তুলনামূলক আলোচনা

রাহুল মণ্ডল, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.01.2026; Accepted: 13.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article presents a comparative study of Chittaranjan Das’s *Banglar Katha* and Pramatha Chaudhuri’s *Bangali Patriotism* in the context of early twentieth-century Bengal, a period marked by the Swadeshi movement, the rise of nationalist politics, and critical reassessment of Western education. Focusing on Bengal as the central conceptual space, the article examines how these two influential figures articulated ideas of Bengali identity, provincial nationalism, and their relationship with broader Indian nationalism.

Chittaranjan Das, as a lawyer and nationalist leader, projected an inclusive and integrative vision of Bengal, emphasizing cultural unity across religious and social divisions and linking Bengal’s past glory with the political responsibilities of the present. His understanding of nationalism sought to harmonize regional consciousness with an all-India struggle against colonial rule. In contrast, Pramatha Chaudhuri, a leading literary intellectual, conceptualized Bengali identity as culturally distinct and psychologically autonomous, often highlighting the uniqueness of Bengali society and literature within India. His critique of Western education and his skepticism toward the Indian National Congress further differentiated his position.

Despite these differences, the article argues that both thinkers shared significant common ground. Both were Western-educated yet increasingly critical of colonial educational models, both demonstrated deep emotional attachment to Bengal, and both ultimately rejected any rigid separation between love for Bengal and love for India. Their writings reveal that provincial or sub-national consciousness did not negate Indian nationalism; rather, it functioned as one of its vital sources.

By analyzing the convergences and divergences in their political thought, cultural outlook, and literary engagement, this study underscores the complexity of regional nationalism in colonial India and highlights Bengal’s dual role as a site of distinct cultural identity and as an integral component of the wider Indian nationalist movement.

Keywords: Bengal, Nationalism, Literature, Patriotism, India

বিংশ শতকীয় ভারতীয় রাজনীতিতে শুরু থেকেই এক পরিবর্তন, পরিমার্জনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। মূলত বঙ্গভঙ্গের সময়কালে স্বদেশী ও বয়কটের মধ্য দিয়ে বাংলাকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক পালা বদলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা বাংলায় স্বাদেশিকতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় সংগঠিত স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে বিশের দশকের ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিবর্তন হয়েছিল কারণ ভারতের অপরাপর অঞ্চলগুলিতেও জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্তার ঘটেছিল, এবং সেইসঙ্গে

আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সত্তা নির্মাণের একটি সমান্তরাল ধারার প্রসারও ঘটেছিল।[১] পাশাপাশি এই সময় বাংলাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রাজনীতিতে একদিকে যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটেছিল, তেমনই অন্যদিকে সাংস্কৃতিক জগতে স্বদেশী সাহিত্য, গান প্রভৃতি লেখালেখির এক জোয়ার এসেছিল। এই সময় বাংলার বিপ্লবী কার্যকলাপের পাশাপাশি ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আগমন এক আদর্শগত সংঘাতের প্রেক্ষাপটের সূচনা করেছিল। এই সময়কালের অনেকে গান্ধীবাদী অহিংস মতাদর্শের প্রতি সম্মতি জানিয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক পন্থা বেছে নিয়েছিলেন, অপরদিকে গান্ধীবাদ-বিরোধী হিংসাত্মক বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে অনেকে পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।

বাংলাকে কেন্দ্র করে এক নতুন 'বঙ্গীয় দেশাত্মবোধ' বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সূচনা ঘটেছিল এক নতুন প্রবণতা, যাকে রাজনীতির বাঙালিয়ানা বলা চলতে পারে। আর এই প্রক্রিয়ায় ভূমিকা নিয়েছিল এক নতুন প্রজন্ম, যাদের অনেকেই ছিলেন মফস্বলের। তাছাড়া এসময়ে সৃষ্টি হয় এক নতুন সাংস্কৃতিকপরিমণ্ডল; সাহিত্যের এই সময়কালকে কল্লোল যুগ (১৯২৩-২৯) বলা হয় যা নতুন ভাবনা নিয়ে এসেছিল। আর গ্রাম, ছোটো শহর এবং কলকাতার বিস্তীর্ণ পশ্চাদ্ভূমির জীবনযাত্রার সঙ্গে ব্যাপৃত ছিল; যে দিকটা কলিকাতার পূর্ববর্তী এলিট গোষ্ঠীর দ্বারা অবজ্ঞাত থেকে গিয়েছিল।[২] এই প্রেক্ষাপটে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জনের (১৮৭০-১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ) রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের সূত্রপাত ঘটে। ওইবছর এপ্রিল মাসে ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে দেওয়া ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি রাজনীতির জগতে পদার্পণ করেন।[৩] পাশাপাশি এই রাজনৈতিক পরিসরেই নিজের সাহিত্যিক প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিখ্যাত প্রাবন্ধিক-সাহিত্যিক প্রমথনাথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ)।

চিত্তরঞ্জন দাশ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে নিজের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা করলেও আইনজীবী হওয়ার সুবাদে এর পূর্বে তাঁর বিভিন্ন বিপ্লবী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যোগ ছিল। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন তিনি, এই সভাতেই তিনি তাঁর বিখ্যাত *'বাঙ্গলার কথা'* নামক বক্তৃতাটি প্রদান করেন। অন্যদিকে বাংলার এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই সাহিত্যিক প্রমথনাথ চৌধুরী তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় এক জনৈক বন্ধুর উদ্দেশ্যে লেখা চিঠির প্রত্যুত্তর হিসেবে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন *'বাঙালি পেট্রিয়টিজম্'* নামক প্রবন্ধটি।

উভয়ের আলোচনার মূল কেন্দ্র বাংলাকে ঘিরে। একই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে বাংলাকে স্থান দিয়েছেন। কারণ, তাঁরা উভয়েই প্রথমে বাঙালি, পরে ভারতীয়। যদিও, এই দুই পরিচিতির মধ্যে তাঁরা উভয়েই কি কোনো পার্থক্য করেছিলেন? তাঁদের কাছে কোন পরিচিতিটা বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল? তাঁদের কাছে তাঁদের জন্মভূমি বাংলার প্রতি যে প্রেম ও ভালোবাসা অর্থাৎ এই প্রাদেশিক দেশপ্রেমের (Provincial Nationalism/Sub-Nationalism) সঙ্গে কি তাঁদের বৃহত্তর দেশপ্রেম অর্থাৎ ভারত-প্রেমের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল? নাকি চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা (বাঙ্গলার কথা) ও প্রমথ চৌধুরীর লেখনীতে (বাঙালি পেট্রিয়টিজম্) বাংলা ও ভারত-প্রীতি মিলেমিশে গিয়েছিল? এছাড়া উভয়েই বাংলার প্রতি যে প্রেম ও অনুরাগ দেখিয়েছেন, তার মধ্যে কি কোনো দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল? – এসবগুলি এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। একজন আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ অন্যদিকে অপরজন সাহিত্যিক। সুতরাং, উভয়ের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে পার্থক্য থাকবেই তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু, যদি আমরা উভয়ের ব্যক্তি জীবন লক্ষ করি তবে বেশ কিছু বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাবো। যেমন– বাঙালি হলেও দুজনেই ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত। (চিত্তরঞ্জনের) পড়াশুনা প্রথমে সেযুগে বাংলার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্সি কলেজে, পরে আইন শিক্ষা লন্ডনের ইনার টেম্পল এবং ইংলন্ডের বার

কাউন্সিলে।[৪] অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে একথা স্পষ্ট লিখেছেন যে, তিনি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালি থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। কিন্তু মন দিয়ে প্র্যাকটিস্ করলেন না কোনদিন।[৫] উভয়েই ইংরেজি শিক্ষিত হলেও একটা সময়ের পর দুজনেই ইউরোপীয় শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং তা নিয়ে সমালোচনা করেন। যেমন– চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর *'বাঙ্গলার কথা'*- য় বলেছেন–

> "...আমার মনে হয়, ইংরাজী শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষাবিস্তার করায় অনেক দোষ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। আমাদের হাব ভাব, আচার-ব্যবহার সবই এত ইংরাজী নবীশ হইয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গলাদেশের কোনো যোগ নাই।... বিলাতের ফ্যাকটরিতে যেমন নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, আমাদের ইউনিভারসিটি ফ্যাকটরিতে বি.এ., এম.এ., পি.এইচ.ডি., পি.আর.সি., এইরূপ কতগুলি জীব তৈয়ারী হয়, প্রকৃত মানুষ তৈয়ারী হয় না।"[৬]

অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'বাঙালি পেট্রিয়টিজম্'-এ নিজের প্রতি ব্যাঙ্গ করে লিখেছেন–

> "... বাংলাদেশের বাঙালির ঘরে জন্মালেও আমি খাঁটি বাঙালি নই।... পাঁচ থেকে প'চিশ বৎসর বয়েস পর্যন্ত ইংরেজি-শাসিত স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে আমি হয়ে উঠেছি একজন নিয়ো-ইন্ডিয়ান ওরফে নন-ইন্ডিয়ান...।"[৭]

চিত্তরঞ্জনের আইনজীবী হিসেবে খ্যাতি ছিল প্রচুর, স্বদেশী আন্দোলনের সময় কয়েকটি চাঞ্চল্যকর মামলা লড়ে তাঁর জনজীবনে প্রবেশ। এই মামলাগুলিতে তিনি অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের রক্ষা করেছিলেন। বস্তুত এই মামলাগুলির খ্যাতিই তাঁকে পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে অন্যতম সফল আইনজীবীর পরিচয় দিয়েছিল। ১৯১৭ সালে তিনি সরাসরি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আঙিনায় পা রাখেন। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে ভারতের সফলতম আইনজীবী উকিলের শামলা পরিত্যাগ করে পুরোদস্তর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। হয়ে ওঠেন বাংলার মানুষের নয়নের মণি।[৮] অপরদিকে প্রমথ চৌধুরী আইনজীবী হিসেবে তেমন খ্যাতি লাভ না করলেও প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। *'সবুজ-পত্র'* প্রমথ চৌধুরীর অনবদ্য সৃষ্টি। পত্রিকাটির মাধ্যমে তিনি গড়ে তুলেছিলেন-বাঙলা সাহিত্যের 'বীরবলী যুগ' ও 'বীরবলী চক্র'।[৯] অন্যদিকে, চিত্তরঞ্জন দাশের পেশাগত সাফল্য ছাড়াও তাঁর চরিত্রের আরেকটা দিক ছিল সাহিত্যচর্চা। তিনি শুধু যে পাঁচটি উঁচুদরের কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা, বেশ কয়েকটি গল্প আর প্রচুর উপাদেয়, সুচিন্তিত প্রবন্ধের লেখক তাই নয়, এর পাশাপাশি তিনি নিজের পেট থেকে বহু অর্থ ব্যয় করে সেযুগের অন্যতম সেরা সাহিত্যপত্র 'নারায়ণ' সম্পাদনা করেছেন বেশ কিছুদিন ধরে।[১০]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাকে কেন্দ্র করে এদেশে যে পাশ্চাত্য ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল সেখানে এদেশীয়রা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আপন করে নিয়েছিল। কিন্তু, এই শতকেরই দ্বিতীয়ার্ধে বা শেষদিকে এর এক উল্টো চিত্র লক্ষ করা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে এদেশীয়দের মোহ ভঙ্গ হয়। অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরি তাঁর *"Europe Reconsidered: Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal,"* (১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ) গ্রন্থে এরকমই একটি পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করেছেন। তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৮-১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ) প্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে এই প্রবণতা কীভাবে ফুটে উঠেছে তা দেখিয়েছেন। এই একই প্রবণতা আমরা চিত্তরঞ্জন দাশ এবং প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য ও লেখার মধ্যে লক্ষ করলেও তাঁদের উভয়ের ক্ষেত্রে একটি জায়গায় সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল। প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিষয়ে অনীহা বা ব্যাঙ্গ করলেও তিনি

একথা স্বীকার করেছেন যে, ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের দেশে যে উচ্চশিক্ষা প্রদানের যে ব্যবস্থা ব্রিটিশদের দ্বারা করা হয়েছে তা ভারতবাসীর জাতীয় শক্তিকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন-

> "আজ ইউরোপীয় শিক্ষা বয়কট করবার যে হুজুক উঠেছে তাতে যে বাঙালি সোৎসাহে যোগদান করতে পারছে না, তার কারণ... উচ্চশিক্ষাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় শক্তি উদবোধিত করবার সর্বপ্রধান উপায়।"[১১]

অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর বক্তৃতার 'আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা' অংশে তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার এক পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করেছেন। তিনি বাংলার অতীতে যে রামায়ণ-মহাভারত, চন্ডীগান, ভাগবত পাঠ, হরিভজন প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তারের প্রক্রিয়া চালু ছিল তার এবং বাংলার বিভিন্ন জেলায় যে টোলভিত্তিক শিক্ষা প্রণালী ছিল তার মাধ্যমে শিক্ষাদানে পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেছেন–

> "রামমোহন যে ইংরেজি ভাষার শিক্ষা ও যে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে দেশের শিক্ষা বিস্তার করিবার পন্থা দেখাইয়া দিয়েছিলেন– তাহা হয়ত ঠিক সেই সময়ে আবশ্যকীয় ছিল।... আমাদের উচ্চশিক্ষা আমাদের ভাষায় দিতে হইবে।"[১২]

প্রমথ চৌধুরী এবং চিত্তরঞ্জন দাশের ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে একটি বড়ো সাদৃশ্যের জায়গা হল দুজনেরই কোনো না কোনোভাবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এবং উভয়েই রবীন্দ্র-ঘনিষ্ঠ ছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সরাসরি পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করেন। অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন একটা সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির খামখেয়ালি ক্লাবের সভ্য ছিলেন। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ঘটে। চিত্তরঞ্জন যখন দ্বিতীয়বার বিলেত যান তখন চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথ 'সোনারতরী' কাব্য থেকে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে চিত্তরঞ্জন দাশও তাঁর 'সাগর সংগীত-এর' পান্ডুলিপি থেকে কয়েকটি কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন।[১৩]

তবে প্রমথ চৌধুরী ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে রবীন্দ্র সংযোগের এই সাদৃশ্য থাকলেও এক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য ছিল। বলা হয়ে থাকে– চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত পত্রিকা 'নারায়ণ' এর লেখক সূচীতে রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি চিত্তরঞ্জনের রবীন্দ্র বিরোধীতার বহন করে। তৎকালীন প্রায় সব বিশিষ্ট লেখক যেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন প্রমুখ লেখালেখি করতেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট পরিচিত নাম হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের লেখাই 'নারায়ণ'-এ প্রকাশিত হয়নি।প্রমথ চৌধুরীর জীবনীকার জীবেন্দ্র সিংহ রায় এপ্রসঙ্গে লিখেছেন– 'নারায়ণ' (১৩২১) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তি-চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদকরূপে ও বিপিনচন্দ্র পাল ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ও লেখকরূপে। বস্তুতঃ, রবীন্দ্র-বিরোধী ও 'সবুজ-পত্র'-(সবুজ-পত্রের লেখকসম্প্রদায় ও প্রমথ চৌধুরী সহ) বিরোধী পত্র হিসেবেই নারায়ণের আত্মপ্রকাশ।[১৪] চিত্তরঞ্জন তাঁর বিরুদ্ধে রবীন্দ্র বিদ্বেষের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছিলেন–

> "কথাটা ঠিক হলনা, আমি রবিবিদ্বেষী একেবারেই নই, অলৌকিক প্রতিভা আমি কখনও অস্বীকার করিনা, তবে তাঁর সব লেখাই যে ভালো লাগে তা বলতে পারি না।"[১৫]

তার মানে রবীন্দ্র-প্রতিভা নিয়ে চিত্তরঞ্জন দাসের কোনো প্রশ্ন ছিল না। দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল, তাই চিত্তরঞ্জন হয়ত নিজের অজান্তে রবীন্দ্রবিরোধী অবস্থান নিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাতেও নারায়ণ পত্রিকায় রবীন্দ্রবিরোধী লেখা ছাপা হওয়ার পরও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের সৌহার্দ্য কিংবা সৌজন্যটায় কোনও ঘাটতি ছিল না।

অন্তত দেশব্রতী চিত্তরঞ্জনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে লেখা "এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ।/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"[১৬]

অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকার আত্মপ্রকাশের (১৩২১ বঙ্গাব্দ) মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গল্প সাহিত্যে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের মোট দশটি গল্প প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে অন্যতম ছিল– 'হালদার গোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র' প্রভৃতি।

তবে চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতায় খানিকটা ব্যাঙ্গচ্ছলে বা অস্পষ্টভাবে রবীন্দ্র বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রথমদিকে স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' কীভাবে বাঙালি জাতিকে তার স্বরূপ চিনতে সাহায্য করেছিল তা উল্লেখ করেছেন। তবে, অন্য আরেক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন –

> "... যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ – এবার আমেরিকায় এই মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন। ... সেই মতের, এই ক্ষেত্রে বাঙালী জাতির এই মহাসভায় সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।"[১৭]

তবে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে এমন কোনো রবীন্দ্র-বিরূপতার লক্ষণ দেখা যায় না।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের আরেকটি ক্ষেত্র হল চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথমদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত না হলেও ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে সভাপতিত্বের মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হন। কিন্তু, প্রমথ চৌধুরী তাঁর জীবনে কোনো পর্যায়ে এসেই কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হননি। তাঁর 'বাঙালি-পেট্রিয়টিজম্' প্রবন্ধে তিনি কংগ্রেস ও তার সদস্যদের বিষয়ে নানা ব্যাঙ্গ করেছেন। তিনি কখনও পরোক্ষভাবে কংগ্রেসের নেতাদের 'নন্-ইন্ডিয়ান' বলেছেন। এছাড়া কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনকে 'দিন তিনেক ধরে কচায়ন করে' প্রভৃতি বলে ব্যাঙ্গ করেছেন। এছাড়াও কংগ্রেসী পেট্রিয়াটিজমের মূলে আছে নাকি 'বিলেতি পুঁথি পড়া মন' এবং কংগ্রেসের কিছু নেতাদের তিনি 'টিকিওয়ালা-ডিমোক্রাট-রূপ-উদ্ভূত জীব' প্রভৃতি বলে উপহাস করেছেন।[১৮] তবে প্রমথ চৌধুরী তাঁর *'আত্ম-কথা'- য় লিখেছেন-* আমি যেদিন সন্ধ্যায় লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছোই, তার পরের দিনই Inner Temple-এ ভর্তি হই, আর সেই দিন সন্ধ্যাবেলায়ই সেখানে dinner খেতে যাই...। আমি গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড খানা-কামরা লোকে ভরতি। একটি টেবিলে এক বাঙ্গালী ছোকরা বসেছিলেন, তাঁর পাশের চেয়ার খালি দেখে আমি সেই চেয়ারে বসে পড়লুম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন-

-আপনি বাঙ্গালী?

-হাঁ।

-বিলেতে এলেন কবে?

-গতকল্য।

-আমি আপনাকে ছুরিকাঁটা ব্যবহার করতে শেখাই।

-আচ্ছা।

এর পর তিনি আমাকে শেখাতে লাগলেন যে ডান হাতে ধরতে হয় ছুরি, আর বাঁ হাতে কাঁটা। আর কোন্ কাঁটা-ছুরিতে মাছ খেতে হয়, তাও দেখালেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলুম। তারপরে প্রথমে যখন সুরুয়া এল, ভিতরে খোঁদলকরা, প্লেটে, তখন তিনি সে প্লেটটি বুকের দিকে হেলিয়ে চামচ দিয়ে স্তূপ তুলে খেতে লাগলেন। আমি

তাঁকে বল্লুম- "এ প্লেটটি উল্টো দিকে হেলাতে হয়।" তিনি বল্লেন- "আপনি আমাকে শেখাতে এসেছেন?" তখন আমি বল্লুম- "তাকিয়ে দেখুন, ইংরেজরা কিরকম করে স্তূপ খাচ্ছে।" এক নজর দেখে, হাতের চামচ রেখে দিয়ে তিনি আমাকে নমস্কার করলেন। এই ছোকরাটির নাম নলিনী বাঁড়ুজ্যে, আরার বড় উকিল কৈলাসবাবুর ছেলে। বাঙ্গালী, কিন্তু বেহারী বাঙ্গালী।নলিনী ছিলেন সুদর্শন আর অসাধারণ বলিষ্ঠ। পরে তিনি আমার একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু হন।

এ ঘটনা উল্লেখ করবার কারণ এইটে দেখানো যে, আমি বিলেত যাবার পূর্ব্বেই ইংরিজী খানাপিনায় অভ্যস্ত ছিলুম। আমি যে তখন পলিটিক্সে ঘোর স্বদেশী ছিলুম তার প্রমাণ উক্ত টেবিলে আমার অন্য পার্শ্বে একটি ধনী পার্শী যুবক বসেছিলেন; তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন- "তুমি কি একজন কংগ্রেসওয়ালা?" উত্তর-"হাঁ।" এ কথা শুনেই তিনি কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন।[১৯]

অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্ট বাংলা তথা ভারতের যে মুক্তি আন্দোলন তার নেতৃত্বে ভ্রান্তি আছে, সেখানে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের অভাব রয়েছে প্রভৃতির কথা বললেও জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে তেমন কোনও ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ তিনি করেননি।

বেশ কিছু বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও তাঁদের দুজনের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণই বেশি ছিল। উভয়েরই বক্তব্যের মূল ক্ষেত্র বাংলা এবং বাংলার প্রতি ভালোবাসা ও বাঙালি দেশপ্রেম হলেও তাঁদের দুজনের বলা এবং লেখার মধ্যে দৃষ্টিগত অর্থাৎ বাংলাকে কল্পনালোকে দেখার মধ্যে পার্থক্য ছিল। প্রমথ চৌধুরী তাঁর লেখায় বাঙালি জাতিকে সর্বদা একটি আলাদা জাতি হিসেবে ও বাংলাকে একটি আলাদা প্রদেশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন–

> "বর্তমান ভারতবর্ষে বাংলা সাহিত্যের তুল্য দ্বিতীয় সাহিত্য নেই। ভারতবর্ষের অপর কোনো জাতি দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদান করতে পারেনি। ... মনোজগতে আমরা ব্যক্তি ভারতবর্ষের সঙ্গে একলোপে বাস করি নে। ...ইউরোপের সাহিত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি, ভারতবর্ষের অপর কোনো জাত তদনুরূপে পারে নি। ...আমাদের পুঁথিপড়া মনের সঙ্গেও বাকি ভারতবর্ষের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। সুতরাং, আমাদের পলিটিক্যাল মনও অন্য প্রদেশের পলিটিক্যাল মনের ঠিক অনুরূপ নয়।"[২০]

অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন দাশ বাঙালি জাতির এক সমন্বয়ী সর্বজনীন চিত্র তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন–

> "বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃস্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। ... বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টি স্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি।"[২১]

এছাড়া তিনি বাংলাকে মাতৃরূপে কল্পনা করে বলেছেন–

> "মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। ... যেরূপ বিশিষ্ট, সে অনন্ত!"[২২]

প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন–

> "বাঙালি বাঙালি মাত্রেরই স্বজন, তার কারণ ভাষার যোগ হচ্ছে মানসকায়ে রক্তের যোগ। সুতরাং, বাঙালিদের পরস্পরের প্রতি নাড়ির টান থাকাই স্বাভাবিক। না থাকাটাই অদ্ভূত।"[২৩]

- এর অর্থ কি তবে বাঙালি জাতি ব্যতীত অন্যান্য সমগ্র বৃহত্তর ভারতবাসী, যাদের সঙ্গে রক্তের বা ভাষার কোনো যোগ নেই তাঁদের সঙ্গে বাঙালির কোনো আত্মিক যোগ গড়ে উঠবে না বা তা কি সম্ভব নয়? এ নিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু, চিত্তরঞ্জন তাঁর বক্তব্যে এমন কোনো মন্তব্য করেন নি। তিনি এক সমন্বয়ী বাঙালি

জাতিকে কল্পনা করেছেন। তাদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, নিজেদের অধিকারে সরব হতে, প্রতিবাদে সামিল হতে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উভয়ের বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে আমরা যে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা চালিয়েছিলাম তার উত্তর বোধহয় এবার দেওয়া যেতে পারে। ব্যক্তিত্ব হিসেবে উভয়ের মধ্যে কিছু মিল-অমিল যেমন ছিল তেমনই তাঁদের বক্তব্যের এবং লেখার মধ্যেও কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে, সেগুলি মোটামুটি আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করলাম। তবে, একটি বিষয়ে উভয়েরই মধ্যে সাদৃশ্য এখানেই যে, তাঁরা দুজনেই তাঁদের নিজ জন্মভূমি বাংলাকে ভালোবাসা বা বাঙালি দেশপ্রেমের সঙ্গে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে ভালোবাসার মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। কারণ, তৎকালীন বাংলা ও ভারতের সমস্যা ও শত্রু একই ছিল– ইংরেজ সরকার। তাই, তাঁদের এই বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে যে প্রাদেশিক দেশপ্রেমের জয়গান সূচিত হয়েছে তার সপ্তসুর মিলিত হয়েছে বৃহত্তর ভারতবর্ষীয় দেশপ্রেমের সঙ্গে।

তবে, এক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য না থাকলেও প্রমথ চৌধুরী এবং চিত্তরঞ্জন দাশের বাংলাকে দেখার যে প্রেক্ষিত তার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল। চিত্তরঞ্জন তাঁর বক্তব্যে মূলত বাংলার গৌরবময় অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করেছেন এবং বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বাংলার দুর্দশা রক্ষা করার জন্য সমবেত প্রচেষ্টার কথাও তিনি বলেছেন। অর্থাৎ, ইংরেজ শাসনের আগে বাংলায় যে সমৃদ্ধময় অবস্থা ছিল তা ইংরেজদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যেতে থাকে এবং সেই পূর্বের অবস্থাকে ফিরিয়ে আনার জন্যও তিনি নানা উপায়ের কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যেমন লেখক লিখেছিলেন– 'মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, মা যা হইবেন'– চিত্তরঞ্জনের বক্তব্যে ঠিক এই একই সুর ধ্বনিত হয়েছিল। তাই বলা যায়, চিত্তরঞ্জনের বাংলা প্রেম খানিকটা অতীতচারী গৌরবের খোঁজ এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নের বাংলা গড়ার অভিযান। এই অভিযানকার্যে তিনি জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন–

> "একবার এস ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, চন্ডাল, সব একত্র হইয়া সমস্বরে বলি – চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের তাহা চাই। ... ঐ যে মা ডাকতেছে। এস এস, সবাই এস! সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্য, এস এস, সবাই এস! বল ঈশ্বর! বল! আল্লা! বল নারায়ণ, বল বন্দেমাতরম্।"[২৪]

এই প্রসঙ্গে তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তার শেষ রাজনৈতিক বক্তৃতায়, ১৯২৫ সালের ২ মে, বাংলা প্রাদেশিক সভায় বলেন যে স্থানীয় বা প্রাদেশিক জাতীয়তাবাদ এবং সমগ্র ভারতব্যাপী জাতীয়তাবোধের মধ্যে আসলে কোনো বিরোধ নেই। সমস্ত জাতীয়তাবোধ প্রকৃতপক্ষে আত্ম-পরিচিতি ও আত্মবিকাশের অনুসন্ধান এবং সেই পন্থায় শেষ উদ্দিষ্ট হবে একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (Federation of the States of India) যেখানে প্রতি রাজ্যের মানুষ নিজ নিজ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের অনুসরণ করবে স্বাধীনভাবে, এবং ঐ স্বাধীন রাজ্যসমূহের সাধারণ স্বার্থ সাধন করবে সকলে মিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে।[২৫]

অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে অনেক জায়গায় বাংলার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পার্থক্য নির্দেশ করলেও, বাংলার প্রতি তাঁর যে প্রেম ও ভালোবাসা তার সঙ্গে ভারতবর্ষকে ভালোবাসার মধ্যে কোনো চীনের প্রাচীর নেই, যেকথা তিনি নিজেই তাঁর প্রবন্ধের একদম শেষে উল্লেখ করেছেন। চিত্তরঞ্জনের বাংলা দেশপ্রেম যেমন ছিল অতীতচারী বাংলা গৌরবপ্রীতি, অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন– তিনি যে বাংলাকে ভালোবাসেন তা হল ভবিষ্যতের বাংলা–

> "... যে দেশকে আমি অন্তরের সহিত ভালোবাসি, সে বর্তমান বাংলা নয়, অতীত বাংলাও নয়– ভবিষ্যৎ বাংলা... আমার বাঙালি– পেট্রিয়টিজম্ বর্তমান ভারত-বর্ষীয়-পেট্রিয়টিজমের বিরোধী নয়।"[২৬]

পরিশেষে, বিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত প্রধান প্রবণতা বাংলার ইতিহাসকে নির্মাণ করেছিল তার মধ্যে সর্বাগ্রে আসে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে পুনর্ভাবনা এবং একটি নতুন ধরনের বাঙালি দেশাত্মবোধের বিকাশ। বাঙালিয়ানায় পরিপূর্ণ স্বাজাত্যপ্রেমের এক- নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেন রাজনৈতিক নেতৃবর্গ একটি আঞ্চলিক সত্তা নির্মাণের প্রয়াসে, এবং বিদ্বজ্জনেরা তার ভিত্তিকে শক্ত করেন বাংলার ইতিহাস, ভাষা, এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান দ্বারা। তাদের এই নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য কখনোই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলস্রোতের পরিপন্থী ছিল না এবং নির্মীয়মাণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যহীনতার প্রশ্নও এই নির্মাণকল্পে ছিল না। তথাপি ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলার ক্রমবর্ধমান প্রান্তিকতার আশঙ্কা বাংলার চিন্তকদের এই আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সত্তা নির্মাণপ্রকল্পকে প্ররোচিত করেছিল। ১৯২০-র দশকে একই সঙ্গে আরও একটি ধারা চোখে পড়ে, এটি হল রাজনীতির বাঙালিয়ানা (vernacularization of politics)। এর মানে কেবল এটাই নয় যে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা ও লেখায় নতুন ভোটাধিকার প্রাপ্ত এবং ইংরেজি শিক্ষাবিহীন মানুষদের কাছে পৌঁছোনোর চেষ্টা। সঙ্গে ছিল জনপরিসরের (public sphere) সামগ্রিক কার্যকলাপ বিশেষত ভাবপ্রকাশের ভাষ্য, বাগধারা ও শৈলীর মধ্যে দিশি বা বাঙালি ভাবের প্রবর্তন।[২৭]

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, সব্যসাচী। বাংলায় সন্ধিক্ষণ: ইতিহাসের ধারা ১৯২০-১৯৪৭। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৪, নয়া দিল্লী, পৃ. ৪।

২. তদেব, পৃ. ১৭।

৩. মুখোপাধ্যায়, শৌভিক। চিত্তচরিত: চিত্তরঞ্জন থেকে 'দেশবন্ধু' হয়ে ওঠার গল্প। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০২৫, নয়া দিল্লী, পৃ. ১৭৪।

৪. তদেব, পৃ. ৫।

৫. রায়, জীবেন্দ্র সিংহ। প্রমথ চৌধুরী। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৮।

৬. দত্ত, মনীন্দ্র ও দত্ত, হারাধন (সম্পা.)। দেশবন্ধু রচনাসমগ্র (তৃতীয় খণ্ড: রাজনৈতিক প্রবন্ধ বক্তৃতাবলী) তুলি কলম, কলকাতা, পৃ. ৪৮।

৭. চৌধুরী, প্রমথ। প্রবন্ধ সংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা। পৃ. ৪০৫।

৮. মুখোপাধ্যায়, শৌভিক। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪।

৯. রায়, জীবেন্দ্র সিংহ। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৪।

১০. মুখোপাধ্যায়, শৌভিক। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০।

১১. চৌধুরী, প্রমথ। প্রবন্ধ সংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা। পৃ. ৪১১।

১২. দত্ত, মনীন্দ্র ও দত্ত, হারাধন (সম্পা.)। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৭।

১৩. মালিক, তপন। "কতখানি রবীন্দ্র বিদ্বেষী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস"। https://bangla.asianetnews.com/life/know-about-the-relation-between-deshbandhu-chittaranjan-das-and-rabindranath-tagore-tmb-qjblan/articleshow-0niixr.

১৪. রায়, জীবেন্দ্র সিংহ। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৭।

১৫. মালিক, তপন। প্রাগুক্ত। https://bangla.asianetnews.com/life/know-about-the-relation-between-deshbandhu-chittaranjan-das-and-rabindranath-tagore-tmb-qjblan/articleshow-0niixr.

১৬. মালিক, তপন। প্রাগুক্ত। https://bangla.asianetnews.com/life/know-about-the-relation-between-deshbandhu-chittaranjan-das-and-rabindranath-tagore-tmb-qjblan/articleshow-0niixr.

১৭. দত্ত, মনীন্দ্র ও দত্ত, হারাধন (সম্পা.)। প্রাগুক্ত। পৃ. ২১।

১৮. চৌধুরী, প্রমথ। প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪১১।

১৯. চৌধুরী, প্রমথ। আত্মকথা। দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেড, কলকাতা। পৃ. ৮৮-৯০।

২০. চৌধুরী, প্রমথ। প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪০৯-৪১০।

২১. দত্ত, মনীন্দ্র ও দত্ত, হারাধন (সম্পা.)। প্রাগুক্ত। পৃ. ২০।

২২. তদে, পৃ. ২০।

২৩. চৌধুরী, প্রমথ। প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪০৪।

২৪. দত্ত, মনীন্দ্র ও দত্ত, হারাধন (সম্পা.)। প্রাগুক্ত। পৃ. ৬৮-৬৯।

২৫. ভট্টাচার্য, সব্যসাচী। প্রাগুক্ত। পৃ. ৮।

২৬. চৌধুরী, প্রমথ। প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪১২।

২৭. ভট্টাচার্য, সব্যসাচী। প্রাগুক্ত। পৃ. ১।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

শৌভিক মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 673-680
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.257

স্বাধীন ভারতের শিখ পরিচিতির আন্দোলন: পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

শুক্লা মণ্ডল, *গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.01.2026; Accepted: 20.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

A historic ethnolinguistic campaign in post-1947 India called the Punjabi Suba movement aimed to establish a province specifically for Punjabi speakers. The movement was closely linked to the Sikh community's struggle for political and cultural autonomy inside the Indian Union, even if its ostensible foundation was the idea of linguistic reorganisation. The nearly two-decade-long movement, which was spearheaded by the Shiromani Akali Dal, was marked by widespread demonstrations, acts of civil disobedience, and hunger strikes. When the conflict peaked in 1966, the central government was compelled to divide the pre-existing state of East Punjab. This resulted in the transfer of hilly areas to Himachal Pradesh, the creation of the present-day Punjabi-majority state of Punjab, and the Hindi-speaking state of Haryana. Beyond just redrawing maps, the movement established the current administrative and linguistic boundaries of Northern India and significantly altered the region's identity politics. With an emphasis on the Suba movement's historical evolution and sociopolitical relevance, this essay employs an analytical methodology and secondary sources.

Keywords: Khalistan, Suba Movement, linguistic, Reorganization, Sovereign Sikh state, Khalsa

পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট কার্যত স্বাধীনতা পূর্বেই শুরু হয়েছিল যখন মহম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিমদের জন্য ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবী করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৫০-১৯৬০ এর দশকে যে বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে সবথেকে বেশি সমস্যার সৃষ্টি হয় সেটি হলো ভাষা। সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষাকে মূলত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা এবং হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী বিভক্তিকরণ পাঞ্জাবের জনসংখ্যার আমুল পরিবর্তন করে।দেশভাগের পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে পাকিস্তানি পাঞ্জাবের জেলাগুলি থেকে হিন্দু এবং শিখরা ভারতে চলে আসে এবং একইভাবে মুসলিমরা পাকিস্তানে চলে যায়, এর ফলে ভারতের পাঞ্জাবে ঠিক সংখ্যা গরিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। এরপরে ৩ সালে সরকারের দুটি পদক্ষেপ শিখ রাজ্যের ধারণাকে জোরালো করে তুলতে সাহায্য করে। প্রথমত, PEPSU বা Patiala and East Punjab State Union এর গঠন দ্বিতীয়ত, পাঞ্জাবকে হিন্দি ও পাঞ্জাবি ভাষা নিয়ে দ্বিভাষী রাজ্য ঘোষণা করা। এখানে কোন গোপনীয়তা ছিল না যে পাঞ্জাবি সুবা পাঞ্জাবি ভাষা ও সাহিত্যকে ভিত্তি করে শিখরা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ

জনসংখ্যা গঠন করতে চেয়েছিল। আকালি দল State Reorganization Commission এর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঞ্জাবি সুবা বা পাঞ্জাবি ভাষী রাজ্য গঠনের জন্য তাদের মামলাটি পেশ করে এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। পরে State Reorganization Commission পাঞ্জাবি সুবার দাবিকে দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রত্যাখ্যান করে। প্রথমত, কমিশন গুরুমুখী ভাষাকে হিন্দি থেকে ব্যাকরণগতভাবে আলাদা বলে স্বীকৃতি প্রদান করেনি। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনে ওই অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ জনগণের সমর্থনের অভাব দেখা গিয়েছিল। কমিশনের দ্বারা পাঞ্জাবি ভাষার আলাদা মর্যাদার প্রত্যাখ্যান শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রচন্ড ক্ষুব্ধ করে তোলে। এবং আকালি দলের নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলন চলতে থাকে। 1965 সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, যেখানে শিখরা প্রশংসনীয় অবদান গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় পার্লামেন্ট অবশেষে আকালিদের দাবি পাঞ্জাবী সুবাকে গ্রহণ করে এবং Punjab State Reorganization Bill এর অধীনে রাজ্যটি দ্বিখন্ডিত হয় সাথে দক্ষিণ হিন্দিভাষী সমতল জেলাগুলি নিয়ে হরিয়ানা নামে একটি নতুন রাজ্য গঠিত হয়। পাঞ্জাবি শুভ আন্দোলনের ইতিহাস দেখায় কিভাবে একটি ভাষা একটি গোষ্ঠীর পরিচিতি হয়ে উঠতে পারে।

একটি আদর্শ সার্বভৌম শিখ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের চিন্তাভাবনা থেকে শিখরা কখনোই খুব বেশি দূরে ছিল না। Khushwant Singh তার বই *'A History Of The Sikhs, Vol II'* তে লিখেছেন,

> "The ideal of a sovereign Sikh state has never been very far from the Sikh mind. Ever since the days of Guru Gobind Singh, Sikh congregations have chanted the litany raj karey ga Khalsa the Khalsa shall rule-at the end of their daily prayers; innumerable Sikhs gave their lives to achieve this ambition" (Singh 286)

পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলনের সৃষ্টি কার্যত স্বাধীনতা পূর্বেই শুরু হয়েছিল যখন মহাম্মদ আলি জিন্নাহ মুসলিমদের জন্য ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবি করে এর বিপরীতে পাল্টা দাবি হিসেবে শিখরা নিজেদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি তুলেছিল। শিখদের জন্য পৃথক আবাসভূমি (Homeland) এর দাবী প্রাথমিকভাবে মাস্টার তারা সিংয়ের নেতৃত্বে উত্থাপিত হয়েছিল (Suri 32)।

ভারতে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৫০-১৯৬০ এর দশকে যে বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে সব থেকে সমস্যার সৃষ্টি হয় সেটি হল ভাষা। দেশভাগের আগে পর্যন্ত সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দি বা উর্দু কোনটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে সেটি নিয়ে নানারকম তর্কবিতর্ক দেখা যায়। যখন বিভাজনের বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ১৯৪৬ সালে গণ পরিষদে এক ভোটের ব্যবধানে হিন্দুস্থানিরা হিন্দি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহন করার জন্য ভোট প্রদান করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতীয় ভাষা এবং সরকারি ভাষা নির্ধারিত হয় হিন্দি ও ইংরেজি এই দুটি ভাষার ওপর ভিত্তি করে, ভারতের সংবিধান প্রণেতারা ভারতের বেশিরভাগ প্রধান আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে সংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করেছিলন। কিন্তু সরকারি ভাষা হিসেবে যে ভাষাটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল সেটি মূলত প্রভাবশালী উত্তর ভারতীয় হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠদের ভাষা। যদিও সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা হিন্দির পাশাপাশি সহবস্থান করেছিল (Deol 179-180)।

সারা রাষ্ট্রব্যাপী ভাষাগত গোষ্ঠীগুলোর পৃথক রাজ্যের জন্য আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯৫৬ সালে ভাষাগত সীমানা অনুসারে রাজ্যগুলির ব্যাপক পুনর্নির্মাণ ঘটে। শুধুমাত্র পাঞ্জাবি, সিন্ধি এবং উর্দূ এই তিনটি ভাষা রাজ্য গঠনের জন্য বিবেচিত হয়নি। ১৯৫০ সালের আগস্টে এই কারনটাই আকালি দলকে তার প্রথম বড় আন্দোলনের সূচনা করতে প্ররোচিত করে; যা প্রায় দুই দশকের বেশী সময় ধরে চলে (Deol 180)। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা এবং হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যগরিষ্ঠ এলাকার ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী

বিভক্তিকরণ পাঞ্জাবের জনসংখ্যার গঠনের আমুল পরিবর্তন করে। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে পাকিস্তানি পাঞ্জাবের পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলির সমগ্র হিন্দু ও শিখ জনগোষ্ঠী ভারতে চলে আসে এবং একইভাবে পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানরা, পাকিস্তানে চলে যায় (Kapur 208)। পাঞ্জাব প্রদেশের উভয় পাশে দুই মিলিয়ন শিখের সমানভাবে বসবাস ছিল যাদের অর্ধেক ভারতে এবং অর্ধেক পাকিস্তানে চলে যাবে বলে ঠিক হয় (Deol 180)। ১৯৪৭ সালে দেশত্যাগের ফলে শিখরা মহারাজা রঞ্জিত সিং এর রাজধানী লাহোর এবং গুরু নানকের জন্মস্থান নানকানা সাহেব এর সাথে সাথে ১৫০ টি ঐতিহাসিক উপাসনালয় হারায় এবং এর সাথে তাদের অনেক সমৃদ্ধশালী উর্বর জমি ও পরিত্যাগ করতে হয়। ভারতীয় পাঞ্জাব ১৯ টি জেলার মধ্যে ১৩ টি পেয়েছে যার পরিমাণ সমগ্র পাঞ্জাবের মাত্র ৩৮ শতাংশ ভূমি। দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তুদের ব্যাপক অভিবাসন ভারতীয় পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক গঠনকে উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তন করে এবং পাঞ্জাব দুটি মুখ্য সম্প্রদায়ের প্রদেশে পরিণত হয়। মুসলিমদের বাস্তুচ্যুতি হিন্দুদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে এবং শিখরা ভারতীয় পাঞ্জাবে একটি ছোট বিক্ষিপ্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়। (Deol 181)। ১৯৪১ সালে অবিভক্ত পাঞ্জাবে সমগ্র জনসংখ্যার হিন্দু ছিল ২৬ শতাংশ এবং শিখ ছিল ১৩ শতাংশ কিন্তু দেশভাগের পর ১৯৫১ সালে পাঞ্জাবের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ৬১ শতাংশ হিন্দু এবং ৩৫ শতাংশ শিখ (Kapur 208)।

এই দেশভাগ একটি নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, মুসলিম সম্প্রদায়ের ফেলে যাওয়া জমি সম্পত্তির অধিগ্রহণের জন্য হিন্দু এবং উদ্বাস্তু শিখদের মধ্যে বিদ্বেষ তৈরি হতে থাকে। শিখ কৃষকেরা পুনর্বাসনের লোনের ক্ষেত্রে হওয়া প্রশাসনিক বিলম্বের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এর মধ্যে থেকে পশ্চিম পাঞ্জাবের ব্যবসায়িক শ্রেণী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশভাগের ফলে তারা পুঁজি হারিয়ে ফেলেছিল এবং এখানে সেরকম কোন মুসলিম ব্যবসায়ী ছিল না যাদের স্থান তারা গ্রহণ করতে পারত এবং সরকার তাদের অর্থ প্রদান করার মতন পরিস্থিতিতে ছিল না, সরকার এই পরিস্থিতিতে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি যা শিখ সম্প্রদায় ও গভর্মেন্টের মধ্যে তিক্ততা তৈরি করে (Singh 289)। Khushwant Singh তার বই '*A History Of The Sikhs, Vol II*' -এ লিখেছেন,

> "Sikh trading classes of western Punjab were more severely hit. Their capital was lost. There were no Muslim traders in east Punjab whose place they could take, and the government was not in a position to give them enough money to restart their businesses. Too proud to beg, their pride did not prevent them from being extremely bitter with a government..." (Singh 290).

১৯৪৮ সালে সরকার দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা এই শিখ রাজ্যের ধারণাকে জোরালো করে তোলে (Singh 290)। স্বাধীনতা পরবর্তী পাঞ্জাবের শহুরে এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার বিন্যাস এমন ভাবে ছিল যে হিন্দু জনসংখ্যা মূলত শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল যার ফলে ১৯৪৮ সালের পাঞ্জাব আবার দুটি প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ছোট শিখ রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে PEPSU বা Patiala and East Punjab State Union গঠিত হয় যেখানে শিখ সম্প্রদায় এবং হিন্দুরা প্রায় সংখ্যায় সমান ছিল ৪৯.৩ শতাংশ এবং ৪৮.৮ শতাংশ (Deol 181)। PEPSU এর রাজপ্রমুখ হিসেবে Yadavendra Singh ছিলেন ও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন Gian Singh Rarewala। শিখ রাষ্ট্রকে বাস্তবে পরিণত করতে, শুধু প্রয়োজন ছিল পূর্ব পাঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা গুলিকে PEPSU এর সাথে সংযুক্ত করানো (Singh 290)।

১৯৫৭ সালে সরকারের দ্বিতীয় পদক্ষেপ শিখদের সেই অজুহাতটি প্রদান করেছিল যার জন্য তারা এতদিন অপেক্ষারত ছিল। পাঞ্জাবি ভাষা ও হিন্দি ভাষা নিয়ে পাঞ্জাবকে দ্বিভাষী রাজ্য ঘোষণা করা হয় (Singh 290)। শিখরা দ্রুত ভাষাগত সমস্যা নিয়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করে। তারা যুক্তি প্রদান করে যে শুধুমাত্র হরিয়ানা

ব্যতীত পাঞ্জাবের ভাষা হল পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবের অধিকাংশ সাহিত্য ছিল (সুফিদের রচনা ব্যতীত) গুরুমুখী লিপিতে। অতএব হরিয়ানা, যেটি একটি অনুৎপাদনশীল বালুকাময় এলাকা যেটি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের শেষে পাঞ্জাবের সাথে যুক্ত হয়েছিল সেটাকে পাঞ্জাবের থেকে পৃথক করা উচিত এবং তার পূর্বের হিন্দিভাষী এলাকার সাথে সংযুক্ত করা উচিত। পাঞ্জাবে পাঞ্জাবি গুরমুখী লিপিতে একমাত্র পাঞ্জাবী ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এখানে কোন গোপনীয়তা ছিল না যে পাঞ্জাবি সুবা পাঞ্জাবি ভাষা ও সাহিত্যকে ভিত্তি করে শিখরা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা গঠন করতে চেয়েছিল। Khushwant Singh তার বই *A History Of The Sikhs, Vol II* তে বলেছেন "The demand for the Suba was in fact one for a Sikh majority state; language was only the sugar-coating." (Singh 292). এরপরে তেলুগু ভাষী মানুষদের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের সৃষ্টি এবং মারাঠি ভাষীদের জন্য পৃথক রাজ্যের দাবী শিখ সুবা আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করে তোলে (Singh 291-292)।

১৯৪৬-১৯৪৭ সালে মুসলিম জনসংখ্যার দেশত্যাগের ফলে উর্দূ ভাষার মর্যাদা আর পাঞ্জাবের প্রধান সমস্যা ছিল না নতুন করে যেটি নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয় সেটি হল পাঞ্জাবি ভাষার মর্যাদা নিয়ে। আকালি দল ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত State Reorganization Commission এর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঞ্জাবি সুবা বা পাঞ্জাবি ভাষী রাজ্য গঠনের জন্য তাদের মামলাটি পেশ করে। আকালি দল পাঞ্জাব, PEPSU এবং রাজস্থানের পাঞ্জাবি ভাষী অঞ্চলগুলির একত্রীকরণের জন্য আবেদন করে পাঞ্জাব ও PEPSU এর হিন্দিভাষী অঞ্চলগুলি প্রতিবেশী হিন্দিভাষী অঞ্চলগুলির সাথে একীভূত হওয়ার কথা বলে। আকালি দল এ প্রসঙ্গে যুক্তি প্রদান করে যে, একটি একভাষী রাজ্যে নিজ ভাষাতে শিক্ষা প্রদান প্রশাসনের উন্নতিতে সহায়ক হবে এবং পাঞ্জাবি সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে সাহায্য করবে (Deol 181)। আকালি দল পাঞ্জাবিভাষী রাজ্য গঠনের দাবিকে বা পাঞ্জাবি সুবাকে একটি ভাষাগত সমস্যা হিসেবে তুলে ধরে। যদিও মৌলিক সমস্যাটি ভাষাগত ছিল না প্রশ্নটি ছিল একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার এবং দাবির। ১৯৫১ সালে পাঞ্জাবের মোট জনসংখ্যার ৬২.৩ শতাংশ হিন্দু এবং ৩৫ শতাংশ শিখ ছিল। উপনিবেশিক ভারতে শিখদের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শিখদের প্রতিনিধিত্ব কে সুনিশ্চিত করে কিন্তু স্বাধীন ভারতে পৃথক সম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের (communal represtation) বিলুপ্তি পৃথক সত্ত্বা হিসেবে শিখদের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে আকালিদের উদ্বেগকে বাড়িয়ে তোলে। আকালি দল একটি হিন্দু অধ্যুষিত সমাজে তাদের ভাষা ও ধর্মকে রক্ষা করতে চেয়েছিল এবং শুধুমাত্র সংখ্যালঘু হিসেবে যৎকিঞ্চিৎ রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার প্রত্যাশা আকালিদের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করে। এইভাবে ভাষার বিতর্ক একটি বহু জাতিগত রাষ্ট্রের (multi-ethnic state) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষমতার পুনর্গঠন এবং স্বীকৃতি দানের অভীষ্ট লক্ষ্য হয়ে ওঠে (Deol 182)।

বিভাজন পরবর্তী সময়ে আর্য সমাজের প্রচারকরা পাঞ্জাবি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণের বিরোধিতা করেছিলেন। আর্য সমাজের প্রচারকরা হিন্দুদের মধ্যে হিন্দি ভাষা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং পাঞ্জাবি হিন্দুদের তাদের মাতৃভাষা হিসেবে পাঞ্জাবি ভাষা কে প্রত্যাখ্যান করতে এবং নিজেদেরকে হিন্দিভাষী হিসেবে ঘোষণা করার জন্য একটি সফল অভিযান চালায় এর ফলস্বরূপ ১৯৫১ এবং ১৯৬১ এর জনগণনায় হিন্দুরা তাদের মাতৃভাষা হিন্দি ঘোষণা করে। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত রাজ্যের পাঁচ মিলিয়ন হিন্দুদের মধ্যে মাত্র অর্ধেকই পাঞ্জাবি কে তাদের মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছিল। হিন্দু সংগঠনগুলি আকালি দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আনে যে শিখরা ভাষাকে ছদ্মবেশ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের জন্য একটি পৃথক রাজ্য তৈরি করার পরিকল্পনা করে, যেখানে শিখ সম্প্রদায়ের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বজায় থাকবে। এই দাবি পাঞ্জাবের শিখ

সম্প্রদায় এবং হিন্দুদের মধ্যে এবং আকালি দল ও কংগ্রেস সরকারের মধ্যে ক্রমাগত একটি বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে (Deol 182-183)।

State Reorganization Commission যখন আকালিদের দাবি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিল সেই সময় আকালি দল সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য একটি আন্দোলন শুরু করে। শিখদের সমাবেশ করার জন্য সরকারি চাকরিতে শিখদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ এবং শিখ ধর্মীয় বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ আনা হয়েছিল (Kapur 212)।

১৯৫৪ সালে SGPC এর নির্বাচন আকালি দলকে একটি সুযোগ করে দেয়। আকালি দলের অপ্রতিরোধ্য বিজয় আকালি আন্দোলন কে তীব্রতর করে তোলে। আকালি জাটরা সুবার পক্ষে রাজনৈতিক বিক্ষোভ শুরু করে বিপক্ষ হিন্দুরাও প্রদর্শন করতে শুরু করে। উভয় পক্ষের নির্লজ্জ ভাবে সাম্প্রদায়িক স্লোগানের চিৎকার পরিবেশকে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে। পাঞ্জাব সরকার ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে রাজ্যের পুনর্গঠন সম্পর্কিত স্লোগানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। জবাবে আকালি দল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বা তীব্র আকালি অভিযানের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে ১৯৫৫ সালের মে মাসে সরকার সেটা করতে অস্বীকার করার প্রতিক্রিয়ায় একটি নতুন আকালি অভিযান শুরু হয়। গোল্ডেন টেম্পল এর অভ্যন্তরে একটি বিশাল সমাবেশে তারা সিং ভাষণ দিয়ে তাদের সরকারি অত্যাচারের কাছে নতি স্বীকার না করার আহবান জানান (Kapur 212-213)।

আকালিরা যখন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে স্লোগান দিয়ে স্বর্ণমন্দির থেকে বেরিয়েছিল তখন তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাদের গ্রেপ্তারের ফলে বৃহত্তর আকালের সংগঠন শিখদের তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানায়। আকালিরা শিখদের নবম গুরু, তেগ বাহাদুরের শহীদ হওয়ার তারিখটিকে পাঞ্জাবি সুবা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। আকালিরা এই আন্দোলনে অসাধারণভাবে সফলতা অর্জন করেছিল সমস্ত প্রদেশ থেকে শিখ স্বেচ্ছাসেবকরা অমৃতস্বরে জোড়ো হয়েছিল। প্রায় দুই মাসের মধ্যে ১২০০০ শিখকে গ্রেফতার করা হয়েছিল (Kapur 213)।

এর মধ্যেই ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে State Reorganization Commission পাঞ্জাবি সুবার দাবিকে প্রাথমিকভাবে দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রত্যাখ্যান করে। প্রথমত কমিশন তার রিপোর্টে পাঞ্জাবি ভাষা অর্থাৎ পাঞ্জাবি "গুরুমুখি" ভাষাকে হিন্দি থেকে ব্যাকরণগতভাবে বা স্থানিকভাবে (Spatially) আলাদা বলে স্বীকৃতি প্রদান করেনি। দ্বিতীয়তঃ আন্দোলনে ওই অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ জনগণের সমর্থনের অভাব দেখা গিয়েছিল। পাঞ্জাবি হিন্দুরা এই পাঞ্জাবি ভাষী রাজ্য গঠনের বিরোধিতা করেছিল। কমিশনের দ্বারা পাঞ্জাবি ভাষার আলাদা মর্যাদার প্রত্যাখ্যান শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রচন্ড ক্ষুব্ধ করে তোলে। সর্দার হুকুম সিং, যিনি আকালি দলের সাথে সংযুক্ত ছিলেন লিখেছিলেন "While others got States for their languages, we lost even our language" (Deol 2000 185-186). মাস্টার তারা সিং সেই রিপোর্টের নিন্দা করে বলেন 'decree of Sikh annihilation' (Kapur 214)। শিখরা দাবি করে পাঞ্জাবি গুরুমুখি ভাষা একটি ব্যাকরণগত এবং আভিধানিকভাবে হিন্দি থেকে স্বতন্ত্র। আকালিরা দাবি করে প্রস্তাবিত পাঞ্জাবি সুবাই হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে কোন প্রশ্ন ছাড়াই দাবিটি মেনে নেওয়া হতো। প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে কারণ এতে প্রদেশে হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠতা হ্রাস পাবে (Deol 184)।

সরকারের সাথে এই ইস্যু নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। আকালি দল এবং সরকারের মধ্যে আলোচনাকে Regional formula বলা হয়। এরমধ্যে PEPSU কে পাঞ্জাবের সাথে সংযুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু হিমাচল প্রদেশের সিংহভাগ হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাটিকে পৃথক সত্তা হিসেবে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল।

কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দুইবার এই আন্দোলনের অবসান করা হয় (Deol 2000)। আপাতদৃষ্টিতে একটি নিষ্পত্তিতে পৌঁছেও আকালি দল ১৯৫৯ সালের SGPG এর নির্বাচনের সময় নতুন করে পাঞ্জাবে সুবার জন্য দাবি তোলে। SGPG এর প্রথম জেনারেল মিটিংয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় 'The only solution of the linguistic trouble in the Punjab is to bifurcate Punjab on the basis of Punjabi and Hindi' (Kapur 214).

আকালি দল একটি অভিযানের প্রস্তুতি নেয় যেখানে "shahidi" অর্থাৎ শহীদ জাটদের সংগঠিত করে তাদের নিয়ে স্বর্ণ মন্দিরের ভেতর ধর্মীয় শপথ গ্রহণ করিয়ে পাঞ্জাবি সুবা গঠনের জন্য তাদের দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার পরিকল্পনা করে যাতে তারা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এই উদ্দেশ্যের জন্য তারা শিখদের সতর্ক করে পোস্টার জারি করে বলে হিন্দুরা তাদের ধ্বংস করতে চাই এবং তাদের ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়। পাঞ্জাব সরকার এই নতুন অভিযানের ক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তারা সিং এবং অন্যান্য আকালি নেতাদের গ্রেফতার করে এবং তাদের সাম্প্রদায়িক প্ররোচনাকে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। হাজার হাজার শিখ আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তারের পর আকালি প্ররোচনা ক্রমশ ক্ষয় হতে শুরু করে (Kapur 214-215)।

১৯৬০ সালে আকালি দল এই আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছায়। তারা সিং স্বর্ণমন্দিরে শপথ গ্রহণ করে এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নিজের অনশন শুরু করেন। তারা সিং দাবি করেছিলেন যে সরকার পাঞ্জাবী সুবা গঠনের দাবি মেনে নেবে এবং আকালিদের অভিযোগের ভিত্তিতে শিখদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করবে। তারা সিং এর অনশনের শুরুর সাথে সাথে শিখদের মধ্যে তার জন্য প্রচুর সমাদর শুরু হয় এবং আকালি নেতার মৃত্যু হলে তার পরিণতি সম্পর্কে গুরুতর সতর্কতা জারি করা হয় (Kapur 214-215)।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু পার্লামেন্টে আকালিদের দাবিকে একটি সাম্প্রদায়িক দাবি বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি সরকারি চাকরিতে শিখদের বিরুদ্ধে বৈষম্যকে নিয়ে আকালিদের অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিয়োগে সম্মত হন। ৪৩ দিন পর তারা সিং তার অনশন শেষ করে এবং একটি আকালি অভিযান যেখানে ২৬০০০ শিখ গ্রেপ্তার হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। গভর্নমেন্ট আকালিদের শিখদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করে; কিন্তু উল্লেখযোগ্য ভাবে আকালি দল কমিশনের কাছে কোনরকম সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে নাকচ করে (Kapur 215-216)।

এর মধ্যেই আকালি নেতাদের মধ্যে কৌশল এবং কার্যপ্রণালী নিয়ে অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের কারণে মাস্টার তারা সিংকে তার একজন লেফটেন্যান্ট জাট শিখ সন্ত ফতহ সিং পদচ্যুত করে। ১৯৬৫ সালে ফতহ সিং SGPC (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee) এর ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে সফল হন। আকালি দলের শক্তি এবং সাফল্য SGPC এর বিপুল সম্পদ গুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল ছিল যা তাদের শিখ রাজনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে একটি ভিত্তি প্রদান করে (Deol 185-187)।

এর পরবর্তীকালে সন্ত ফাতহ সিং ঘোষণা করেন তিনি পাঞ্জাবি সুবার জন্য আরো একটি অনশন করবেন। কিন্তু ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের কারণে তার এই অনশন স্থগিত হয়ে যায় (Kapur 216)। এরমধ্যে জহরলাল নেহেরুর মৃত্যু কেন্দ্র সরকারের নতুন নেতাদের নিয়ে আসে, যারা আঞ্চলিক দাবি গুলির প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল ছিল। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, যেখানে শিখরা প্রশংসনীয় অবদান গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় পার্লামেন্ট অবশেষে আকালিদের

দাবি পাঞ্জাবি সুবাকে গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে পাঞ্জাব রাজ্য পুনর্গঠনের অধীনে (Punjab State Reorganization Bill) রাজ্যটি দ্বিখন্ডিত হয়। দক্ষিণ হিন্দিভাষী সমতল জেলাগুলি নিয়ে হরিয়ানা নামে একটি নতুন রাজ্য গঠিত হয় এবং পাঞ্জাবের উত্তরে অন্যান্য হিন্দিভাষী পার্বত্য জেলাগুলিকে প্রতিবেশী হিমাচল প্রদেশের সাথে একীভূত করা হয় এবং অবশিষ্ট পাঞ্জাবি ভাষী অঞ্চল গুলি নিয়ে পাঞ্জাব নামে একটি নতুন রাজ্য গঠিত হয় (Deol 187)।

এইভাবেই ৫৪ শতাংশ শিখ এবং ৮৮ শতাংশ হিন্দু নিয়ে নতুন রাজ্য পাঞ্জাবি সুবা তৈরি করা হয়। ১৯৫০ সালে লাহোরের পরিবর্তে একটি নতুন শহর চন্ডিগড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল যেটি পরিকল্পনা করেছিলেন ফরাসী স্থাপত্য শিল্পী Le Corbusier, এই নতুন শহর চন্ডিগড়কেই হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের যৌথ রাজধানী ঘোষণা করা হয় (Deol 187-188)।

পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল শিখ নেতৃত্ব। আকালি দল স্বাধীন শিখ সত্ত্বাকে রক্ষা করার জন্য শিখদের একটি পৃথক রাজনৈতিক মর্যাদাকে অপরিহার্য হিসাবে দেখেছিল। আকালি নেতা মাস্টার তারা সিং ১৯৪৫ সালে উল্লেখ করেছিলেন "There is not the least doubt that the Sikh religion will live only as long as the panth exist as an organized entity." (Deol 189)

আকালি দল নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন খালসাপন্থ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, যেটি তার শিখ নির্বাচনী এলাকার মানুষের আনুগত্য অর্জন করে। পরবর্তীকালে এটা বলা হয় এই পন্থটি শিখ ধর্মের সাধারণ আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের প্রশ্নে আকালি দল দাবি করে যে শিখ সম্প্রদায়ের একক রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করা শিখ ধর্মের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য (Deol 189)।

একটি সম্প্রদায় হিসেবে শিখদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শিখ ধর্মীয় ভাবাদর্শের মধ্যে নিহিত ছিল কারণ গুরু গোবিন্দ সিং তার ধর্মীয় অনুসারীদের একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে সংঘটিত করার জন্য খালসা পন্থ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এছাড়া তিনি প্রথম গুরু নানকের প্রণীত মতবাদে খুব কমই অন্য কোন পরিবর্তন করেছিলেন। এইভাবে আকালি নেতৃত্ব শিখ ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে প্রবল করে এবং তাদের কর্তৃত্বকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈধ করার জন্য চেষ্টা চালাই। আকালি নেতারা বিশ্বাস করতেন যে একটি স্বাধীন সত্তা রক্ষা করার জন্য শিখদের রাজনৈতিক সুবিধা প্রদান অপরিহার্য আর এটা তখনই সম্ভব যখন শিখদের একটি আঞ্চলিক ইউনিট (territorial unit) থাকবে যেখানে তাদের প্রভাবশালী জনসংখ্যা থাকবে (Deol 189-190)।

পাঞ্জাবি সুবার সাফল্যের পর আকালি দল শাসকদল হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং নির্বাচনী রাজনীতিতে একটি নতুন পর্ব শুরু হয়। শিখ সম্প্রদায় আকালি দলের বিভিন্ন আন্দোলন গুলোই জোরালো সমর্থন প্রদর্শন করছিল। তবে শিখদের নির্বাচন সমর্থন শুধুমাত্র আকালি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। শিখরা সাম্প্রদায়িকতাকে একচেটিয়া ভাবে ভোট দেয়নি (Deol 190)। কংগ্রেস পার্টির বিভিন্ন শক্তিশালী ক্ষমতার আসনে অনেক শিখ কর্মী অধিষ্ঠিত ছিল যারা শিখ ভোটারদের সহযোগিতায় আকালি দলের একটি শক্তিশালী প্রতিযোগী হয়ে উঠেছিল। এইভাবে পুনর্গঠিত পাঞ্জাবের প্রথম নির্বাচনে কংগ্রেস দল আকালি দলের চেয়ে বেশি শিখ বিধায়ক নির্বাচন করতে সফল হয়। কংগ্রেস পার্টির এই আন্ত-সাম্প্রদায়িকতা (cross-communal) অনুসরণের ফলস্বরূপ আকালি দল ১৯৬৭-১৯৮০ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব বিধানসভায় পাঁচটি নির্বাচনে মোট ভোটের ৩০ শতাংশের বেশি ভোট পেতে সক্ষম হয়নি। আকালি দলকে শিখদের নির্বাচনী সমর্থনের জন্য কংগ্রেস পার্টির সাথে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে আকালি দল ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়। ১৯৮০ সালে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের নির্বাচনে কংগ্রেস ১৩ টি আসনের মধ্যে ১২ আসনে জয় লাভ করে। এতেই পাঞ্জাবের ভোটারদের কাছে কংগ্রেস পার্টির গ্রহণযোগ্যতা বেশী সেটা

প্রমানিত হয়। পাঞ্জাবি সুবা গঠনের পর থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আকালি দল শুধুমাত্র জোট সরকার গঠন করেই ক্ষমতায় আসতে পেরেছে। পাঞ্জাবের পুনর্গঠনের পর প্রথম নির্বাচনে আকালি দল জনসংঘ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে একটি জোট সরকার গঠনে সফল হয়। জনসংঘ পার্টি আর্য সমাজের রাজনৈতিক দল হিসেবে ১৯৫২ সালে তৈরী হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে শুধুমাত্র জনসংঘের সহায়তায় আকালি দল ক্ষমতায় আসে (Deol 190-191)।

পরিশেষে বলা যায়, পাঞ্জাবের দলীয় রাজনীতির ইতিহাস পষ্ট ভাবে দেখায় যে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন রাজনীতি সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে একত্রিত হওয়ার অনুমতি দেয়। উল্লেখযোগ্য ভাবে বলা যায় ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থা আন্ত সাম্প্রদায়িক সহযোগিতাকে সহজতর করেছে।এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় পাঞ্জাব মামলাটি আলোকিত করেছে যে কিভাবে রাজনৈতিক দলগুলি, তাদের ক্ষমতার সন্ধানে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করে শিখ ও হিন্দুদের একটি সাধারন রাজনৈতিক পরিসরে নিয়ে এসেছিল। শুধুমাত্র একটি শিখ অধ্যুষিত অঞ্চল আকালিদের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা, নিশ্চিত করতে পারেনি। যার ফলে আকালি দলকে হিন্দুদের কাছে আবেদন করতে হয়েছিল তার রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তারের জন্য এবং অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট গঠন করেই একমাত্র ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হয়েছে (Deol 191)।

SGPG এর ওপর আকালি দলের নিয়ন্ত্রণ পাঞ্জাবের রাজনীতিতে আকালি দলকে একটি ক্ষমতাবান শক্তিতে পরিণত করেছে। আদমশুমারি কার্যক্রম পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক চেতনাকে তীব্র করে তুলেছিল এবং বিভিন্ন স্বার্থ-গোষ্ঠী গুলি আদমশুমারির ফলাফল কে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল। মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দু হিসেবে ঘোষণা করার জন্য মুসলিম সংগঠন গুলি এক ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই এবং হিন্দুদের আর্য সমাজ তাদের মাতৃভাষা হিন্দিকে মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা করার জন্য এক ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। হিন্দি-উর্দু বিতর্কে সবথেকে বেশি অবহেলিত হয় পাঞ্জাবি ভাষা কারণ হিন্দু ও মুসলিম পাঞ্জাবি ভাষাকে ত্যাগ করে। দেশ ভাগের সময় পাকিস্তানি পাঞ্জাব থেকে লক্ষ লক্ষ পাঞ্জাবিভাষী হিন্দু ও শিখদের আগমন সত্ত্বেও, ভারতীয় পাঞ্জাবের হিন্দি আন্দোলন ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে পাঞ্জাবিভাষী দের সংখ্যা কমিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করে। পাঞ্জাবি ভাষা হিন্দু মুসলিম এবং শিখদের ভাষা হওয়ার সত্ত্বেও এটি ক্রমশ শিখদের সাথেই পরিচিত হয়ে ওঠে।

পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলনের ইতিহাস দেখায় কিভাবে একটি ভাষা একটি গোষ্ঠীর পরিচিতি হয়ে উঠতে পারে। আমরা দেখেছি স্বাধীনতা পরবর্তী পাঞ্জাবে কিভাবে ভাষা হিন্দু ও অভিজাত শিখদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই হয়ে ওঠে কারণ ভাষার মধ্যে ধর্মীয় অর্থ মিশে গিয়েছিল। এই ভাবেই পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলন হিন্দু ও শিখদের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে ভাষাগত পার্থক্যকে সুসংহত করেছে (Deol 191-192)।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Singh, Khushwant. *A History of the Sikhs: 1469-1839*. Vol I, Oxford University Press, 2023.
2. Singh, Khushwant. *A History of the Sikhs: 1839-2004*. Vol II, Oxford University Press, 2024.
3. Tully, Mark and Jacob, Satish. '*Amritsar Mrs Gandhi's Last Battle.*' Rupa Publication, 2023.
4. Deol, Harnik. '*Religion and Nationalism in India: The case of the Punjab.*' Routledge, 2000.
5. Kapur, Rajiv A. '*Sikh Separatism: The Politics of Faith.*' Allen & Unwin, 1986.
6. Suri, Aarti. Politics of Panjabi Suba Movement. 2015, Guru Nanak Dev University, unpublished PhD thesis.

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 681-689
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.258

উন্নয়ন ও স্থানচ্যুতি: একটি পর্যালোচনা

রাজেশ মন্ডল, *গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.01.2026; Accepted: 13.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This study aims to offer a critical and analytical viewpoint on the issue of resettlement, development-induced displacement, and its multifaceted effects. Large dams, industrial zones, mining, roads, urbanization, and other development projects cause rural and indigenous groups to relocate from their ancestral homelands and means of subsistence, causing profound social, economic, and cultural disruption. The study examines the reasons behind displacement brought on by development, how displaced people's lives change both before and after eviction, and the strengths and weaknesses of resettlement initiatives. It specifically addresses problems like land loss, shifting livelihoods, poverty brought on by debt and uncertainty, social network disintegration and the deterioration of cultural identity and spatial memory. Using a qualitative methodology, the study highlights the necessity of development justice, sustainable resettlement, and a human rights-based policy framework while synthesizing data from research journals, policy documents, secondary literatur. In this approach, it suggests that development be rethought as a fair and inclusive process of change rather than only as economic growth.

Keywords: Development, Displacement, Resettlement, Rehabilitation, Compensation

একটি জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগকে প্রসারিত করতে প্রতিটি দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ করে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ভারী শিল্প স্থাপন, বৃহদাকার জলাধার নির্মাণ, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, রেল ও সড়কপথ নির্মাণ, খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের জন্য খনি খনন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষ যখন উন্নয়নের পরিকল্পনা করে, তখন তারা এমন প্রকল্পগুলি সম্পর্কে চিন্তা করে যা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এগুলি সরকার বা বেসরকারি সংস্থাগুলি দ্বারা পরিচালিত ছোট প্রকল্প বা বড় প্রকল্পও হতে পারে। ভাল উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সেই প্রকল্পের দ্বারা প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত স্তরের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কথা মাথায় রাখা হয় এবং যখন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়, তখন ক্ষতি এড়ানোর কৌশলগুলি অনুসন্ধান করা হয়। এইরূপ প্রকল্প পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্থানীয় জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রা ও সুযোগ-সুবিধার সরাসরি উন্নতি ঘটানোর দিকে মনোনিবেশ করে। তাই উন্নয়নের এই পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন বলা হয়। অপরদিকে, অনেক উন্নয়ন কর্মসূচী রয়েছে যেগুলি অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়, কারণ তারা স্থানীয় জনগণের চিন্তাধারা এবং সমস্যাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে প্রাকৃতিক সম্পদের

অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় বা স্থানীয় লোকেদের তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। এগুলি সাধারণত সেইসব প্রকল্প যেখানে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হয় না এবং তাদের সমস্যাগুলি সমাধান করার পরিবর্তে, তারা প্রায়শই নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই প্রকল্পগুলি অনেকসময় দরিদ্র লোকদের জন্য খুব বেশি সুবিধাজনক বা ফলপ্রসূ হয়না, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধনী এবং শক্তিশালী শ্রেণির মানুষ উপকৃত হয়। এই উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যখন কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তিরা তাদের ঘর-বাড়ি, কৃষিজমি, আবাসস্থল ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয় তখন সেই ধরনের স্থানচ্যুতির ঘটনাকে উন্নয়ন জনিত স্থানচ্যুতি বলা হয়। স্থানচ্যুতি এবং পুনঃস্থাপন শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশের সমস্যা নয়, বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতেও এই সমস্যা বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, এটি অনুমান করা হয় জার্মানিতে বিংশ শতাব্দীর সময় লিগনাইট খনির ফলে ৩০ হাজার থেকে ১ লক্ষ মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছিলেন। তবে এই সমস্যা ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হয় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে।[১]

উন্নয়ন ও স্থানচ্যুতি সম্পর্কে ধারণা:

উন্নয়ন হল একদিকে মানুষের চাহিদা এবং অন্যদিকে সামাজিক পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুলির মধ্যে আরও ভাল পরিবর্তন অর্জনের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের একটি পদ্ধতি, যা অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে সমাজের মানুষের উন্নত জীবনযাত্রায় রূপান্তরিত করে। এটি সমাজে প্রচলিত দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, বৈষম্য, অযৌক্তিকতা এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর লক্ষ্য কেবল দুর্বল, সুবিধা বঞ্চিত মানুষের উত্থানই নয়, সমস্ত নাগরিকের জীবনযাত্রার মানও উন্নত করা। উন্নয়ন হল সামাজিক পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া এবং শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট ফলাফলের জন্য পরিকল্পিত নীতিগুলির ব্যবস্থা নয়। উন্নয়ন অনেকগুলি বিষয় দ্বারা পরিচালিত হয়, যা উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার ফলাফলকে প্রভাবিত করে। উন্নয়ন মানব সমাজের শৃঙ্খলার অগ্রগতির সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। বাঁধ, বাণিজ্যিক উদ্যোগ, রাস্তা, সেচ ব্যবস্থা, পাইপলাইন এবং পরিবহন ব্যবস্থার মতো উন্নয়নমূলক কাজগুলি কৃষি ও শিল্পের বিকাশ উভয়কেই সমর্থন করে, যার ফলে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় উভয়ই বৃদ্ধি পায়। তবে, পরিকাঠামো ও বাণিজ্যিক উদ্যোগের উন্নয়নের ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ স্থানচ্যুত হয়।[২]

অপরদিকে স্থানচ্যুতি একটি বহুমাত্রিক ঘটনা যা মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করে। বছরের পর বছর ধরে স্থানচ্যুতি মানুষকে প্রভাবিত করেছে, তবে এর প্রভাব আজকের মতো বিপর্যয়কর কখনও হয়নি। স্থানচ্যুতি হল প্রতিষ্ঠিত মানবসমাজ, স্থায়ী সামাজিক সংগঠন, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সামাজিক পরিষেবাগুলির সংযোগ বিচ্ছিন্নতার একটি প্রক্রিয়া। বর্তমানে, এটি শিক্ষাবিদ, সামাজিক কর্মী এবং পরিকল্পনাবিদদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। শহরাঞ্চলে মানুষের স্থানচ্যুতি তাদের কৃষিজমি এবং পৈতৃক বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করে। অর্থনীতির উদারীকরণ, দ্রুত বেড়ে ওঠা শহরগুলিতে পরিকাঠামোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন অংশীদারিত্ব মানুষের জীবিকা নির্বাহের ঐতিহ্যগত উৎসগুলিকে সংকটের মুখে ফেলেছে। নগরায়ণ ও নগর উন্নয়ন জনিত স্থানচ্যুতির তীব্রতা শিল্প বা পরিকাঠামোগত প্রকল্প স্থাপনের ফলে সৃষ্ট অনিচ্ছাকৃত স্থানচ্যুতি (Involuntary Displacement) -এর চেয়ে অনেক বেশি।[৩] বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে, বিশ্বের অধিকাংশ দেশে উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে স্থানচ্যুতির প্রক্রিয়ার জনগণের বিশাল অংশ দারিদ্র্যতা এবং বঞ্চনার শিকার হয়েছিল। এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলি একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়। স্থানচ্যুতি এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষ বা ব্যক্তিকে তাদের আত্মীয়-স্বজন, বিষয় সম্পত্তি এবং পাড়া-প্রতিবেশী থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাছাড়া

এই নির্মম প্রক্রিয়া মানুষকে তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। প্রতিটি মানুষ তার পূর্বপুরুষের যোগসূত্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। স্থানচ্যুতির মাধ্যমে এসব সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মানুষ বা ব্যক্তি নিঃসঙ্গ ও অসহায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়ে পড়ে।

স্থানচ্যুতি একটি বহুমাত্রিক ঘটনা যার মধ্যে অবস্থানগত পরিবর্তন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতিগুলির মধ্যে একটি। তবে, এটি কেবল নিজেকে অবস্থানগত স্থানান্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মানকে কমিয়ে দিয়ে অমানবিক অবস্থায় ঠেলে দেয় এবং জীবনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলির একাধিক দিককে প্রভাবিত করে।[৪] ফলস্বরূপ, আক্রান্ত জনগোষ্ঠী মানসিক আঘাত এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হন। স্থানচ্যুতি মানুষের মূলে আঘাত হানে। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জোরপূর্বক উচ্ছেদের চাপের মুখে পড়তে হয় মানুষকে। যখন মানুষকে তাদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা হয় তখন তারা কেবল তাদের বাড়িঘর বা কৃষিজমি নয়, মঠ-মন্দির, খেলার মাঠ, চারণভূমি, বন, জল সম্পদ ইত্যাদির মতো সাধারণ সামাজিক সম্পদও ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। তাই পুনর্বাসনের সময় তাদের সেইসব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা উচিত যেগুলি তারা স্থানচ্যুতির কারণে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এই বিষয়ে এমন নিয়ম অবলম্বন করা উচিৎ, যেখানে মানুষকে তাদের স্থানচ্যুতির পূর্বের পরিস্থিতির মতো একই স্তর এবং জীবনযাত্রার মান অর্জনে সহায়তা করবে তাই নয়, তাদের কিছু অতিরিক্ত সুবিধাও দেওয়া উচিত যাতে স্থানচ্যুতির মানবিক মূল্যকে পূরণ করা যায়। পুনর্বাসন নিয়ে উদ্ভূত উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানচ্যুতিকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। সংজ্ঞাটিতে ক্ষতিপূরণের নিয়ম পরিবর্তন এবং অ-আর্থিক পণ্যের গণনার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। প্রচলিত অধিকার এবং সাধারণ সম্পত্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকে স্বীকৃতি দেওয়াও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্থানচ্যুত মানুষদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য পুনর্বাসনের চূড়ান্ত লক্ষ্যের পাশাপাশি জীবিকা পুনরুদ্ধারের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

স্থানচ্যুতির প্রভাব:

উন্নয়নের ফলে প্রায়শই লক্ষ লক্ষ মানুষ জোরপূর্বক স্থানচ্যুত হয়েছে, অনেক সম্প্রদায় তাদের প্রাচীন মাতৃভূমি থেকে স্থানচ্যুত হয়েছে এবং সামাজিক সম্পর্ক ভেঙে পড়েছে। বেশিরভাগ সময়, স্থানচ্যুত লোকেরা এই পরিবর্তনের শিকার হয় এবং ফলস্বরূপ, তাদের ব্যক্তিগত অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার বিপন্ন হয়। স্থানচ্যুতি মানুষের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যার ফলে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি সামাজিক ও মানসিক দুর্দশা দেখা দেয়। যখন মানুষকে জোর করে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে যায়।

Michael M. Cernea তার *"Impoverishment Risks and Reconstruction"* মডেলে তিনি স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য আটটি সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করেছেন। *"Impoverishment Risks and Reconstruction"* মডেলের লক্ষ্য হল জোরপূর্বক পুনঃস্থাপনের অন্তর্নিহিত দারিদ্র্যের ঝুঁকি এবং স্থানচ্যুতদের জীবিকা পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগুলি চিহ্নিত করা। তার এই দারিদ্র্যের ঝুঁকির প্রবণতাগুলি এবং সেই ঝুঁকি থেকে পরিত্রাণের উপায়গুলি একত্রে "Impoverishment Risks and Reconstruction Model" এর প্রধান মাত্রা তৈরি করে।

মাইকেল কার্ণিয়ার দারিদ্র্যতার ঝুঁকি এবং পুনর্গঠন মডেল			
ক্রমিক সংখ্যা	**দারীদ্রতার ঝুঁকি**	**ক্রমিক সংখ্যা**	**পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা**
১	ভূমিহীনতা	১	ভূমিভিত্তিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা
২	বেকারত্ব	২	পুনঃকর্মসংস্থানের সুযোগ
৩	গৃহহীনতা	৩	গৃহ পুনঃনির্মাণ
৪	প্রান্তিকীকরণ	৪	সামাজিক অন্তর্ভুক্তি
৫	খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা	৫	পর্যাপ্ত পুষ্টি
৬	বর্ধিত অসুস্থতা	৬	উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা
৭	সামাজিক বিচ্ছিন্নকরণ	৭	সম্প্রদায় পুনর্গঠন
৮	সাধারণ সম্পদ ও পরিষেবা থেকে বিচ্ছিন্নতা	৮	সাধারণ সম্পদ ও পরিষেবা পুনরুদ্ধার

Michael M. Cernea তার *"Impoverishment Risks and Reconstruction"* মডেলে তিনি স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য আটটি সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করেছেন।[৫] এগুলি হল-

ভূমিহীনতা:

জমি অধিগ্রহণ সেই মূল ভিত্তিকে সরিয়ে দেয় যার উপর ভিত্তি করে মানুষের উৎপাদন ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং জীবিকা নির্ভর করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমি চিরতরে হারিয়ে যায়, কখনও কখনও আংশিকভাবে জমির প্রতিস্থাপন করা হয় এবং খুব কম ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণরূপে জমি প্রতিস্থাপিত হয় বা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। স্থানচ্যুত মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানবসৃষ্ট মূলধন উভয়ই হারানোর কারণে তারা আর্থিক সংকট ও দারিদ্র্যতার সম্মুখীন হয়।[৬]

বেকারত্ব:

গ্রামীণ ও শহুরে স্থানচ্যুতি উভয় ক্ষেত্রেই মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের ক্ষতি হয়। অনেক সময় চাকরি হারানো ব্যক্তিরা ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, পরিষেবা কর্মী বা কারিগর হতে পারেন। অবস্থানগত স্থানান্তরের পরেও পুনর্বাসিতদের মধ্যে বেকারত্ব বা স্বল্প কর্মসংস্থান দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তাদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা কঠিন এবং এর জন্য যথেষ্ট বিনিয়োগ, নতুন সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকল্পের লভ্যাংশ ভাগ করে নেওয়ার উপর আরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।[৭]

গৃহহীনতা:

আবাসন ও আশ্রয় হারানো অনেকের জন্য অস্থায়ী হতে পারে, তবে কারও কারও কাছে এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা হিসাবে রয়ে যায় এবং পরিচয় হারানো এবং সাংস্কৃতিক দারিদ্র্য হিসাবে অনুভূত হয়। একই জনগোষ্ঠীর প্রতিবেশী পরিবারগুলি বাসস্থান হারানোর ফলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি এবং পারস্পরিক সহায়তার ধরণে প্রভাব পড়তে পারে। তাই বিচ্ছিন্নভাবে পুনর্বাসনের চেয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিবেশীদের দলগত পুনর্বাসন দেওয়ায় শ্রেয়।[৮]

প্রান্তিকীকরণ:

যখন স্থানচ্যুত পরিবারগুলি অর্থনৈতিক ক্ষমতা হারায় এবং নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থানের দিকে সরে যায়, তখন প্রান্তিকীকরণ ঘটে। মধ্যম আয়ের পরিবারগুলি স্বল্প জমির মালিক হয়ে যায়, ছোট দোকানদার এবং

কারিগররা ব্যবসা হারায় এবং দারিদ্র্যের সীমার নিচে নেমে যায়। অর্থনৈতিক প্রান্তিককরণ প্রায়শই সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রান্তিকীকরণের সাথে জড়িত, যা সামাজিক অবস্থানের হ্রাস, পুনর্বাসিতদের নিজেদের এবং সমাজের প্রতি আস্থা হারানোর মধ্যে প্রকাশ পায়।[৯]

বর্ধিত অসুস্থতা এবং মৃত্যুহার বৃদ্ধি:

জোরপূর্বক স্থানান্তরের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষদের অসুস্থতার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, কারণ এটি বর্ধিত চাপ ও মানসিক আঘাত। অনিরাপদ জল সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ফলে স্বাস্থ্যের মাত্রা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায় যা মহামারী সংক্রমণ, ডায়রিয়া, আমাশয় ইত্যাদির বিস্তার ঘটায় এবং বিশেষত শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে মৃত্যুর হার বাড়িয়ে তোলে।[১০]

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা:

জোরপূর্বক স্থানচ্যুতির ফলে স্বয়ংসম্পূর্ণতা কমে যায়, ভেঙে ফেলা হয় খাদ্য সরবরাহের জন্য স্থানীয় ব্যবস্থা, এবং এইভাবে লোকেদের দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ার ঝুঁকি বাড়ায়।[১১]

সাধারণ সম্পত্তির অধিকার হারানো:

দরিদ্র কৃষকরা স্থানচ্যুতির ফলে তাদের সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সাধারণ সম্পত্তি বা সম্পদগুলি যেমন বন, জলাশয়, চারণভূমি, ইত্যাদি ব্যবহারের অধিকার হারায়। এই ধরনের ক্ষতি এবং জীবিকার অবনতি সাধারণত পরিকল্পনাবিদদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয় এবং ক্ষতি অপূরণীয় থেকে যায়।[১২]

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা:

সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক সংগঠন ধ্বংস, প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক, স্থানীয় সংগঠন ইত্যাদির বিচ্ছুরণ সামাজিক মূলধনের ব্যাপক ক্ষতি। এই ধরনের বিশৃঙ্খলা জীবনযাত্রাকে এমনভাবে দুর্বল করে দেয়, যা পরিমাপ করা হয় না এবং পরিকল্পনাকারীদের দ্বারা স্বীকৃত হয় না। এর ফলে ক্ষমতাহীনতা এবং আরও দরিদ্রতা দেখা দেয়।[১৩]

মাইকেল এম. কার্ণিয়া তার *"Impoverishment Risks and Reconstruction"* মডেলে তিনি স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের দারিদ্র্যতার ঝুঁকি দূর করার জন্য আটটি উপায়ের পরামর্শ দেয়। যেমন ভূমিহীনতা থেকে ভূমি-ভিত্তিক পুনর্বাসন, বেকারত্ব থেকে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা থেকে পর্যাপ্ত পুষ্টি, গৃহহীনতা থেকে গৃহ পুনর্নির্মাণ, বর্ধিত অসুস্থতা এবং মৃত্যুহার থেকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার উন্নতি, এবং সাধারণ সম্পদ ও সম্পত্তির বঞ্চনা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা থেকে সম্প্রদায় পুনর্গঠন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি করা ইত্যাদি।[১৪]

ক্ষতিপূরণ (Compensation):

ক্ষতিপূরণ বলতে স্থানচ্যুত মানুষ অথবা প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ক্ষয়-ক্ষতি মেরামতের উদ্দেশ্যে গৃহীত নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপকে বোঝায়। সাধারণত, এখানে এককালীন অর্থপ্রদান, হয় নগদ টাকা বা অধিকৃত জমির পরিবর্তে জমি প্রদান। ক্ষতিপূরণকে নির্দিষ্ট জমি, সম্পত্তি এবং সম্পদের দখল থেকে স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের সম্পত্তির অধিকারের প্রত্যক্ষ পরিণতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সম্পত্তির অধিকার লঙ্ঘনের জন্য ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন, পর্যাপ্ত বা কমপক্ষে হারিয়ে যাওয়া সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্যের সমতুল্য। যাইহোক, সঠিক ক্ষতিপূরণ প্রায়শই এর অর্থনৈতিক মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন জনিত স্থানচ্যুতি এবং পুনর্বাসনের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞরা পুনর্বাসিতদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারের হাতিয়ার হিসাবে

তথাকথিত 'ক্ষতিপূরণ নীতি'-র ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, সমস্ত অনিচ্ছাকৃত স্থানচ্যুতদের নীতিগতভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত, যাতে তাদের পরিস্থিতি পুনরুদ্ধার করা যায় এবং একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমতি দেওয়া যায়। বিশ্বব্যাংক এবং বেশ কয়েকটি উন্নয়ন সংস্থার মতো আন্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য তহবিল সরবরাহকারী বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ক্ষতিপূরণ নীতির উপর জোর দিয়েছে। স্থানচ্যুতদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ বর্তমানে সমস্ত প্রকল্পের পুনর্বাসন পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। কিছু বিশেষজ্ঞ আবার লাভ-ক্ষতির হিসাবের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন। সাম্প্রতিককালে স্থানচ্যুতদের ক্ষতিপূরণ বেশ কিছু সমাজ বিজ্ঞানীর ক্রমবর্ধমান সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাইকেল এম. কার্ণিয়ার মতে, ক্ষতিপূরণের বর্তমান সমালোচনার দুটি স্তর রয়েছে "এর তত্ত্ব, অর্থনীতিতে 'ক্ষতিপূরণ নীতি'-র প্রসঙ্গে; এবং এর অনুশীলন 'ন্যায়সঙ্গত' গণনা, বিতরণ এবং প্রভাবের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাগত প্রমাণের প্রসঙ্গে"।[১৫] হারিয়ে যাওয়া জমি, বাড়িঘর, সাধারণ সম্পত্তি ও সম্পদ এবং সামাজিক সম্পর্কের জন্য ক্ষতিপূরণের প্রয়োজনীয়তা থেকে উদ্ভূত ক্ষতিপূরণকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। পুনর্বাসিতদের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতির জন্য ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্য, সেইসাথে এর ধরন এবং পরিমাণ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ সফল পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা নয়। ক্ষতিপূরণের অপ্রতুলতা প্রায়শই প্রান্তিককরণ এবং দারিদ্র্যের মূল কারণ হয়ে ওঠে।

Bogumil Terminaski তার *"Development* Induced Displacement and Resettlement: Causes, Consequences and Socio-Legal Context (2015)*"* গ্রন্থে ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্য, ধরন এবং পরিমাণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল-

ক্ষতিপূরনের উদ্দেশ্য:

তার মতে ক্ষতিপূরনের উদ্দেশ্যগুলি হল- কার্যকারিতার বস্তুগত ও অদম্য ভিত্তির পুনর্গঠন, স্থানচ্যুত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরি করা এবং পুনর্বাসিতদের অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ও সামাজিক প্রান্তিকীকরণের প্রক্রিয়া প্রতিরোধ করা।

ক্ষতিপূরনের ধরন:

ক্ষতিপূরণের রূপটি সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার স্থিতিশীলতা এবং জীবনযাত্রার অবস্থার পুনরুদ্ধারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। ক্ষতিপূরণের রূপটি কেবল পুনর্বাসিত মানুষের ইচ্ছার উপরই নয়, তাদের অর্থনৈতিক মডেলের উপরও নির্ভরশীল হওয়া উচিত। বেশ কয়েকজন লেখক বাজার অর্থনীতির সাথে অপরিচিত ব্যক্তিদের নগদ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত বিপদগুলি তুলে ধরেছেন। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং শ্রম অভিবাসনের নিম্ন গতিশীলতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক মডেল (ভূমি ভিত্তিক অর্থনীতি) দ্বারা চিহ্নিত সম্প্রদায়ের জন্য জমির ক্ষতিপূরণ একটি পূর্ণ সমাধান বলে মনে হয়। যারা বাজারের অর্থনীতির সঙ্গে অপরিচিত, তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে জমি অনেক বেশি কার্যকর সমাধান বলে মনে হয়। অপরদিকে নগদ-ভিত্তিক অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের জন্য নগদ অর্থের ক্ষতিপূরণ সর্বোত্তম কৌশল বলে মনে হয়। এই ধরনের ক্ষতিপূরণ এমন লোকদের জন্য আরও কার্যকর বলে মনে হয় যারা অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত হতে চায় বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করতে চায় যার জন্য বড় প্রাথমিক মূলধনের প্রয়োজন হয়।

ক্ষতিপূরনের পরিমাণ:

ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন বাসস্থানের জীবনযাত্রার মান দ্রুত পুনরুদ্ধার করা উচিত। তবে, মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলি প্রায়শই পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রকৃত বাজার মূল্যকে প্রতিফলিত করে না। ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়ে জাতীয় আইন প্রায়শই বেদখল সম্পদের বাজার মূল্যকে বিবেচনা করে, অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনগুলি প্রতিস্থাপনের মূল্যকে সমর্থন করে। উন্নয়ন প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত সম্পদের মূল্যায়নের জন্য সুসংহত মান প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। মূল্যায়ন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের স্বচ্ছ মান নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের অনেক অংশে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে ১০ থেকে ১৫ বছর বিলম্বিত হয়। এ ধরনের পরিস্থিতি প্রায়শই এশিয়ার দেশগুলি যেমন ভারত, বাংলাদেশ এবং নেপালে দেখা যায়।

পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপন (Resettlement & Rehabilitation):

পুনর্বাসন (Resettlement) ও পুনঃস্থাপন (Rehabilitation)কে একই ধারণা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়, বরং এগুলিকে দুটি স্বতন্ত্র বাস্তবতা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। স্থানচ্যুত মানুষদের অবস্থানগত স্থানান্তরিত করার মধ্যে দিয়ে পুনর্বাসন অর্জন করা হয়। অন্যদিকে পুনঃস্থাপন হল স্থানচ্যুত এবং প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সার্বিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এর লক্ষ্য হল হারানো জীবিকা পুনরুদ্ধার এবং উন্নত করা, যেখানে অবস্থানগত, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে মর্যাদার সাথে নতুন জীবন শুরু করার উপর জোর দেওয়া হয়। পুনর্বাসনের অভিমুখ হল অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, যেখানে পুনঃস্থাপনের লক্ষ্য হল স্থানচ্যুতির ফলে বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ করা।[১৬]

পুনর্বাসন, স্থানান্তরের একটি এককালীন ঘটনা। স্থানচ্যুত হওয়ার পর কেবল স্থানচ্যুত ব্যক্তিরা সাধারণত এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যান। অপরদিকে, পুনঃস্থাপন হল একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া যার মধ্যে রয়েছে মানুষের অবস্থানগত ও অর্থনৈতিক জীবিকা, তাদের সম্পদ, তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংযোগ এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির মনস্তাত্ত্বিক গ্রহণযোগ্যতা। পুনঃস্থাপন এমন একটি প্রক্রিয়া যা স্থানচ্যুত ব্যক্তি এবং প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উভয়ের জন্যই প্রয়োজন এবং এটি অবশ্যই অবস্থানগত স্থানচ্যুতি বা বঞ্চনার অনেক আগেই শুরু করতে হয়। এটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে স্থানচ্যুতি একটি বহুমাত্রিক ঘটনা, যার মধ্যে অবস্থানগত স্থানান্তর কেবল একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল। সর্বোত্তমভাবে স্থানচ্যুতদেরকে এমন একটি গোষ্ঠী হিসাবে দেখা হয় যাদের পুনর্বাসন এবং পুনঃস্থাপনের প্রয়োজন, ক্ষমতায়ন নয়।[১৭]

মানুষকে বসবাসের জন্য বিকল্প স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে বা পুনঃস্থাপনের নীতির পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি মাথায় রাখতে হবে-

১. স্থানচ্যুত সম্প্রদায়কে এমনভাবে পুনর্বাসিত করতে হবে যাতে তারা নিজেদের মতো করে জীবনযাপন করতে পারে। তাদের জীবিকার উৎস রক্ষা ও পুনরুদ্ধারের জন্য অবশ্যই প্রচেষ্টা করতে হবে।
২. একটি সম্প্রদায়ের স্থানচ্যুত মানুষদের একই এলাকায় পুনর্বাসিত করতে হবে যাতে তারা একসাথে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করতে পারে এবং নিজেদের সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ না করে।
৩. স্থানচ্যুত মানুষদের উন্নয়ন প্রকল্পের যথাযথ লভ্যাংশ পাওয়া উচিত। এছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।
৪. যতটা সম্ভব নিকটতম এলাকায় পুনর্বাসন দেওয়া উচিত। যদি পার্শ্ববর্তী এলাকায় পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্কুল, হাসপাতাল এবং অন্যান্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধার মতো সমস্ত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত।

উপসংহার:

উন্নয়নমূলক উদ্যোগের লক্ষ্য হল দেশের জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা। বড় আকারের উন্নয়ন কর্মসূচির ফলে প্রায়শই জনগণকে জোরপূর্বক স্থানচ্যুত করা হয়। মানুষের স্থানচ্যুতি সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। বাঁধ নির্মাণ, রেলপথ, শিল্প ও সড়কপথের মতো বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এই ঘটনায় অবদান রেখেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, আমাদের দেশে সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি উদ্যোগ উভয়ের দ্বারা প্রকল্পগুলির উন্নয়ন বা নির্মাণের কারণে উল্লেখযোগ্য স্থানচ্যুতি ঘটেছে। আমাদের দেশের অগ্রগতির জন্য এই ধরনের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রকল্প রূপায়নকারী প্রশাসনকে অবশ্যই স্থানান্তরের সঙ্গে যুক্ত সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির দিকটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, অনেক প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, তা সে সরকারি হোক বা বেসরকারি, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কল্যাণের চেয়ে আর্থিক লাভকে অগ্রাধিকার দেয়।

সফল পুনর্বাসনের বা পুনঃস্থাপনের জন্য স্থানচ্যুত মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিকভাবে স্থিতিশীল ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার্যকরী সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনর্বাসন দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটি জটিল সম্পর্ক রয়েছে এবং এটি তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুস্থতার উপর একটি শক্তিশালী প্রভাব ফেলে। মানুষকে তাদের উৎপত্তিস্থল থেকে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করার সময় এই সংযোগগুলিকে উপেক্ষা করা যায় না। গ্রামীণ সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতিনীতিগুলি পরিবেশের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ বন্ধনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত করে এবং তাই এই দিকগুলি যথাযথভাবে বিবেচনা না করে মানুষকে এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে পুনর্বাসিত করা দীর্ঘ সময়ের জন্য যন্ত্রণা ও সমস্যা তৈরি করে। সামাজিক ন্যায়বিচার, নৈতিক নীতি এবং স্থানচ্যুতদের অধিকারকে কেন্দ্র করে এমন একটি উন্নয়নমূলক নৈতিকতা গ্রহণ করা উচিত যা, ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের একটি দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে।

তথ্যসূত্র:

[১] Das, Lipishree, and Manoj Kumar Das. "Development-Induced Displacement and Resettlement in India." *Gender Dimensions of Displacement and Resettlement*, edited by Mamata Swain, SSDN Publishers, 2015, p. 178.

[২] Pinto, Ambrose. "*Development Induced Displacement: Violation of Human Rights*." Vijaypur Press, 1999, p. 241.

[৩] Advani, Mohan. "*Urbanization, Displacement and Rehabilitation*." Rawat Publications, 2009, pp. 25-28.

[৪] Mello, Sergio Vieira De (2003). Guiding Principles on Internal Displacement. *International Review of the Red Cross*.pp.1-6, https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jpgl.htm. Accessed on 07.01.2026

[৫] Cernea, Michael M. "Risks, Safeguards and Reconstruction: A Model for Population Displacement and Resettlement." *Economic and Political Weekly*, vol. 35, no. 41, 2000, p. 3663.

[৬] ibid,

[৭] ibid, p. 3664.

[৮] ibid.

[৯] ibid.

[১০] ibid, p. 3665.

[১১] ibid.
[১২] ibid.
[১৩] ibid, p. 3666.
[১৪] ibid, p. 3667-3670.
[১৫] Terminaski, Bogumil. "*Development Induced Displacement and Resettlement: Causes, Consequences and Socio-Legal Context*", Ibidem Press,2015"
[১৬] Das & Das, op cit., p. 176-177.
[১৭] ibid.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 690- 696
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.259

সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’: ধীবর সংস্কৃতির আলোকে

প্রিয়া দে, *অতিথি অধ্যাপক, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 31.12.2025; Accepted: 28.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Samaresh Basu was an eminent Bengali writer in modern literature. He wrote different type of novels, short stories. His first novel ‘Uttaranga'(1951) focuses on the life realities of the hard-working people living on both banks of the Ganges. Nearly a half century after writing ‘Uttaranga', Samresh Basu once again wrote a novel about Ganga River and related with the life of the fishermen and others living beside the river. Among the river centred novels, samaresh Basu's ‘Ganga'(1957) stands a unique place. In this novel, he described how this struggling life of the fishermen and their traditions resolve around the Ganges. They survived their dangerous life with the uncertainty and their old traditional believes and customs. The fishermen fate, believes in good and evil, Ghosts and spirits, goddesses and ritualistic worship - all of these aspects are showed in the novel. Apart from other writers, who writes about river and river related man, samaresh Basu’s ‘Ganga' make a different place in Bengali literature.

Keywords: Traditions, Religious believes, fishing technique, struggling life, Spirits, Occupation

সাহিত্য হল সমাজ সংস্কৃতির দর্পণ। বস্তুত কোনো একটি জাতির বা সমাজের নিজস্ব আচার-আচরণ, ধর্ম বিশ্বাস, রীতি-নীতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি সব কিছুরই সমষ্টি হল সংস্কৃতি। সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ উপন্যাসটি ধীবরদের সংস্কৃতিগত পরিচয়ের মুখপাত্র। বাংলা উপন্যাস যেসময় তার প্রথম দিকের অভিজাত পরিমণ্ডল ছেড়ে নানা শ্রমজীবী মানুষের জীবন কথাকে তুলে ধরার যে প্রয়াস শুরু করেছিল, সেই প্রয়াসেরই হাত ধরে সাহিত্যে জায়গা পেল বিশেষ বৃত্তিজীবী মানুষের সংগ্রামমুখর জীবন কাহিনি। তার সাথে উপন্যাসে, ছোটগল্পে উঠে এলো বিপদ সংকুল ও সংগ্রামশীল জীবনে অভ্যস্ত জেলে সমাজের জীবন কাহিনি- যা লেখক থেকে পাঠক সকলকেই আকৃষ্ট করেছে।

‘গঙ্গা’ যেমন সমরেশ বসুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত ফসল তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ (১৯৩৬), অদ্বৈত মল্লবর্মনের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৫৬) উপন্যাসগুলিও নদীকেন্দ্রিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনযাত্রার একটি পূর্ণ আলেখ্য। কিন্তু নদীকেন্দ্রিক বাসিন্দাদের নিয়ে যতগুলো উপন্যাস রচিত হয়েছে তাতে ‘গঙ্গা’র আসন সবার উপরে। এ তথ্যের স্বপক্ষে অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের একটি অভিমত উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন-

> "জলের সঙ্গে মানুষের এই সংগ্রাম, এই মধুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র পাই না আমরা অন্য কোনো নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসে, অন্তত এমনি করে। তিতাসকে অবলম্বন করেও মানুষ হিসেবে হয়তো বেঁচে ওঠা যায় অন্তত তার প্রমাণ, কিন্তু সেই কল্পবীজ এ উপন্যাসে শাখায়িত হতে পারেনি। হোসেন মিয়া ময়নামতীর দ্বীপে পদ্মার প্রতিস্পর্ধী এক জনবসতি গড়ে তুলতে চেয়েছে, কিন্তু তার সে প্রয়াসও রহস্যময় থেকে গিয়েছে। কিন্তু গঙ্গার বুকে মালো পরিবারের মাছমারা ছেলে সমুদ্রের স্বপ্ন এমনভাবে লালন করেছে মনের মধ্যে, প্রতিহত করা যায়নি তাকে। গঙ্গাকে এভাবে পেরিয়ে যেতে পারে বলেই গঙ্গা এই জাতীয় উপন্যাসগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র।"[১]

সমরেশ বসুর প্রথম উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১)। যেখানে তিনি গঙ্গা তীরবর্তী মনুষের জীবন বাস্তবতা অঙ্কন করেছেন। তার প্রায় বেশ কয়েক বছর পর আবার গঙ্গাকে কেন্দ্র করেই তিনি একটি উপন্যাসের পরিসর নির্মাণ করলেন। আসলে গঙ্গা তীরবর্তী আতপুরের তরফদারপাড়ায় বাস করার সুবাদে গঙ্গা এবং তার মাছমারাদের সঙ্গে লেখকের গড়ে উঠেছিল নিবিড় জানাজানির সম্পর্ক। লেখকের এই নিবিড় সম্পর্ক কিন্তু ছায়া দেখে নয়, কায়া দেখে। ১৯৫৭ সালে শারদীয় সংখ্যা 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'গঙ্গা' উপন্যাসের পটভূমি নির্মাণের পেছনে রয়েছে আরেক পটভূমি। তিনি আতপুরে থাকার সময় মালোপাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে মাছ ধরতে যেতেন। সেখানে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন জাল, জল ও জেলে জীবনের গৃহস্থালি। তাদের হাসি-কান্না, ক্ষোভ, অভিমান, টানাপোড়ন, মহাজন, সুদ-ধার, বিনিদ্র রাত্রিযাপনের ফসল 'গঙ্গা'-য় এসে প্রতিফলিত হয়েছে। কোনো বিশেষ রচনা নির্মাণের পেছনে থাকে এক শিল্পীর দীর্ঘদিনের সাধনা, অধ্যাবসায়। আসলে একজন লেখক যখন বিশেষ কিছু সৃষ্টির প্রয়াসে একটি জনপদকে বেছে নেন, তখন তিনি সে অঞ্চল এনং অঞ্চলে বসবাসকারী সম্পর্কে আদ্যোপান্ত জানার চেষ্টা করে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। যেমন- পার্ল এস বার্ক তাঁর 'The Good Earth' রচনার পূর্বে দীর্ঘদিন চিনে গিয়ে বসবাস করেছিলেন। এরকম আরও অনেক উৎকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে। সমরেশ বসুও তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য তাঁর যেসব মৎস্যজীবী বন্ধুদের কাছে তথ্য সংগ্রহের জন্য যেতেন তাদের সকলের কথা উল্লেখ করেছেন গ্রন্থের ভূমিকা অংশে। তিনি তাঁর ঋণ স্বীকার এবং দায়বদ্ধতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন-

> "আতপুরের মালোপাড়ার কার্তিক দাস, পরেশ দাস এবং হালিশহরের নিমাই অধিকারী ও তার পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এঁদের সঙ্গে অনেক দিন ও রাত্রি আমার কেটেছে গঙ্গার বুকে। এদের সাহায্য ছাড়া গঙ্গা রচনার সম্ভব ছিল না।"[২]

একজন শিল্পীর শ্রেষ্ঠ রচনা নির্মাণের প্রয়াস সাহিত্যের কোনো শৌখিন মজদুরি নয়। সমরেশ বসুও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। এক্ষেত্রে তিনি ধীবরদের জীবন সম্পর্কে আদ্যপ্রান্ত জানার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে হালিশহরের রামপ্রসাদ লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিমাই চাঁদ অধিকারীর একটি মন্তব্য স্মরণীয়-

> "প্রায়ই আসতেন এবং গঙ্গায় মাছধরাদের নিয়ে হাজার প্রশ্ন করতেন। নৌকায় বসে তাঁর হাজার প্রশ্ন। সমানে চলল তাঁর নোট নেওয়া। তা প্রায় ৩/৪ বছর হবে। মাছধরাদের একটা নিজস্ব ভাষা (Technical words) আছে আমি তা খেয়াল করিনি।..... পেশার সাথে ভাষার এত মিল সমরেশদার প্রশ্ন করার আগে পর্যন্ত সত্যি কথা বলতে কি বুঝিনি। গঙ্গা বইতে সেই সব শব্দের কিছু প্রতিফলন হয়েছে।"[৩]

'গঙ্গা' দক্ষিণের মাছমারাদের অর্থাৎ দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের গল্প। সেই মৎস্যজীবীদের মধ্যে রয়েছে জেলে, কৈবর্ত, নিকিরী, চুনুরী, মালো ও রাজবংশীরা। গঙ্গাকে কেন্দ্র করে পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এবং

পূর্ব-উত্তর দিক থেকে আসা গ্রামাঞ্চলের মৎসজীবী মানুষের জলনির্ভর সংগ্রামশীল জীবনধারা আবর্তিত হয়েছে। ধলতিতা, তেঁতুলিয়া, সারাপুর, খোড়গাছি, ফতুলোপুর, ফরিদকাঠি, বীরপুর আঁতুড়ে, ইটিন্ডে, দণ্ডিরহাট, শাখচুড়া, টাকি প্রভৃতি গ্রামের জেলেরা গঙ্গাবক্ষে ভিড় জমিয়েছে জীবনের দাবিতে। মৎস্যজীবীদের ঘটনাবহুল জীবনে একদিকে মৎস্য শিকারের রোমাঞ্চ অন্যদিকে অনিশ্চিত বিপদসংকুল ভয়াবহ জীবনের সাথে পুরনো সংস্কারকে আকড়ে ধরে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা- এসবই উপন্যাসের কাহিনীকে রোমাঞ্চিত করে তুলেছে। অলঙ্ঘ্য সমুদ্র, ঝড়জলের নদীতে মালোদের সংগ্রামী জীবনকে প্রতি মুহূর্তে মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদের প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের কাছে। সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের রীতিনীতি সমাজ সংস্কারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা'গ্রন্থে বলেছেন-

> "একটি বিশেষ অঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার এরূপ নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ও অন্তর্গুরু বর্ণনা বাংলা উপন্যাসে অন্যত্র দুর্লভশুধু উহাদের জীবনযাত্রার বহির্ঘটনাই চিত্রিত করেন নাই। উহাদের মুখের ভাষা, অন্তরের অর্ধস্ফুট চিন্তা ও আবেগের স্পন্দন, উহাদের জীবনবোধের সমস্ত প্রদোষান্ধকার অস্পষ্টতা ও রহস্যঘন নক্ষত্রদীপ্তি আমাদের নিকট অপূর্ব দক্ষতার সহিত উদঘাটিত করিয়াছেন।"[৪]

জীবন-জীবিকার বিপর্যস্ত সংগ্রামের জাতাকালে মাছমারারাদের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে তীব্র সংস্কার। সমুদ্রযাত্রায় পাড়ি দেওয়ার সময় তারা বিশেষভাবে মান্যতা দেয় পাঁজিপুঁথিকে। নিবারণ মালো ও তার ভাই পাঁচুর মত আরও অনেক মালোও সেকারণেই যাত্রার সময় নির্ধারণ করে এভাবে-

> "দক্ষিণের ভিটের চালায় অর্ধেকের উপর রোদ উঠে গেছে। মাথার কাছে বাঁধা আছে কঞ্চি। কঞ্চির গায়ে যতক্ষণ রোদ না লাগবে, ততক্ষণ যাত্রার সময়। রোদ লেগে গেলে যাত্রা নাস্তি।"[৫]

আবার যাত্রাপথে কাঁকড়া, কচ্ছপ, কলার দর্শনকে তারা চিহ্নিত করে অমঙ্গল রূপে। নিবারণ মালো যেবার তার শেষ সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল সেবারও তারা যাত্রাকালে একজোড়া কচ্ছপের দর্শন পেয়েছিল। সেটা দেখে পাঁচু ও সাইদার নিবারণের বুকের মধ্যে নিঃশব্দে অলুক্ষণের বিদ্যুৎশিখা চিকচিক করে উঠেছে। অজন্ম লালন করা বিশ্বাস তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে নিবারণের সমুদ্রে মিলিয়ে যাওয়াতে। জেলেরা কোনো মাছমারার মৃত্যুকে গুনিন লোপাটের ষড়যন্ত্র বলে বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাস, মৃত্যু চকভাঙ্গা মাছের লোভ দেখিয়ে ডেকে নিয়ে যায় জেলেদের। নিবারণ সর্দারের মৃত্যু তারই অনুরূপ। পাঁচু মালো বলে ওঠে-

> "ওর যে বড় দুর্জয় টান। নেশার চেয়েও দামি জিনিস। তখন আর ঘর গৃহস্থ, সামনে পিছনে কোন কিছুর খেয়াল থাকে না। মনে থাকে না টাকার লালসা। আদিগন্ত সমুদ্রের ফোসানি গর্জানি কানেও ঢোকে না কারুর। চক ঘিরে পাটা জাল ফেলে তুলে ফেলা নিয়ে কথা, ওই ফেলে তুলতে তুলতেই যে কত দূর টেনে নিয়ে যায়, সে খেয়াল হয় পরে।"[৬]

নৌকার সর্দারের মৃত্যু মানে গোটা সাইয়ের নিপাত যাওয়ার সংকেত। এরপর সবাইকেই এবছরের মতো সেদিনই ফিরে আসতে হবে, তাদের বিশ্বাস নইলে আর কেউ ফিরবে না।

মাছমারাদের অটুট বিশ্বাস- যতদিন তারা গঙ্গাবক্ষে থাকবে, ততদিন কেউই চুল দাড়ি কাটবে না, কাপড় ছাড়বে না। কেননা নিয়ম ভঙ্গ করলেই অনাচার ঘটবে। আর অনাচার মানেই মৃত্যু। সমুদ্রে কোনো মাছমারার মৃত্যু হলে সেই স্থানে অগুনন্তি কাশের মুন্ড জট পাকিয়ে বেঁধে রেখে আসতে হয়। এটা নতুন কোনো

মাছমারার কাছে সাবধান হওয়ার সংকেত চিহ্ন। এই বিশ্বাস তারা বংশানুক্রমে মেনে চলে আসছে। নিবারণের মৃত্যুর পর তার ভাই পাঁচু সেই স্থানে কাশের গুচ্ছ বেঁধে রেখে আসতে না পারলেও বিলাস সেই নিয়ম পালন করে এসেছে। মাছমারারা যে কয়েকমাস মৎস্যশিকারের অভিযানে থাকে সেসময় তারা প্রতিটি দিনক্ষণ-পর্ব-লগ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব রাখে। নানা ধরনের বিপদ থেকে নিজেদের সচেতন রাখার জন্য তারা তাদের মননে লালন করে নানা সংস্কার। তাদের অভিধান পূর্ণ থাকে ভরা কোটাল, মরা কোটাল, অমাবস্যা- পূর্ণিমার কোটাল, অষ্টমী, নবমী, দশমী, তিথি প্রভৃতি শব্দবন্ধে। মাছ ধরার সময় এই প্রত্যেকটি কোটাল, তিথিকে কেন্দ্র করেই জেলেদের বিশ্বাস এবং ধারণা আবর্তিত হয়। পাঁচুর বক্তব্যের প্রসঙ্গে উপন্যাসিক মাছমারাদের সংস্কারকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে:

> "এই যে দেখছিস বর্ষায় জল বাড়ছে একেই বলে জোয়ান কোটাল, তার রকম আছে। পারাপারের মাঝির কাছে, এই জোয়ান কোটাল।জল আরও বারে ধরিত্রী রসস্থ হন অমাবস্যায় পুন্নিমাতে।.... তবে বর্ষাকালে পূর্ণিমার কোটালের জোর বেশি। দ্বিতীয়া পর্যন্ত টান কাঁপানি থাকবে। একেবারে চরমে উঠে, চতুর্থীতে ঢিল দেবে। দিতে দিতে অষ্টমীতে গিয়ে বাঁধন আলগা হয়ে যাবে। দশমীতে একেবারে শেষ।"[৭]

কখন মাছ গঙ্গাবক্ষে তার পোনা ছাড়বে, আবার জালে কখন ইলিশ ধরা দেবে- এ সম্পর্কে পাঁচুদের বিশ্বাস অত্যন্ত অভ্রান্ত।

সমরেশ বসু তাঁর উপন্যাসটিকে উৎসর্গ করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। উপন্যাসটির বেশ কিছু স্থানে তারাশঙ্করের 'হাঁসুলীবাকের উপকথা' উপন্যাসের প্রভাব রয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে যেমন ত্রিকালক সুচাঁদ বুড়ির স্মৃতিকথার মাধ্যমে ভগবান কালরুদ্রের পুরাণকথা বর্ণনা করেছেন, তেমনি সমরেশ বসুও তাঁর 'গঙ্গা'-য় ধলতিতার রামমালোর মাধ্যমে তাদের পূর্বপুরুষের আবির্ভাবের কাহিনী বিবৃত করেছেন। মালোদের প্রথম পুরুষের রহস্যময় আবির্ভাবের প্রসঙ্গে তাদের বিশ্বাস-

> "চোদ্দ পুরুষেরও চোদ্দ পুরুষ আগে। ওয়ার কল্যাণেই সমুদ্দুর পাড়ের মালো বংশ বড় হয়েছেলে, ছইড়ে পড়েছেলে। মালোরা ত্যাখন রাজা হয়েছিল দেশের।"[৮]

জনশ্রুতি অনুযায়ী মালোদের দক্ষিণ দে হেঁটে এসেছিলেন সমুদ্রের ওপর দিয়ে। কালো কুচকুচে পুরুষ, কোঁচকানো চুল, খালি গা, হাতে বড় এক ক্যাঁচা। কিন্তু ডাঙায় এসে বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। কেননা ডাঙ্গা দক্ষিণ রায়ের অর্থাৎ বাঘের রাজ্য। উভয়ে খুব যুদ্ধ হয়েছিল। দক্ষিণ রায় খুশি হয়ে একটি গায়ের ছাল ওনাকে পড়তে দিলেন। মালোদের পূর্বপুরুষের আসল মূর্তি বাঘের ছাল পরা, ক্যাঁচা হাতে কালো কুচকুচে পুরুষ এবং তাদের রাজ্য হল- গোটা সমুদ্রের পার ধরেই।

মাছমারারা তাদের অসহায় দুর্ভাগ্যপীড়িত পতিত জীবনকে মেনে নিয়েছে নিয়তির দন্ডস্বরূপরূপে। তারা নিজেদের পতিতজীবনের কাহিনিকে গড়ে তুলেছে মনসাদেবীর লৌকিক কাহিনিযোগে। লোকপুরাণ ও মালোদের কল্পবুদ্ধি মিলিয়ে কাহিনিটি এরূপ:

> "ঝালো আর মালো, দুই ভাই। এক মায়ের সন্তান, জন্ম নিলে ভগবানের গলার মালা থেকে। কে করছে আর পাঁজিপুঁথি তত্ত্ব-তলাস। গাঁয়ের লোকে বলে, শোনেও গায়ে ঘরের লোকে। তা ও দুই ভাই-ই ভগবানের বিধেনে হয়েছে মাছমারা।..... বাপ ঠাকুরদার মুখে শোনা কথা। আমরা জানি, এই আমাদের বৃত্তান্ত।"[৯]

বংশপরম্পরায় ধরে প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, গুরুদেবের আদেশ অমান্য করার শাস্তিস্বরূপ মালোরা আজও পতিত এবং এটাকেই তারা তাদের ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছে। মালোদের জীবন নানা সংস্কার,

আধিভৌতিক বিশ্বাসে ভরপুর। শিক্ষা ও নাগরিক সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত মালোরা তাদের জীবনে অভাব-অনটন, শোষণ- বঞ্চনার সাথে নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসকে লালন করে চলে এসেছে। তাদের অনিশ্চিত জীবনে মৃত্যু নানা রূপে, নানা ছদ্মবেশে আসে। পাঁচু যখন প্রথমবার তার দাদার সাথে সমুদ্রে যাত্রা করে তখন নিবারণ মালো তার ভাইকে সাবধান করে বলেছিল-

> "ডাঙ্গার তুক, বড় তুক। নোঙর ফেলে বসে আছিস গালে হাত দে।শুনতে পাবি, কে যেন ডাকছে ডাঙ্গা থেকে। ফিরে তাক্কে দেখবি, মানুষ, মেইয়ে মানুষ।.... তোকে ডাকছে, ওগো ভালো মানুষের ছেলে, ও মাঝি, বাঁচাও গো! আমার কেউ নাই গো! দেখবি একপিঠ চুল, ফুটফুটে মুখখানি, ডাগর ডাগর চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।.... কিন্তু খবরদার। যাস তো ওই যাওয়াই শেষ যাওয়া।"[১০]

জলে থাকাকালীন জেলেদের জন্য মৃত্যু নানা ফাঁদ পেতে বসে থাকে।ফাঁদে পা দিলেই মৃত্যু নিশ্চিত। টিকটিকির ডাককে মালোরা বেদবাক্য তুল্য মান্যতা দিয়ে থাকে। টিকটিকিকে তারা শুধু একটিমাত্র জীব ভাবে না। তারা মনে করে-

> "খনার জিভখানি কেটে নে মিহির রেখে দিয়েছিলেন গর্তে। সেই জিভটি খেয়ে ফেলেছিল টিকটিকিতে। খনার বচন হল বেদবাক্যি। জিভ খেয়ে ফেলে টিকটিকিরও গুন হয়েছে ডাকের।"[১১]

সকলে এসব মানলেও বিলাস কিন্তু এই ধরনের অন্ধবিশ্বাসকে মানতে নারাজ।

একদিকে সংসার সংগ্রামের দ্বন্দ্ব অন্যদিকে আধিভৌতিক বিশ্বাস- এই দুই-ই মাছমারাদের জীবনকে অসহায় করে তোলে। চৈত্র মাসে তাদের দুর্দিন আরও বীভৎস রূপ ধারণ করে। সমুদ্র ধাক্কা দিচ্ছে চৈত হাঁকিয়ে, সেই সঙ্গে ঘরে প্রাদুর্ভাব ঘটে পেত্নীর। এমন সময়ে গুনীন, ওঝা, মন্ত্রপড়া মানুষজনরা মাছমারার কাছে ভরসার পাত্র। তাদের মন্ত্র, ফুঁকই তো জেলেদের শারীরিক সুস্থতার অস্ত্র। গুণিনের মন্ত্রের জোরে এবং পেত্নীর বলা কথার আড়ালে মাছমারাদের গার্হস্থ্য জীবনের দুর্বিষহ চিত্রটি ধরা পড়ে-

> "ধরব না মাথায় সিঁথেয় বাসি সিঁদুর। পেটে দুদিন ভাত নেই। এয়োস্ত্রী মানুষ, রুক্ষ চুল, কানি পরণে, লাজ নেই, লজ্জা নেই, আঁচলে গিঠ নেই, পায়ে আঙ্গুলে আংটা নেই।"[১২]

অন্ত:পুরবাসিনীদের দুঃসহ জীবনযাপনের কাহিনি চন্ডীমঙ্গলের ফুল্লরার বারোমাস্যার চেয়েও অনেক বেশি বেদনাদায়ক। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন- এই চারমাস জেলেরা মন ভরে দুবেলা খেতে পায় এবং তাদের সংসারেও লক্ষ্মীশ্রী চেহারা ফুটে ওঠে। কিন্তু বাকি কয়েক মাস অভাব যেন তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে সামিল হয়। পেট চালাতে ফ্রি বছর ঋণ নিতে বাধ্য হয় মহাজনের কাছে। বাঁধা পড়ে নৌকা, জাল এমনকি বাস্তুভিটেটুকু। মাছমারাদের অভাবী জীবনের বিধিলিপিতে তাদের স্ত্রী পরিবাররাও ছাড় পায় না। ওঝার স্তোকবাক্য পেত্নীর কাছেও বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তাই তার কণ্ঠেও অভিযোগের সুর শোনা যায়-

> "মিছে কথা, মিছে কথা তোদের। নিজেরা পাস না খেতে, তোরা আমাকে খাওয়াবি।.... মাছ নেই, জল নেই, জাল নেই লৌকো নেই, ভাত নেই, কাপড় নেই, পান নেই।"[১৩]

নিত্য অভাব, অভিযোগের অসহায়তা এবং আধিভৌতিক বিশ্বাসের কাছে মালোরা মাথা নত করতে বাধ্য হয়।

আধিভৌতিক বিশ্বাস ছাড়াও মাছমারাদের মধ্যে দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস অটুট। তাদের উপাস্য দেবতা হলেন খোকাঠাকুর এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী ইনিই হলেন মাছেদের দণ্ডমুন্ডের কর্তা। তারা দেবতার আকার কখনো দেখেনি কিন্তু মাছের গোল চোখকে ভাবে খোকাঠাকুর। এজন্যই মালোর স্ত্রীরা তাদের ঘরের বিপদে আপদে প্রার্থনা জানায়-

> "খোকাঠাকুর জাল ভরে, খাল ভরে, মাছ দাও। তুমি দিলে, আমি আমার স্বামীর হাসি মুখ দেখব, ঘরে আমার সোহাগের বান ডাকবে।"[১৪]

খোকাঠাকুরের কৃপায় যখন জাল ভরে মাছ উঠে আসে, তখন সুদিনের বান বয়ে যায় জেলেপল্লীতে। এরপর শ্রাবণের টোটার সময় যখন মাছমারারা দিশেহারা সেসময় তারা ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। একটা সময় আসে যখন মা গঙ্গা তার মীনশস্যগুলোকে লুকিয়ে রাখে জলের তলায় তখন নিরুপায় হয়ে জেলেরা তাদের আরাধ্যদেবী মা গঙ্গার শরণাপন্ন হয়। তাদের মুখে নেই কোনো প্রতিবাদের ভাষা, শুধু অভিমানভরা কণ্ঠে মায়ের কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়। শ্রাবণের মন্বন্তর সংহার মূর্তি ধারণ করলে, মালোদের জীবিকার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। সেসময় তারা গঙ্গার পূর্ব দিকে চরায় একটু মাটির বেদী পেতে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। একেই বলে নলেন টানা-

> "বেদির সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে দুজন। এই দুর্জয় সংহারিনী গঙ্গার সাক্ষাৎ চায় তারা। এই তাদের বিশ্বাস।..... তারা গোল হয়ে হরিধ্বনি দেয়। জোয়ারের বেলায় এসে নাম গান করে।.... সারা অঙ্গ কাঁপে থরথর করে। বেদীর সামনে মুখ ঘষে গ্যাজলা উঠে বাসি মুখে।"[১৫]

গঙ্গাই তাদের টিকে থাকার উৎস। গঙ্গাকে কেন্দ্র করেই তাদের সকল বিশ্বাস আবর্তিত হয়েছে। সেজন্য মা গঙ্গার নিষ্ঠুরতার কাছে তারা মাথা নত করে এবং নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার আকুতি জানিয়ে পূজো দেয়। এ সমস্ত পুজো ছাড়াও তারা পালন করে চৈত্র শেষে সন্ন্যাস নেওয়া, ঢ্যালাপ্যালার পুজো, আষাঢ়ে অম্বুবাচী প্রভৃতি পার্বণ। মালোদের বিশ্বাস অনুযায়ী অম্বুবাচীর দিন দুধ খেলে আর সাপ কামড়াবে না। এজন্য বিলাসের মা একটু দুধ জোগাড় করে এনে সবার মুখে তুলে দেয়। আবার ঢ্যালাপ্যালার পুজোয় তারা মা ধরিত্রীর জন্য নৈবেদ্য সাজিয়ে দেয় এভাবে-

> "মাঠের মাঝখানে গিয়ে ঢ্যালা মাঠে সাজিয়ে দিয়ে আসবে নৈবেদ্য। বাজিয়ে ফিরবে শাঁখ, কাশি।"[১৬]

মাছমারাদের সর্বজনীন গঙ্গাপূজোর নাম সাজার। সাজার হল-

> "মাছমারাদের সার্বজনীন গঙ্গাপূজো। সবাই মিলে চাঁদা দেয়। হাতে ধরে কেউ টাকা-পয়সা দেয় না। মাছমারারা একটি ভাটার পাওয়া মাছ সব দিয়ে দেয়, যাদের উপর সাজারের ভার থাকে। তাকে বলে সাজভাটা।"[১৭]

এ উৎসব শুধু মাছমারাদের মধ্যেই সীমিত থাকে না। আশেপাশের গৃহস্থ, আধা গৃহস্থ, দেহপোজীবী সকলেরই সার্বজনীন পূজো। কারো জন্য নির্দিষ্ট কোনো চাঁদার নিয়ম নেই, যে যা পারে তাই দেয়। কলকাতা থেকে বড়বড় যাত্রাদল আসে, চার-পাঁচ রাত ধরে যাত্রাগান চলে, মাইক সহযোগে গান হয়। মেয়েরা সাজসজ্জা করে উৎসবে সামিল হয়। উৎসবের বর্ণনায় লেখক বলেছেন-

> "সাজার এসে গেল। পাড়ার মধ্যেই একটি খোলা জায়গা মাথায় তেরপল দিয়ে দিব্যি ঢাকা হয়েছে। প্রতিমার মাটির সঙ্গে রং পড়ে গেছে। ঢাক- কাশি উঠেছে বেজে।"[১৮]

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাস শুধুমাত্র নদীনির্ভর মানুষের জীবন চিত্রায়নের গল্প নয়, উপন্যাসটি একটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয়ের জীবন্ত দলিল। নিয়তির প্রতি অসীম বিশ্বাস ও পেশার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা নিয়ে মাছমারারা তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করে চলেছে। এই সংগ্রামে তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে কুসংস্কার, নানা ভ্রান্ত ধারণা, ধর্মীয় বিশ্বাস, পূজার্চনা প্রভৃতি। তবে এই ধর্মীয় বিশ্বাসই তাদের

প্রাণচঞ্চল করে রেখেছে। গঙ্গা ও গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলের সামাজিক সংস্কার, বিশ্বাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা নিয়ে সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' সত্যিই প্রশংসনীয়।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, সমরেশ। গঙ্গা: একটি সমীক্ষণ। মৌসুমী প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০২৩, পৃ. জ।
২. বসু, সমরেশ। গঙ্গা (ভূমিকা অংশ)। মৌসুমী প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০২৩
৩. বসু, সমরেশ। গঙ্গা: একটি সমীক্ষণ। মৌসুমী প্রকাশনী, ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃ. গ।
৪. বন্দোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকুমার। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ বইমেলা ২০১৪, পৃ. ৪১৫।
৫. বসু, সমরেশ। গঙ্গা। মৌসুমী প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০২৩, পৃ. ৬।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।
১১.প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

নির্দেশনা:

প্রবন্ধ পাঠানোর জন্য প্রথমে ওয়েবসাইটে (https://uttarsuri.com/uttarsuri) অথবা উপরে দেওয়া Submit your Article এ ক্লিক করলেও হবে) লেখক হিসেবে নিবন্ধন (Registration) করতে হবে। নিবন্ধন করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatic) আপনি লেখা জমা দেওয়ার জন্য পোর্টালে প্রবেশ (Login) করতে পারবেন, প্রবেশ করার পর লেখকের নিজস্ব ড্যাশবোর্ডের বামদিকে Articles এ চাপ দিলে Add New আসবে, তাতে ক্লিক করে প্রবন্ধ জমা করতে হবে। প্রবন্ধ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আপনি ইমেইল/পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশ করলে পেয়ে যাবেন এবং উত্তরসূরি থেকেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইমেইলে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

গবেষণাপত্র রচনায় অনুসৃতব্য পদ্ধতি:

১. শিরোনাম (Title): শিরোনাম যথাযথ এবং স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৩. সারসংক্ষেপ (Abstract): ইংরেজিতে ৩০০ শব্দের মধ্যে।
৪. সূচক শব্দ (Keywords): ন্যূনতম ৫টি।
৫. মূল আলোচনা: গবেষণাপত্রে ন্যূনতম ২৫০০ শব্দ থাকতে হবে। শব্দ সংখ্যা ২৫০০ এর কম হলে তা রিভিউ করা হবে না।
৬. তথ্যসূত্র (Reference): লেখকের পদবি, লেখকের নাম। গ্রন্থের নাম। প্রকাশনীর নাম, প্রকাশকাল, প্রকাশস্থান, পৃষ্ঠাঙ্ক।
৭. গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি (Bibliography): পৃষ্ঠাঙ্ক ব্যতিরেকে উল্লেখিত পদ্ধতি।

গবেষণাপত্র প্রেরণের নিয়মাবলী:

১. প্রবন্ধ হতে হবে সুচিন্তিত, মৌলিক ও গবেষণাধর্মী। প্রবন্ধে Plagiarism-এর মত ঘটনা ঘটলে তার দায় সম্পূর্ণভাবে লেখকের। পত্রিকা কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না। প্রবন্ধ AI ব্যবহার করে লেখা হলে ছাপানোর জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না।
২. অভ্র কীবোর্ডে, যে কোনো ফন্টে টাইপ করে লেখা পাঠাতে পারেন (জার্নালে বেনসেন ১৩ ফন্ট ব্যবহার করা হয়)। ইংরেজির ক্ষেত্রে Times New Roman 12 ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।
৩. বাক্যে ব্যবহৃত যতিচিহ্নের (দাড়ি, কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়সূচক চিহ্ন ইত্যাদি) আগে কখনোই স্পেস দেওয়া যাবে না। পরে একটি স্পেস দিতে হবে।
৪. গল্প, কবিতা, উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, প্রবন্ধ গ্রন্থ ইত্যাদির নাম 'Single Quote' এর মধ্যে রাখতে হবে।
৫. গদ্য, পদ্য বা যে কোনো টেক্সটের উদ্ধৃতি "Double Quote" এর মধ্যে রাখতে হবে।
৬. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া বাধ্যতামূলক।
৭. আকাদেমি বানান অভিধান (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি) অনুসরণ করে ভালোভাবে প্রুফ দেখে লেখা পাঠাতে হবে। আকাদেমি বানান অভিধান এর বিকল্প হিসেবে ব্যবহারিক বাংলা বানান অভিধান, পবিত্র সরকার দ্রষ্টব্য।
৮. সম্পাদকগণ প্রয়োজনে সংশোধন বা সামান্য পরিবর্তন করতে পারেন, যদি তিনি তা প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মনে করেন।

তথ্যসূত্র যে ভাবে লিখতে হবে:

বই এর ক্ষেত্রে:

১. সেলিম, মুস্তাফা। বাহান্ন তাসের পর। সোনিক অর্কেস্ট্রা, ১৯৭৮, ধর্মনগর, পৃ. ৩।
২. একই গ্রন্থ পর পর হলে লিখতে হবে, তদেব, পৃ. ৫।
৩. দে, তমালশেখর। সেলিম মুস্তাফার কবিতা-জগৎ: সাক্ষাৎকার এবং। নীহারিকা পাবলিশার্স, ২০২২, কথামুখ, পৃ. ৬।
৪. দাশ বিশ্বাস, পীযূষকান্তি, সম্পাদনা। ছবি, পাখি সব করে রব, সংখ্যা ১২৫, মার্চ ২০২৪, পৃ. ৮।

সাহিত্যপত্র:

১. দাস বিশ্বাস, পীযুষকান্তি, সম্পাদনা। পাখি সব করে রব, দশম বর্ষ, সংখ্যা ১২০, অক্টোবর ২০২৩, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

৪. নাথ, ঋষিকেশ, সম্পাদনা। শব্দনীল, সংখ্যা ২৫, একুশে মার্চ ২০২৩, পয়েন্টস ইউনিট, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

পত্রিকা:

১. দাস বিশ্বাস, পীযুষকান্তি, সম্পাদনা। পাখি সব করে রব, দশম বর্ষ, সংখ্যা ১২০, অক্টোবর ২০২৩, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

২. ——, সম্পাদনা। পাখি সব করে রব, সংখ্যা ১১৪, এপ্রিল ২০২৩, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা। (একই পত্রিকার ক্ষেত্রে)

ওয়েবসাইট:

ভট্টাচার্য, ড. তমালশেখর। "নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশুপ্রেম।" আত্মদীপ, www.atmadeep.in/nirbachito-bangla-chotogolpe-poshuprem.html। প্রবেশের তারিখ: ১৮ জুন ২০২৫।

ফুটনোট:

১ ড. তমালশেখর ভট্টাচার্য, "নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশুপ্রেম," আত্মদীপ www.atmadeep.in/nirbachito-bangla-chotogolpe-poshuprem.html, প্রবেশের তারিখ: ১৮ জুন ২০২৫।

২ মুস্তাফা সেলিম, বাহান্ন তাসের পর, সোনিক অর্কেস্ট্রা, ধর্মনগর, ১৯৭৮, পৃ. ৩।

Plagiarism:

Authors are urged to avoid plagiarism. Any detected instances of plagiarism will be the sole responsibility of the authors.

Review Process

- All the manuscript will be preliminary examined by the Editor-in-Chief and then forwarded to the Reviewers & other Editors of the Journal.
- The papers shall only be published after recommendation of the Reviewers & Associate Editors.
- Information regarding the selection or rejection of articles/papers will be only through Email.
- The journal shall publish the article/papers only after completion of the formalities mentioned in selection letter.
- The journal will also not take the responsibility of returning the rejected articles.

At every stage preceding publication, the editors of the journal shall have the right to make corrections (if needed) in articles/papers to suit the requirement of the journal.

N.B.: Papers will be accepted only when accompanied with abstract (to be written in English only). Submission of papers without abstract (in English) or mere submission of an abstract without the paper would lead to non-acceptance of the same.

Publication Ethics

Publication ethics are the principles and guidelines that govern the conduct of authors, reviewers, editors, and publishers in scholarly publishing. Ensuring ethical practices is crucial for maintaining the integrity and credibility of academic research. Here are some key aspects of publication ethics of our journal:

- **Authorship:** All authors should have made significant contributions to the research and agree to be listed as authors. Misrepresentation of authorship, such as ghost authorship or gift authorship, should be avoided.
- **Originality and Plagiarism:** Authors should ensure that their work is original and properly cited. Plagiarism, including self-plagiarism, is unethical and undermines the integrity of scholarly publishing.

- **Data Integrity:** Authors are responsible for the accuracy and integrity of their research data. Fabrication, falsification, and manipulation of data are serious ethical violations.
- **Conflict of Interest:** Authors should disclose any potential conflicts of interest that could influence their research or its interpretation. These may include financial interests, affiliations, or personal relationships that could bias the work.
- **Peer Review:** Peer review plays a critical role in ensuring the quality and validity of published research. Reviewers should conduct their evaluations objectively and provide constructive feedback.
- **Editorial Independence:** Editors should make decisions based on the merits of the research and without influence from commercial interests, personal biases, or other undue pressures.
- **Publication Ethics Policies:** Journals should have clear and accessible policies on publication ethics, including instructions for authors, ethical guidelines for reviewers and editors, and procedures for handling ethical issues or misconduct.
- **Responsibility of Publishers:** Publishers have a responsibility to support and enforce ethical standards in scholarly publishing. This includes providing resources for editors and reviewers, promoting transparency, and addressing allegations of misconduct.

Publication Charge

The authors should note that there is no submission fee; however, there is a reasonable publication fee for each accepted article to meet the cost of manuscript handling, typesetting, office cum admin expenses, web-hosting charges, up-loading charges, internet expenses, website update and maintenance, electronic archiving and other recurring expenses. The publication fee is obligatory for publication.

- **Indian Authors:** The publication fee for single author per accepted paper is Rs. 1200.00 and Rs. 1500.00 for multiple authors.
- **Foreign Authors:** The publication fee of the accepted paper is $25 for single authored paper and $30 for multiple authored papers
- **Print copy:** Print Copy of the issue can be supplied on payment of Rs. 800.00 per copy. Annual subscription for the print copy is Rs. 3000.00 per Volume (inclusive of postal charges within India) Single print copy can be supplied outside India on payment of 25$ (inclusive international shipping charge) per copy.

ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

Volume-II, Issue-III, January, 2026

Website: https://www.atmadeep.in/

Email: editor@atmadeep.in

NOVEL INSIGHTS

A Peer-Reviewed Quarterly Multidisciplinary Research Journal

ISSN: 3048-6572 (O) 3049-1991 (P)

Website: https://www.novelinsights.in

Published by: **UTTARSURI**

Crossref OPEN ACCESS

ABOUT UTTARSURI

Uttarsuri is a registered society under the Societies Registration Act XXI of 1860, bearing registration number RS/KARIM/258/L/09 OF 2022-23 dated 30.04.2022, located in Sribhumi, Assam, India. The society is also registered with NGO Darpan, bearing the unique ID VO/NGO AS/2022/0314757.

Uttarsuri Publication is a branch of the registered society Uttarsuri. It is registered with the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises under registration number UDYAM-AS-18-0012611.

UTTAR SURI

Inheriting the spirit, inspiring the future

প্রকাশক:

উত্তরসূরি, শ্রীভূমি, অসম, ভারত

ISSN24541508